বিশ্বপরিস্থিতি, অর্থনীতি ও ইসলাম বিষয়ক বিশ্লেষণ

শাহ আবদুল হান্নান

বিশ্ব পরিস্থিতি
অর্থনীতি ও ইসলাম
বিষয়ক বিশ্লেষণ

শাহ আবদুল হান্নান

www.pathagar.com

বিশ্ব পরিস্থিতি, অর্থনীতি ও ইসলাম বিষয়ক বিশ্লেষণ
শাহ আবদুল হান্নান

সম্পাদনা
আহমদ হোসেন মানিক
ওমর বিশ্বাস

প্রকাশক
বুকমাস্টার
৮৬/২ পুরানা পল্টন লেন
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
মে ২০০৬

গ্রন্থস্বত্ব
দি পাইওনিয়ার

প্রচ্ছদ
ফরিদী নুমান

অক্ষর বিন্যাস
ছোঁয়া

মুদ্রণ
দি প্রিন্টমাস্টার
৮৬ পুরানা পল্টন লেন
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

দাম
দুইশত টাকা

www.pathagar.com

ভূমিকা

এ বইয়ের সাক্ষাৎকারসমূহে বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ইসলাম, অর্থনীতি, সামাজিক বিষয়গুলোর উপর আমার বক্তব্য, মতামত ও বিশ্লেষণ প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন সময়ে আমি এসব সাক্ষাৎকার দিয়েছি। সুতরাং সময় এবং পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে এসব সাক্ষাৎকারে। একই কারণে কিছু পুনরুক্তিও থেকে যাবে, যদিও তা কমানোর চেষ্টা সম্পাদকগণ করেছেন।

আমার বক্তব্যে সততাই আমাকে পথনির্দেশ করেছে। আমি তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি, বিদ্বেষ দ্বারা নয়। তবে আমি মানছি যে সবার চিন্তা একরকম হয় না। একই ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। আমার ভুলও থাকতে পারে তা আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি।

সম্পাদকদ্বয় জনাব আহমদ হোসেন মানিক ও কবি ওমর বিশ্বাস এবং প্রকাশক বুকমাস্টার-এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

আমি আশা করি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ইসলামের বিভিন্ন দিক, ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বুঝতে এ বই সহায়ক হবে।

৩০ মে ২০০৬

শাহ আবদুল হান্নান

sahannan@sonarbangladesh.com

www.pathagar.com

সূ চি

বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রের মূল আদর্শ ধরে
একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা দরকার / ৭

বাংলাদেশ

ইসলামের ভিত্তিতে অধিকতর ঐক্য সৃষ্টি হবে যদি আমরা জাতির
অন্যান্য যে মানসিকতা আছে তাকে আত্মস্ত করতে পারি / ৭

বিশ্ব পরিস্থিতি

ইসরাইল আরব বিশ্বের উপর ওয়েস্টার্ন আউটপোস্ট / ২৩

গণতন্ত্র ও ইসলাম

ইসলাম বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিরোধী নয় / ৩৪

শিক্ষা

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কখনই পাবলিক ইউনিভার্সিটির বিকল্প হতে পারে না / ৪৫

মিডিয়া

✓ মিডিয়াকে সঠিক গুরুত্ব দেয়ার একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে / ৫০

ইসলামী আন্দোলন

এদেশে ইসলামী আন্দোলনের উপর সব সময়ই রাজনৈতিক চাপ ছিল / ৫৩

মুসলিম বিশ্ব

মুসলিম দেশগুলো ডিক্টেটরে ভরা / ৫৫

সংস্কৃতি

✓ তাওহীদই আমাদের সংস্কৃতির মূল ভিত্তি / ৫৯

অর্থনীতি

উন্নয়নের জন্য আমাদের জিডিপি কমপক্ষে ৭ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে / ৬৫

মানসিকতাই আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে বড় সমস্যা / ৬৯

কবি গোলাম মোস্তফা প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশের
গুটিকয়েক শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন ছিলেন / ৭৬

সেবা ও প্রশাসনকে জনগণের নিকটবর্তী করতে হবে / ৭৯

পুলিশ প্রশাসনকে ইউরোপ-আমেরিকার পুলিশ
প্রশাসনের আদলে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানো ও পুনর্গঠন প্রয়োজন / ৮১

মাদরাসা শিক্ষায় দেশ চালাবার জন্য যেসব বিষয় শিক্ষা করা দরকার তা নেই / ৮৩

শিল্প, কৃষি ও সার্ভিস সেক্টরের ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব / ৮৫

ছাত্র রাজনীতি দশ বছরের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা দরকার / ৮৭

www.pathagar.com

এ দেশে ইসলাম কায়েম না হওয়ার পেছনে মূল
সমস্যা হচ্ছে সকল পর্যায়ে লিডারশিপ তৈরি না হওয়া / ৯৫

ইসলামী ব্যাংকিং যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে / ১০৮

অর্থনীতিকে উদ্ধার করতে হলে রাজনীতি ও মানবিকতা উদ্ধার করতে হবে আগে / ১১৩

ইসলামী অর্থনীতিই সমতা আনতে পারে / ১২৩

ক্ষুদ্র ঋণ দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয় / ১২৭

সম্ভাব্য অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলায় আমাদের এখনই মাঠে নামতে হবে / ১৩৯

জাতিসংঘকে নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা হচ্ছে আমেরিকার কৌশল / ১৪৭

জিহাদ ও সন্ত্রাস এক নয় গণতন্ত্রই সঠিক পথ / ১৫২

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুপারভাইজড যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত / ১৫৪

দারিদ্র্য দূর করার প্রধান উপায় হলো উন্নয়ন / ১৫৮

ইসলামের সৌন্দর্যকে তুলে ধরতে ব্যাংকগুলোকে
ভীতি কাটিয়ে মুদারাবা-মুশারাকায় যেতে হবে / ১৬০

ঘুষ বন্ধে নানা পদক্ষেপের সাথে রাজনীতিকেও সুস্থ করতে হবে / ১৬৭

খুচরা পর্যায়ে যেভাবে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে তা বিকৃতির নামান্তর / ১৭০

সঠিকভাবে কর সংগ্রহ করা হলে দেশীয় সম্পদ দিয়েই উন্নয়ন বাজেট তৈরি করা সম্ভব / ১৭২

ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে / ১৭৬

বাংলাদেশের দুর্নীতির অধিক প্রচার উদ্দেশ্যমূলক / ১৮২

পোশাক শিল্পে কোটা প্রথা উঠে গেলেও আমরা তা ওভারকাম করতে পারবো / ১৯০

ভারতের সাথে অমীমাংসিত ইস্যুর ব্যাপারে
আলোচনার মাধ্যমে প্যাকেজ ডিল করা উচিত / ১৯৪

জনগণকে মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে / ১৯৯

কোনো বাজেটই গণবিরোধী নয়, সব সরকার
জনগণকে সামনে রেখেই বাজেট তৈরি করে / ২০১

বোমাসন্ত্রাস বন্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে / ২০৭

স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মন্দ প্রভাবই বেশি তবে এজন্য টেলিভিশন নিজে দায়ী নয় / ২১০

চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে তেলের দাম বাড়ানো ঠিক হবে না /২১৩

www.pathagar.com

শাহ আবদুল হান্নান-এর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলাম (১৯৭৬)

ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা (১৯৮৫)

নারী সমস্যা ও ইসলাম (১৯৮৮)

Social Laws of Islam (1995)

Usul-al-Fiqh (2000)

ইসলামী অর্থনীতি ঃ দর্শন ও কর্মকৌশল (২০০২)

নারী ও বাস্তবতা (২০০২)

দেশ সমাজ ও রাজনীতি (২০০৩)

Law Ecnomics and History (2003)

বিষয়চিন্তা (২০০৪)

বিশ্ব পরিস্থিতি, অর্থনীতি ও ইসলাম বিষয়ক বিশ্লেষণ (২০০৬)

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রের মূল আদর্শ ধরে একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা দরকার

বাংলাদেশ

ইসলামের ভিত্তিতে অধিকতর ঐক্য সৃষ্টি হবে যদি আমরা জাতির অন্যান্য যে মানসিকতা আছে তাকে আত্মস্ত (absorb) করতে পারি

প্রশ্ন : ভারত বিভক্তির সময় আপনি তো কিশোর। সে সময়ের কোনো স্মৃতি মনে পড়ে কি?

উত্তর : যতটুকু মনে পড়ে ঐ সময় আমি আমাদের গ্রামের বাড়িতেই ছিলাম। সে সময় মুসলিম জনগণ খুব উজ্জীবিত ছিল বলে মনে পড়ে। আমাদের নিকটবর্তী সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল রেলওয়ে স্টেশন। স্টেশন এবং তার আশপাশের সমস্ত জায়গা দড়িতে কাগজের পাকিস্তানী পতাকা বানিয়ে সাজানো হয়েছিল। এটি ছিল ৪৭-এর ১৪ আগস্টের স্মৃতি। এর বেশি কিছু আমার মনে পড়ে না।

৪৭-এর পরও এদেশের গোটা জনগণকে খুবই উজ্জীবিত দেখেছি। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে ইন্তেকাল করেন। সে সময় আমার আব্বার পোস্টিং ছিল নারায়ণগঞ্জে। আমি সেখানেই পড়তাম। শহর থেকে সেদিন বাসায় ফিরছিলাম। এমন সময় রেডিওতে জিন্নাহ সাহেবের ইন্তেকালের ঘোষণা দেয়া হয়। লক্ষ্য করলাম এ সংবাদে সারা শহর কাঁদছে। সমস্ত লোক কাঁদছে। এটি আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। আমি হেঁটে আসছিলাম। যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিলাম সেটি ছিল পাকা রাস্তা। এক-দেড় মাইলের পথ। কায়েদে আযমের মৃত্যুর সময় জনগণের কোনো ক্ষোভ তার বিরুদ্ধে ছিল এ কথা আমি কিছুতেই বলতে পারব না। তার আগে ১৯৪৮ সালের মার্চে যে ঘটনাই ঘটে থাকুক না কেন তাতে মানুষের মতের কোনো পরিবর্তন হয়েছে এটি বলা যায় না।

প্রশ্ন : সেসব মানুষই বা কেন আবার পাকিস্তান বিরোধী হলো?

উত্তর : সত্যিকার অর্থেই এটি একটি বড় প্রশ্ন। এর উপরই হয়তোবা অনেক বই হতে পারে। আলটিমেটলি প্রশ্নটি দাঁড়ালো পাকিস্তান ভেঙে গেল কেন? প্রথমেই আমি স্বীকার করি এ বিষয়টি বিতর্কমূলক। এটিও স্বীকার করি যে এ বিষয়ে কথা বলা কঠিন ব্যাপার এবং কথা বললে ভুল বোঝাবুঝির ভয় থাকে। কেননা মানুষের স্বভাব হচ্ছে, যে স্পিরিটে বলা হয় সে স্পিরিট না দেখে বরং সবকিছুতেই একটি উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা। তা সত্ত্বেও কেন পাকিস্তান ভেঙে গেল সে বিষয় ঐতিহাসিকভাবে এসেসমেন্ট করা হয়। আমাদের

www.pathagar.com

দেশেও আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান প্রমুখ ব্যক্তি, পাকিস্তানের চিন্তাবিদ, নেতৃবৃন্দও এরকম এসেসমেন্ট করেছেন। এ ব্যাপারে আমার নিজের আন্ডারস্টান্ডিং ভুলও হতে পারে।

৪৯-এ আওয়ামী লীগ হলো। তারা ৫২'র পরে ক্রমেই শক্তিশালী হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই তারা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশে তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার বিরোধী অবস্থান নেয় এবং নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে শুরু করে। সরকারে থাকাকালীন ৫৬-৫৭ সালের সময়টুকু ছাড়া ৭০ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ একটি বিরোধী দল ছিল। আমাদের দেশে বিরোধী দল স্বাভাবিকভাবে যেটি করে থাকে তারাও সেভাবেই সরকারের সকল পলিসির বিরোধিতা করতে থাকে এবং সে সাথে জনমতকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করাতে চেষ্টা করে। তারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে একটি বিষয়ে বোঝাতে সক্ষম হলো যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য করা হচ্ছে। এ বৈষম্যটিকে রাজনীতিবিদ বা অর্থনীতিবিদরা যে যেভাবেই মূল্যায়ন করুক না কেন, আওয়ামী লীগ জনগণকে বোঝালো একটি বৈষম্য রয়েছে। ফলে এদেশের জনগণ মানসিকভাবে তৈরি হলো - not for separation, তবে এজন্য যে এ বৈষম্যের অবসান হওয়া দরকার।

এর মধ্যে আরেকটি দিক লক্ষণীয় ছিল। এ বৈষম্যের অনুভূতি আরো বৃদ্ধি পেল আইয়ুব খানের মার্শাল ল'র কারণে। মার্শাল ল'তে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু সবসময় একদিকেই থাকে। আর সে হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানই হলো সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। তিনি নিজেও পশ্চিম পাকিস্তানের। একদিকে যেহেতু অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে এর সাথে এসে আবার যোগ হলো রাজনীতিক কর্তৃত্বের বৈষম্য। আইয়ুব খান যদি ইস্ট পাকিস্তানের হতেন তাহলেও কিছুটা ব্যালান্সড হতো এজন্য যে অর্থনীতিটা গেছে ওদের দিকে আর রাজনীতিটা এসেছে এদিকে। যাহোক মার্শাল ল' বৈষম্যকে বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে আমার উপলব্ধি হলো ১৯৭১-এর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রেট মেজরিটি কখনো পাকিস্তান ভাঙতে চায়নি। এখানকার জনগণ বৈষম্যের অবসান চাচ্ছিল, সত্যিকার গণতন্ত্র চাচ্ছিল। এ অঞ্চলের লোকেরা সমতা চাচ্ছিল। সেটি কতটা প্র্যাকটিক্যাল ছিল বা কতটা ছিল না আমি সে প্রশ্নে যাচ্ছি না, সেটি অন্য প্রশ্ন। সেটি কতটা সময়ের ব্যাপার ছিল তা আমি বলছি না। তবে ৭১-এর মার্চ থেকে অবস্থার পরিবর্তন হয়। এখানে সে সময় পাকিস্তানী মিলিটারি মিশন যে ভূমিকা নেয় তাতে মানুষ নির্যাতিত হয়। নানাভাবে তারা অসন্তুষ্ট হয়। ফলে তাদের মূল্যায়নও নতুন হয়ে যায়। কাজেই আমি বলবো পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে হঠাৎ করেই এক বছর সময়ের মধ্যে।

এটি ঠিক যে এ সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কিছুটা বিভেদ, বিদ্বেষ, কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি, কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছিলো। এটি ছিল ৭০ পর্যন্ত। কিন্তু হঠাৎ করেই ৭১ এর মার্চে এসে যে ঘটনা ঘটলো সে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে।

প্রশ্ন : আপনার আলোচনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা এসেছে। সে সময় ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানে ভারত একটি বিশেষ ফ্যাক্টর হিসেবে দেখা দিয়েছিল। সেটিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : এসব ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি জাতি যদি ভেতরে ভেতরে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে যে আমি থাকব না, বেরিয়ে যাব - তাহলে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট কিভাবে সাহায্য করতে পারে? একটি পর্যায় গিয়ে আন্তর্জাতিক ফোর্স আর এটিকে সাহায্য করতে পারে না।

www.pathagar.com

৭১-এর মার্চের পর কয়েক মাসের মধ্যে জনগণের মত যে অবস্থানে চলে যায় তাতে আন্তর্জাতিকভাবে কিছু করার ছিল বলে আমার মনে হয় না। তবে দুটি কথা। মোটামুটি বলা যায় আমেরিকা অবশ্যই চেয়েছিল অন ব্যালান্স, পাকিস্তান এক রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকুক। কেবল পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরাই নয় বাংলাদেশের রাজনীতিবিদরাও এ মতের পক্ষে লিখছেন বা বলছেন যে ভারত তার স্বার্থেই এটি করেছে। কিন্তু আজকে যখন ভারত-বাংলাদেশ বিতর্ক আসে এবং ভারতের মন্ত্রীরা যখন স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমরা তোমাদের জন্য এটি করেছিলাম, আমরা তোমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছি অথবা তোমাদের জন্য এই এই করেছি তখন বাংলাদেশের পক্ষে এ জবাবটা দেয়া হয় যে আপনারা নিঃশর্তে বা বিনা শর্তে কোনো কিছু করেননি - আপনারাও আপনাদের স্বার্থেই করেছেন। এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে পাকিস্তান-ভারত যে সম্পর্ক ৪৭ থেকে চলছিল সেখানে ভারত যে কোনো সুযোগের অপেক্ষা করবে। এমনকি এটি খুবই পরিষ্কার যে ভারত সুযোগের অপেক্ষাই শুধু করবে না সুযোগ সৃষ্টি করবে, সুযোগও কাজে লাগাবে। ভারত দুটি কাজই করেছে। এ অঞ্চলের সাথে ঐ অঞ্চলের বিরোধ বাঁধুক এটি চেয়েছে এবং তার সুযোগ সে কাজে লাগিয়েছে। এ কথা কোনোভাবেই বলা ঠিক হবে না যে শুধু কিছু বামরাই বাংলাদেশ করার পেছনে ভারতের সম্পৃক্ততার কথা বলে। ভারতের উদ্যোগ আর যোগসাজশের কথা ইসলামিস্টরাও বলে। অন্যারাও একই কথা বলছেন।

আবুল হাসান চৌধুরী মন্ত্রী থাকাকালে আমরা একবার তার সাথে দেখা করতে গেলাম। আমরা দুজনেই বন্ধু। তিনি মাত্র দিল্লী থেকে পাকিস্তান হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। এর কয়েকদিন আগে ইন্ডিয়া নিউক্লিয়ার বোমা ব্লাস্ট করে। তিনি মন্তব্য করেছিলেন পাকিস্তান যদি বোমা বিস্ফোরণ না করতো তাহলে ভারতের ঐ সমস্ত উগ্র লোকদের পাল্লা থেকে আমাদের কারোর নিস্তার থাকতো না। সে সাথে তিনি তার প্রচণ্ড খুশি প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আমাকে ভারতীয়দের উদ্ধৃতি কোট করে পড়ে শুনিয়েছেন, ভারতের লোকেরা বলেছে এককালে লংকা বিজয় করে বিজয় সিং যেমন কাজ করেছে তেমনি অটল বিহারী বাজপেয়ী সে কাজ করেছে। তাদের উগ্র আস্ফালনে ভারত কাঁপছিল। তিনি জানালেন, পাকিস্তানের বোমা বিস্ফোরণের পরেই তারা ঠাণ্ডা হয়।

কাজেই আমি মনে করি এটি যে শুধু কিছু বাম এবং ইসলামিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি তা ঠিক নয়। এটি সবার কথা যে ভারত তার নিজের স্বার্থেই বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে, বাংলাদেশের জন্য করেনি। এ ব্যাপারে খুব একটা দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই।

প্রশ্ন : এ স্বার্থটা কি ধরনের ?

উত্তর : রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সব ধরনের। পাকিস্তান ভাঙা তার রাজনৈতিক স্বার্থ। অর্থনৈতিক স্বার্থ তো আছেই। আর বাংলাদেশকে তার মার্কেটে পরিণত করা, যা আগে ছিল না।

প্রশ্ন : একই সাথে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন হলো। ভারতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল কিন্তু পাকিস্তানে পেল না। এ বিষয়টিকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : এ কথার মধ্যে অনেক কথা রয়েছে। অনেক প্রশ্ন আছে। একটি প্রশ্ন হলো পাকিস্তানে সংবিধান ছিল কিনা? ছিল না একথাটি সত্য নয়। Pakistan from the first day was being run under a constitution. ১৯৩৫-এর এক্টের মাধ্যমেই পাকিস্তান শাসিত হচ্ছিল শুধু কতগুলো ধারা সংশোধন করে। ভারতের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

তারাও ১৯৩৫-এর এক্ট মোতাবেক শাসিত হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতের সৌভাগ্য যে তারা ১৯৫০ সালে সংবিধান তৈরি করে ফেলল। কিন্তু পাকিস্তানের রাজনীতিবিদরা তা করতে পারলেন না। তাদের সংবিধানের প্রথম ড্রাফট ৫২-তে হয়েছিল। ৫৪-তেও একটি ড্রাফট হয়েছিল। তবে এগুলো তারা পার্লামেন্টে পাস করতে পারেনি। ৫৬-তে এসে অবশেষে এটি পাস হলো। কিন্তু বাস্তবে পাকিস্তানের সংবিধান ব্যতীত একটি মুহূর্তও যায়নি। ৩৫-এর এক্ট ছিল গণতান্ত্রিক। তখন প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার ছিল নির্বাচিত।

এখানে একটি কথা না বললে গ্যাপ থেকে যাবে। গণতন্ত্র চর্চার প্রশ্নে কারোর লাক ফেভার করে কারো করে না। ভারতের ভাগ্য ফেভার করেছে, সেখানে মিলিটারি ক্যু হয়নি এবং তারা গণতান্ত্রিক পথে চলতে পেরেছে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে একটি দুর্ভাগ্য হলো যে গোলাম মোহাম্মদের মতো লোকেরা উপরে চলে আসে। এর সুযোগ নিলেন আইয়ুব খান। আবার যে কোনোভাবেই হোক ইস্কান্দার মির্জার মতো লোক নেতৃত্বে চলে আসে।

পাশ্চাত্যের অনেকে থিওরি দিয়েছে Muslims are not fit for democracy. এটি একটি থিওরি, যার সত্যিকার কোনো ভিত্তি নেই। এটি একটি ইমোশনাল বক্তব্য। তেমনিভাবে যদি বলা হয়, ভারতের প্রশ্নে তারা বলে they are fit for democracy এবং এ ক্ষেত্রে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জনগণ আনফিট - এ কথা সত্যিকার অর্থে মানা যায় না। আর মানার কোনো রেশনাল যুক্তিও নেই। কারণ এ বাংলা গণতন্ত্রের অধীনে ছিল ১৯৩৫ সাল থেকে। তখন পূর্ব বাংলা থেকে কলকাতার দুজন চিফ মিনিস্টার ছিল। একজন খাজা নাজিমউদ্দিন এবং অন্যজন একে ফজলুল হক। তৃতীয় চিফ মিনিস্টার ছিল পশ্চিম বাংলা থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পাঞ্জাবে যে সরকার হয়েছিল তারা শুরু থেকেই ৩৫-এর এক্টে চলছিল। সিন্ধুতে ডেমোক্রেটিক সরকার ছিল। তাই এ এলাকায় যে গণতন্ত্র ছিল না এ কথাটি ঠিক নয়। তবে কিছু লোক সবসময়ই বিরুদ্ধে বলতে থাকে এবং সে সাথে মুসলমানরা গণতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত নয় বলে বিভ্রান্তি ছড়াতে চায়। প্রকৃতপক্ষে এগুলো ভিত্তিহীন এবং সঠিক নয়।

ইতিহাসের বিপর্যয় কারো কারো উপর হয়। কোনো ফ্যামিলিতে দু-চারটা দুর্ঘটনা ঘটে। কোনো ফ্যামিলিতে দুর্ঘটনা ঘটে না। আমি বলব, তেমনি দুর্ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানের ইতিহাসে। সে তুলনায় ভারত ভাগ্যবান। ভারত নেতৃত্ব পেয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে দুই শীর্ষ নেতাই চার বছরের মধ্যে মারা যান। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮-এর ১১ সেপ্টেম্বর এবং লিয়াকত আলী খান ১৬ অক্টোবর ৫২-তে মারা যান। ফলে পাকিস্তানে দুর্ভাগ্য পেয়ে বসে। তা নাহলে গোলাম মোহাম্মদের মতো লোক উপরে আসে না। তিনি এসে নির্বাচিত গণপরিষদ বাতিল করে দেন। এরপর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ৫৬-তে এসে আবার নতুন পার্লামেন্ট গঠন হয়। গণপরিষদ বাতিলকে জাস্টিস মুনির বৈধ ঘোষণা করলেন। তিনি যদি বৈধ ঘোষণা না করতেন তাহলে হয়তো অন্যরকম হতো। বরং সাথে সাথে অর্ডারও দিলেন যে নতুন গণপরিষদ গঠন করতে হবে।

কাজেই এটি একটি বড় প্রশ্নের অংশ যে, মুসলিম জাতি গণতন্ত্রের জন্য অনুপোযুক্ত কিনা? মুসলিম জাতিই প্রথম জাতি যারা গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য চালু করে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খেলাফত হলো। প্রতিনিধিত্বশীল সরকার হলো। আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব, মানুষের প্রতিনিধিত্ব, রাসূলের প্রতিনিধিত্ব। খলিফা একই সঙ্গে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে, রাসূলের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবে। সে জাতিকে কী করে বলা যেতে পারে নট ফিট ফর ডেমোক্রেসি।

www.pathagar.com

ইসলামের কথা বড় সুন্দর। সূরা হুজরাতে বলা হয়েছে, কোনো জাতির বিরুদ্ধে তোমরা তাদেরকে খারাপ জাতি বলে জেনারেল জাজমেন্ট করো না। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কথা। আমাদেরও বলা উচিত নয় যে ওয়েস্টার্নরা এরকম কিংবা খৃষ্টান বা ইহুদীরা এরকম। সবাইকে এক কাতারে ফেলা কুরআনের মূল স্পিরিট বিরোধী। যদি আমরা এমন করি, তাহলে ভুল করি। এসব মিলিয়ে কেন পাকিস্তানে এরকম ঘটনা ঘটল এবং কেন ঘটনা ঘটল না এ প্রশ্নের যারা খুব সাধারণ ব্যাখ্যা করবেন তারা অবিচার করবেন। এটি কিছুটা কাকতালীয়, কিছুটা এক্সিডেন্ট অব হিস্ট্রি। হিস্ট্রিক্যাল এক্সিডেন্ট, হিস্ট্রিক্যাল ইভেন্ট, সারকামসটেন্সেস - এগুলো না জেনে বুঝে যারা মন্তব্য করেন, কোনো জাতিকে নিন্দা করেন, সামগ্রিকভাবে তারা ঠিক করেন না।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আদর্শ কি হওয়া উচিত?

উত্তর : অনেক সঙ্গতকারণ রয়েছে যার জন্য রাষ্ট্রের প্রধান আদর্শ ইসলাম হওয়া উচিত। এখানে প্রধান আদর্শ বলার কারণ আমাদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা থাকা সত্ত্বেও কিছু কথা স্পষ্ট করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। আধুনিক যুগে সমাজ বা চিন্তার ক্ষেত্রে যে বিকাশ হয়েছে তাতে কতগুলো কথা স্পষ্টত বলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমাদের বর্তমান সংবিধানে চারটি মূলনীতির কথা বলা আছে। ইসলামকে সেখানে প্রথম স্থান দিয়ে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ আর সমাজতন্ত্রের একটি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আমি মনে করি যে ফর্ম আছে সেটি থাকতে পারে। সেখানে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলা আছে সমাজতন্ত্র হলো সোশ্যাল জাস্টিস বা সামাজিক ন্যায়বিচার। যদি সে অর্থেই হয় তাহলে এটি থাকতে কোনো অসুবিধা নেই। সেখানে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদের অনেক অর্থ আছে। এমন অর্থও আছে যেটি আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য কল্যাণকর নয়। কিন্তু সংবিধানে যে অর্থে জাতীয়তাবাদের ব্যবহার এখানে করা হয়েছে সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের স্বার্থ। সেটি বাংলাদেশের মৌলিক স্বার্থ এবং সঠিক স্বার্থ। এ অর্থে জাতীয়তাবাদ শব্দ ব্যবহারের মধ্যে আমি কোনো ত্রুটি দেখি না। শব্দেরও অনেক বিবর্তন হয়েছে। শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার আছে। আগে যে অর্থে শব্দের ব্যবহার হতো আজকে সে অর্থেই ব্যবহৃত হতে হবে তা একেবারেই জরুরী নয়।

আমি ইসলামী আদর্শে বিশ্বাস করি। সঙ্গত কারণেই বিশ্বাস করি। যুক্তি এবং ঈমানের ভিত্তিতে বিশ্বাস করি। আমি মনে করি ইসলাম রিপ্রেজেন্টস দ্য টোটালিটি অব ট্রুথ এবং এর বাইরে কিছুই নেই। অর্থাৎ গণতন্ত্র, সোশাল জাস্টিস সবই ইসলামের অংশ। জাতীয় স্বার্থ, এটিও ইসলামের অংশ। কিন্তু সব মানুষ এটিকে সেভাবে জানে না, বোঝে না। সেখানে যদি বিতর্ক অবসানের জন্য ইসলামকে অগ্রাধিকার দিয়ে গণতন্ত্রকে উল্লেখ করা হয় তাহলে তাতে সমস্যা দেখি না। সমাজতন্ত্র শব্দকে পরিহার করলে ভালো হয়। সমাজতন্ত্রের বদলে সোশাল জাস্টিস বলা যেতে পারে। যদি এর একটি ব্যাখ্যা দেয়া হয় এবং এতে জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্ষতি কী?

বাংলাদেশের জনগণ জাতীয়তাবাদে পূজার ভাব আছে বলে মনে করে না। এখানে জাতীয়তাবাদ মানে জাতীয় স্বার্থ। কাজেই ইসলামের ভিত্তিতে অধিকতর ঐক্য সৃষ্টি হবে যদি আমরা জাতির অন্যান্য যে মানসিকতা আছে তাকে আত্মস্থ (absorb) করতে পারি। ন্যাশনালিজমকে আত্মস্থ করার মধ্যে আমি কোনো সংকট দেখি না। আমি ইসলামে গণতন্ত্র বলার মধ্যে কোনো অসুবিধা দেখি না। এমনকি সোশাল জাস্টিসের মধ্যে একেবারেই দেখি না। এটি তো ইসলামেরই একটি অংশ। আমাদের এ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে যে সমাজতন্ত্র

www.pathagar.com

শব্দটি পরিহার করা হোক। আমিও তার পক্ষে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থে, জাতির ঐক্যের জন্য যদি এটি এভাবে রাখতে হয় অর্থাৎ সমাজতন্ত্র মানেই সোশাল জাস্টিস, যেটি জিয়াউর রহমান সাহেবের সময় করা হয়েছিল, তার মধ্যেও আমি কোনো সমস্যা দেখছি না।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের ভৌগোলিক নিরাপত্তার প্রশ্নে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

উত্তর : নিরাপত্তা অবশ্যই একটি জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যেমন একজন ব্যক্তির জীবনেও গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট জিওগ্রাফি থাকে। অতীতে এমন হয়েছে রাষ্ট্রের সীমানা নিয়ে নানা বিরোধ ছিল পৃথিবীর প্রায় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেই। কিন্তু বর্তমানে বিরোধ তেমন নেই। ম্যাপ স্টাডির বিজ্ঞান উন্নত হওয়ায় প্রায় প্রত্যেক দেশের সীমানাই সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয়ে গেছে। মাত্র কিছু দেশের মধ্যে পারস্পরিক বর্ডার সমস্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে। সেসব সুনির্দিষ্ট মানচিত্রের ডকুমেন্ট আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় সংরক্ষিত থাকায় এ সংক্রান্ত কোনো কথা উঠলে তা সহজেই মীমাংসা করা সম্ভব।

নিরাপত্তার প্রশ্নে বাংলাদেশের প্রেক্ষিত স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের জনগণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে একটি বিতর্ক রয়েছে যে এ নিরাপত্তা কিভাবে? সে বিতর্ক আবার কতটা ইন্টেলেকচুয়াল আর কতটা পার্টিজান (দলীয়) সেটি চিন্তার বিষয়। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। বাংলাদেশের তিন দিকেই রয়েছে ভারত। আরেকদিকে সমুদ্র। সামান্য কিছু অংশে বার্মা। এ পরিস্থিতিতেও বলা হয় না, ভারতের বিপক্ষে আমরা কোনো অবস্থাতেই একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব না এবং ভারতকে প্রতিরোধ করার মতো শক্তি আমাদের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে কেউ কেউ চিন্তা করেন আমাদের এত বড় একটি সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন নেই। আমাদের একটি সামরিক বাহিনী দরকার শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যেগুলো পুলিশ বাহিনী মোকাবিলা করতে পারবে না।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, যে কোনো ডিফেন্স পলিসিতে একটি মূল উপাদান হচ্ছে, হু ইজ দি পারসিভড এ্যানিমি - কে শত্রু হবে আগে তাকে চিহ্নিত করা। সে হিসেবে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পারসিভড এ্যানিমি যদি কখনও হয় তাহলে একমাত্র ভারতই হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা ভারতের মোকাবিলা করতে পারব না। এটি এ দৃষ্টিভঙ্গির কথা। সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনী শুধুমাত্র আমাদের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনেই দরকার। কেননা নানা কারণে আভ্যন্তরীণ কাজে পুলিশ ও বিডিআর-এর সাপোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেনাবাহিনীই শুধু দরকার। যাতে তারা প্রয়োজনে দেশের শৃঙ্খলার দায়িত্ব নিতে পারে।

কিন্তু আমি আন্তরিকভাবে কোনো রকম পার্টিজান ডিবেটে না গিয়ে, কোনো রকম পক্ষপাতমূলক কথা না বলে বলব, আমি মনে করি এ ডিবেট একটি আরোপিত ডিবেট যে ডিবেট হওয়া উচিত ছিল না। ডিবেট এ রকম হওয়া উচিত ছিল যে আমাদের রিসোর্স কতটা সামরিক বাহিনী সাপোর্ট করতে পারে? আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে এমন একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা যে সামরিক বাহিনী ভারতের বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। সেটির জন্য সময়ের কথা কেউ বলতে পারে। কিন্তু কেউ যদি বলে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই বা প্রয়োজন কম, এটি আমার কাছে মনে হয় মতামতের প্রকাশ নয় বরং কোনো এজেন্ডার প্রকাশ।

কি ধরনের সেনাবাহিনী আমাদের দরকার এটি তো সামরিক বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারবেন। সাধারণভাবে বলা হয় একটি বাহিনী তার তিনগুণ শক্তির বাহিনীকে ডিফেন্ড করতে পারে। অর্থাৎ এক লক্ষ আর্মি ৩ লক্ষের বিরুদ্ধে ডিফেন্স করতে পারে। ডিফেন্ডিং পজিশনে কম

www.pathagar.com

লোক লাগে। সেদিক থেকে আমাদের সেনাবাহিনী ভারতের সেনাবাহিনীর ওয়ানথার্ড থাকা দরকার। ভারতের সেনাবাহিনী বর্তমানে ১২ লাখ যেখানে, সেখানে আমাদের থাকা উচিত ৪ লাখ। ভারতের সেনাবাহিনীর ৮০ ভাগ ওয়েস্টার্ন বর্ডারে এবং কাশ্মীরে। ২০ ভাগ সৈন্য অন্যান্য বিভিন্ন প্রয়োজনে রাখতে হয়। সুতরাং আমাদের সৈন্যবাহিনী যদি ১ লাখ থাকে তাহলে তাকে আড়াই থেকে ৩ লাখে গড়ে তুলতে হবে আর ভারত যদি ২৪ লাখ করে আমাদেরকেও সে হারেই বাড়াতে হবে। এটি অবশ্য স্বল্পমেয়াদে হবে না।

এখন কেউ বলতে পারে সেনাবাহিনী ক্যু করে। ক্যু করার জন্য আড়াই লাখ লাগে না। ১ লাখ হলেই হয়। ৫০ হাজার সৈন্যবাহিনীই পারে। যেমন ক্ষুদ্র বাহিনী কর্তৃক মরিসাসের ক্যু। যদি সৈন্যবাহিনী না থাকে তাহলে বিডিআরও ক্যু করতে পারে। বিডিআর না থাকে পুলিশও ক্যু করতে পারে। কাজেই ক্যু করার ভয়ে সেনাবাহিনী না রাখার যুক্তি আমি বুঝি না। আমি নিজে মনে করি যে আমাদের একটি স্ট্রং ডিফেন্সই রাখতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে এগুলো কেমন হবে? এগুলো মিলিটারি বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার। কিন্তু যে ধরনের নেভি, এয়ারফোর্স আমাদের রাখা সম্ভব সেটি রাখতে হবে। স্থলবাহিনীই বেশি রাখতে হবে। এয়ারক্রাফট আমরা বেশি রাখতে পারব না। আমাদের সাইজ ছোট, কান্ট্রির ডেপথ কম বলে এয়ারক্রাফটের মুভমেন্টের সমস্যা আছে। আবার স্ট্রং এয়ার বম্বিং-এর বিপরীতে স্থলবাহিনী মুভ করতে পারে না। এসব দিক বিবেচনা করে আমাদের লেটেস্ট ক্ষেপণাস্ত্র থাকতে হবে।

বাংলাদেশের পারসিভড এ্যানিমি ইন্ডিয়া - এ ব্যাপারে মোটামুটি সবাই একমত। যেমন পাকিস্তানের পারসিভড এ্যানিমি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ার পারসিভড এ্যানিমি পাকিস্তান। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে তার ডিফেন্স পলিসিতে পারসিভ এ্যানিমিকে ধরে নিতে হয়। এটি ধরেই মিলিটারি প্লান করতে হয়। সেসব দিক ধরে নিয়েই আমি বলছি আমাদের ডিফেন্স ফোর্স হয়তোবা ইন্ডিয়াকে ফাইনালি ট্যাকল করতে পারবে কিনা বলা মুশকিল। যদি তাই হয় তাহলে আমাদেরকে জনগণ বা অন্তত এর একটি অংশকে সামরিকভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে কিছুদিন যুদ্ধের পর একটি 'জনযুদ্ধ' দেখা দিতে পারে। জনগণ যদি সম্পৃক্ত হয় তাহলে যতবড় কলোনিয়াল পাওয়ারই হোক না কেন সময় বেশি লাগলেও তা একটি অভীষ্ট পর্যায়ে যেতে বাধ্য। এ সবকিছুই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এ বিষয়টিকে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কোনোভাবেই শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখা উচিত নয়। সত্যিকারভাবে, বাস্তবসম্মত যে ডিফেন্স পলিসি হওয়া উচিত আমাদের তাই করতে হবে।

প্রশ্ন : এ ক্ষেত্রে আমরা সামরিক বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধি করবো, নাকি ইকুইপম্যান্ট বাড়াবো?

উত্তর : আমি যতটুকু বুঝি আমাদের দুই সেক্টরেই বৃদ্ধি করতে হবে। সামরিক বাহিনীর কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে যেসব ইকুইপমেন্ট বর্তমানে লেটেস্ট ও এভেলেবল্ সেসবই সংগ্রহ করতে হবে। এখানে কোয়ালিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো আস্তে আস্তে করতে হবে। ইকুইপমেন্ট ফার্স্টক্লাস হতে হবে এবং তা আমাদের ইকোনোমি সাপোর্ট করে কিনা দেখতে হবে। ইকোনমিক সীমাবদ্ধতাকে সামনে রেখেই এটিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে হবে। আমাদের সৈন্যবাহিনীর ট্রেনিং ভালো। একটি স্টান্ডার্ড ট্রেনিং তারা পেয়েছে। এরা বৃটিশ এবং পাকিস্তান থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। এরা ৬৫-এর যুদ্ধেও বেশ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। আমাদের আর্মির ম্যান পাওয়ারকে প্রশিক্ষণের দিক থেকেও হাইলি কোয়ালিফাইড হতে হবে। রিক্রুটমেন্টের সময় শারীরিক যোগ্যতা কোনোভাবেই কম হওয়া যাবে না। আমাদের ১৩ কোটি মানুষ থেকে শক্তিশালী লোক বের করা কঠিন কিছু নয়। এ ব্যাপারে বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া যাবে না।

www.pathagar.com

কাজেই এ কথা বলা ঠিক হবে না যে আমরা শুধু ইকুইপমেন্ট বাড়াই এবং জনবল কম রাখি। একটি দেশের একটি ডেপথ থাকে, ওয়ারের একটি ফ্রন্ট থাকে। ইন্ডিয়ার সে ফ্রন্ট বেশ বড়। আমেরিকাকে তার ডিফেন্স পলিসি ঠিক করতে হয়েছে রাশিয়া এবং চায়নাকে পারসিভড এ্যানিমি ধরেই। এটি ধরতেই হবে, না ধরে কেউ তার ডিফেন্স পলিসি ঠিক করতে পারবে না। কাজেই আমাদেরকেও এটি করতে হবে। এটিকে জোর দিয়ে বলার কারণ এতে যেন কোনো ভুল বোঝাবুঝি না হয়। ইট ইজ এন এক্সপ্রেশন অব রিয়ালিটি, এক্সপ্রেশন অব ট্রুথ, নিড এন্ড প্রাকটিক্যাল উইজডম।

প্রশ্ন : অনেক দেশেই সবার জন্যই সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশে এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

উত্তর : আমি অলরেডি বলেছি অলটারনেটিভ প্রশ্নে জনযুদ্ধের জন্য তৈরি হতে হবে। তার জন্য মিলিটারি এক্সপার্টরা যা কিছু বলে তা করতে হবে। ১৩ কোটি লোককে ট্রেনিং দেয়া বাস্তবে সমস্যাজনক। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই মিলিটারি এক্সপার্টদের স্টাডি আছে। আমরা এজন্য স্কাউট আন্দোলনকে জোরদার করতে পারি। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক যে ক্যাডেট কোর আছে তাকে আরো সম্প্রসারণ করতে পারি। এজন্য আমরা ইনসেনটিভ বাড়াতে পারি। আবার ৩০ বছর বয়সের মধ্যে একবার বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ারও আমি বিরোধী নই। এটি একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এজন্য এটি অন্তত করা যায় যে যারা কলেজে উঠবে তাদের সকলকেই মিলিটারি ট্রেনিং নিতে হবে। এদের মধ্য থেকেও আবার ফিটনেসের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ বাছাই করতে পারে। আর যাদেরকে সিলেক্ট করা হবে তারা এটিকে পরিহার করতে পারবে না। এরকম কিছু চিন্তা করা যায়। কিন্তু এটি স্টাডির ব্যাপার।

প্রশ্ন : নিরাপত্তার বিষয়ে পররাষ্ট্রনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তর : প্রথম দিকটি হবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা। এটি হবে, ডিমান্ড অব উইজডম এন্ড ডিমান্ড অব রিয়ালিটি। এজন্য কোনো প্রকার বেসিক ইন্টারেস্ট বিসর্জন না দিয়ে, সার্বভৌমত্বকে ধরে রেখেই ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। এটি একটি সেনসেটিভ বিষয়। এটিকে আমাদের সাবধানে ডিল করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বার্মার সঙ্গে আমাদের বর্ডার আছে। বার্মার আভ্যন্তরীণ রাজনীতি যাই হোক না কেন নানাকারণেই বার্মার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো রাখা উচিত।। এ সম্পর্কের ক্ষেত্রে বার্মার সরকার সামরিক না সিভিল তা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। অন্যদিকে চায়নার সঙ্গে বর্ডার না থাকলেও তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। সম্ভব হলে গভীর করতে হবে।

পররাষ্ট্রনীতির একটি বড় কথা হবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। ওআইসি ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা দরকার। এজন্য ওআইসিকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন। আমার দৃষ্টিতে ওআইসির নিজেরই একটি সিকিউরিটি কাউন্সিল করতে হবে। জাতিসংঘের যদি একটি সিকিউরিটি কাউন্সিল থাকে তাহলে ওআইসির কেন থাকবে না? এটি বাস্তবে প্রয়োজনও। গত ১৫/২০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি জাতিসংঘের উপর ছোট রাষ্ট্রগুলো নির্ভর করতে পারে না। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আরো পারে না। এ অবস্থায় আমরা যতই বলি না কেন আমরা দুর্বল, একে সবল

www.pathagar.com

করাই আমাদের কাজ, দুর্বল করা নয়। সে কাজটিই আমাদের করতে হবে বলে আমি মনে করি। ওআইসির সিকিউরিটি কাউন্সিলে শুধু ভেটো পাওয়ার থাকবে না। সিদ্ধান্ত নিতে মেজরিটি লাগবে। এ মেজরিটির জন্য যে কোনো একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এখানে ভেটো পাওয়ার বাতিল করাই বাঞ্ছনীয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় পররাষ্ট্রনীতি হবে ভারত, বার্মা, চায়না এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। এ চারটির পর পঞ্চম দিক হবে আমাদের অর্থনৈতিক ডিপ্লোমেসি অর্থাৎ আমাদের ট্রেড ইন্টারেস্ট বাড়ানো। আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্যেই এটি দরকার।

প্রশ্ন : পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে যতটা সম্ভব আমাদেরকে সুসম্পর্ক রক্ষা করেই চলতে হবে। বর্তমান অবস্থার কথা বিবেচনা করে বলা যায় সেখানে এখন ছাত্র না পাঠালেও চলবে। কিন্তু তাদের টেকনোলজি আমাদের দরকার। তাদের মতো আমাদেরও একটি ট্রেড ইন্টারেস্ট আছে। আমাদের জনসংখ্যা বিশাল। জিডিপি ৪০৭ ডলার। কাজেই আমাদের স্বার্থেই আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখব। আবার তারাও তাদের স্বার্থেই আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে। এটিই আন্তর্জাতিক ট্রেড ও সম্পর্কের ভিত্তি যে, প্রত্যেকেরই প্রত্যেকের প্রয়োজন। একলা চলরে বলা যায়, কিন্তু আসলে একলা চলা যায় না।

আবার আমাদের এটিও জানতে হবে যেহেতু বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ, ওয়েস্টের সাথে আমাদের একটি বিরোধ রয়ে গেছে। ওয়েস্ট মনে করে, দেয়ার ইজ এ ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন। তারা শক্তিশালী। দুর্বলকে দাবিয়ে দিতে হবে, নিপ ইন দ্য বাড, যাকে বলে অঙ্কুরে বিনাশ করা - এ পলিসি তারা কিছুটা বলে আবার কিছুটা বলে না। কেউ কেউ রামসফিল্ডের মতো প্রকাশ্যে বলে ফেলে। যেহেতু মুসলিম বিশ্বকে তাদের সঙ্গে এ সম্পর্ক রাখতে হবে তাই সম্পর্ক রাখার সময় সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্বন্দ্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে হবে। সংঘাত প্রশ্নে একটি ডায়ালগের দরকার ছিল অথবা দরকার ছিল পারস্পরিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা সহাবস্থানের। আমাদের এ চিন্তা বাদ দিতে হবে যে আমরা দুনিয়াকে জোর করে দখল করে নেব। এ চিন্তা যদি থাকেও তাহলে তা বাস্তব কোনো চিন্তা হবে না। আমরা এ চিন্তা করলে অন্যরাও একই চিন্তা করতে পারে। ফলে তখন যার জোর বেশি সে এগিয়ে যাবে। ইসলামিস্টদের অফিসিয়াল পলিসি এটি হওয়া উচিত নয় যে, শক্তির জোরে আল্লাহর বাণী সবখানে ছড়িয়ে দেব। এটি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। ইসলামের বাণী পৌঁছানোর জন্য দেশে দেশে যেতে হবে, দেশ দখল করে শোনাতে হবে - এর আর কোনো প্রয়োজন নেই। এখন দুনিয়ার সব দেশেই স্থানীয় মুসলিম আছে। তারা এ কাজটি করতে পারে। এটি গেল একটি দিক।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের দাওয়াত রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট, ফ্যাক্সের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব। জোর করে কিছু করা কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত ব্যাখ্যা নয়। পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়েছে। সে পরিস্থিতিতে এরকম ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নেই, অবকাশও নেই। যারা শক্তির চিন্তা করেন তারা ঠিক চিন্তা করছেন না। তাহলে অন্যরাও একই চিন্তা করবে। এটি একটি মানবতা বিরোধী কাজ। বরং আমি যেটি সঠিক বলে মনে করি তাহলো 'লাইকরাহা ফিদ্‌দীন' এর আলোকে কাজ করা যে, ধর্মে কোনো জোরজবরদস্তি নেই। আমার দায়িত্ব বাণী পৌঁছে দেয়া, আমি তাই দিচ্ছি। আমাদের কোনো থিওরিটিক্যাল ব্যাখ্যায় যাওয়া উচিত হবে না। মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। আজ হোক কাল হোক বিশ্বব্যাপী একটি সমঝোতায়

www.pathagar.com

পৌঁছাতে হবে যে আমরা রিলিজন অথবা পলিটিক্যাল কোনো প্রকারেরই জোরজবরদস্তিমূলক সাম্রাজ্যবাদের চেষ্টা করবো না। এটি করতে হবে মানবতার কল্যাণে। আমি মনে করি ইসলামের মূল ম্যাসেজ পিস, ট্র্যাংকুয়িলিটি, ফ্রিডম এন্ড নো-কম্পাল্শন্। ফিকাহ অব ব্যালান্স (ফিকহুল মুয়াজানাহ) বলে যেটি করলে ক্ষতি বেশি হয় সেটি করা উচিত নয়।

আমাদের সাথে ওয়েস্টের একটি সংঘাত আছে। এটি প্রকৃতপক্ষে তাদেরই সৃষ্টি। তারা অনেক বেশি যুদ্ধবাজ। তার প্রমাণ তাদের সাম্প্রতিক ইতিহাস। এসব মনে রেখেই তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে তারা আমাদের বন্ধু নয়। যেহেতু আমি গণক নই তাই ভবিষ্যতে কি হবে তা এখন বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কারা লড়ছে। সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী কৌশল কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পুরানো বামের একটি অংশ এবং ইসলামিস্টরা লড়াই করছে। ডেমোক্রেটরাও লড়াই করছে। আমি এ তিন দলেরই সমন্বয়ের কথা বলব। এ কাজে ইসলামের অংশটি বেশ সিনসিয়ার। বামেরও একটি অংশ সিনসিয়ার। কাজেই এদের মধ্যে এ ব্যাপারে সমঝোতা, বোঝাপড়া, যোগাযোগ হওয়া ভালো। কারণ ওয়ার্ল্ড ইম্পেরিয়ালিজম এতই শক্তিশালী যে বিষয়টিকে আমরা কোনোভাবেই আর হালকা করে দেখতে পারি না। অন্যদিকে বামদের এমন কোনো শক্তি নেই যে এ কাজ করলে তাদের শক্তি বা ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাবে।

এর কৌশল অবশ্যই ডেমোক্রেটিক প্রসেসের মাধ্যমে হতে হবে। যেমন লেখালেখি, ডেমোনেস্ট্রেশন, প্রসেশন, অবস্থান ধর্মঘট, সেমিনার প্রভৃতি। কোনোভাবেই ভায়োলেন্সের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া যাবে না। যেমন কোনো একটি দূতাবাসকে টার্গেট করা পাগলের কাজ হবে। বাস্তবে এতে কোনো কল্যাণ নেই। যে কোনো প্রকার ভায়োলেন্সের সুযোগই আমেরিকা নেবে।

প্রশ্ন : দাতাগোষ্ঠীর চাপের মুখে আদর্শিক চেতনাকে সমুন্নত রেখে কিভাবে আমরা তাদের সাথে ট্রেড রিলেশন ডেভেলপ করতে পারি?

উত্তর : ট্রেড রিলেশন সাধারণত বাই লেটারাল হয়। এজন্য এক্সপোর্ট মার্কেট দেখতে হবে। সত্যিকার অর্থে চায়না, জাপানের সাথে আমরা এক্সপোর্ট বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছি কিনা, না করলে করা উচিত। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে এরা বেশি সহানুভূতিশীল। আমাদের মুসলিম দেশগুলো বর্তমানে ট্রেড রিলেশন বৃদ্ধি করার কথা ভাবছে না কিংবা ভাবতে পারছে না। আমাদের সরকারও এগুলো হয়তো কম চিন্তা করে। এগুলো দীর্ঘমেয়াদী সুফলের ব্যাপার। যদি সরকার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে পারত তাহলে অনেক সমস্যা কমে আসত, ব্যর্থতা কমে আসত।

আমাদের মতো দেশগুলোসহ মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো যদি মনে করে আমরা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঋণ নেব এবং তারপর আর ঋণ নেব না, তাহলে তা কয়েকটি শর্তে নেয়া যেতে পারে। যদি পলিটিক্যাল কোনো চাপ থাকে তাহলে সে ঋণ নেয়া ঠিক নয়। তারা যেসব ক্ষেত্রে দিতে চায় সেসব ক্ষেত্রে নয় বরং যেসব ক্ষেত্রে আমাদের দরকার সেসব ক্ষেত্রেই ঋণ নিতে হবে। যেমন আমাদের পাওয়ার সেক্টরের প্রয়োজনে ঋণ নিতে হবে। এজন্য শর্ত সহজ হতে হবে। দেখতে হবে আমাদের কতটুকু ঋণ দরকার। সহজ শর্ত

www.pathagar.com

হলেও ঋণ পরিশোধের ক্যাপাসিটি আমাদের কতটুকু আছে, এক্সপোর্ট আর্নিং-এর কতটুকু ঋণ পরিশোধে চলে যাবে - সেসব দেখতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের নিজেদের উন্নয়ন দরকার। ৭/৮ ভাগ জিডিপি গ্রোথ দরকার। এসবের জন্য আমাদের রিসোর্স দরকার। সে রিসোর্সের সব আমাদের দেশে নেই। এসব আমাদের আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্য দিয়ে না করে বাইলেটারেলি করা উচিত। সৌদি আরব ও আরব বিশ্বের তেলসমৃদ্ধ দেশসমূহের সাথে চুক্তি করা উচিত। তারা বিভিন্ন বিদেশী ব্যাংকে যে হারে টাকা রাখে আমরাও বলবো সেখান থেকে অত টাকা আমাদের দাও, আমরা সে একই হারে রিটার্ন দেব। নাহলে কিছু কম অথবা কিছু বেশিতে দাও। এসব আমরা ভালো করে চিন্তা করিনি। আজকাল বিমানের মাধ্যমে রপ্তানীতে অনেক কম সময় লাগে। বাস্তবে মুসলিম বিশ্বই এগুলো কার্যকরভাবে চায় না। ওআইসিকে ট্রেড রিলেশন বাড়ানোর ব্যাপারে গভীর চিন্তা করতে হবে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো, মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো যদি এ সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে পারত তাহলে অর্থনৈতিক সমস্যা কমে আসত। সেসব দিক থেকে মনে হয় আমাদের ডিপ্লোমেটিক পথ ভিন্ন হতে পারত। সোজা কথায় বাংলাদেশে কোনো ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রকৃত মেধাসম্পন্ন নেতা আসলে তিনি কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাস্তা বের করে ফেলবেন। সত্যিকার অর্থে আমাদের রাজনীতি নোংরা হওয়ায় এবং তেমন কোনো মেধাসম্পন্ন নেতা বেরিয়ে না আসায় আমাদের চিন্তার পথও সংকীর্ণ হয়ে আছে।

মূল কথা হলো উন্নয়নের শর্তে আমি ঋণ নিতে না করি না। কিন্তু আমি এটিও যোগ করি যে আমরা যেন ঋণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। ঋণ যাতে একদম না নিতে হয় আমাদের সে চেষ্টাও করতে হবে। তাতে আমাদের কি ক্ষতি হবে? কিছুই হবে না। তখন শুধু আমাদের বাজেট কমিয়ে ফেলতে হবে। কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। আসলে এছাড়া আর তেমন কিছুই হবে না।

প্রশ্ন : পাশ্চাত্যের সাথে শক্তির ভারসাম্যের পার্থক্যের কারণে তাদের সাথে আমাদের সংঘাত কি চলতেই থাকবে?

উত্তর : এটি ঠিক আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের পাশে ভারত আর মুসলিম বিশ্বের প্রতিবেশী পাশ্চাত্য। আমেরিকা সে হিসেবে দূরবর্তী প্রতিবেশী। তাদের শক্তিকে আমাদের মেনেই চলতে হবে। এজন্য আমাদেরকেও কিছুটা সংযত হতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে। আমাদের প্রযুক্তির ভিত্তি মজবুত করতে হবে। প্রযুক্তির ভিত্তি মজবুত না হলে শক্তিশালী ডিফেন্স হবে না। অনেক আগে থেকেই মুসলিম বিশ্বকে বিজ্ঞানের উপর অর্থ ব্যয় করার দরকার ছিল।

আমরা ধরে নিচ্ছি লংটার্মে একটি ট্রাইপোলার অথবা মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ডই হবে - সেখানে মুসলিম বিশ্বের অবশ্যই একটি শক্তিশালী পোল হতে হবে। কেননা ইউরোপ একটি পোল, আমেরিকা একটি পোল। চায়না, ইন্ডিয়া প্রত্যেকে এককভাবে একটি পোল হতে চায়। আমাদেরও একটি পোল না হওয়া পর্যন্ত কিছুটা দুর্বলতা থাকবেই। যেমন চুক্তি শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর পক্ষেই বেশি হয়। তার স্বার্থ বেশি রক্ষা হয়। এসব সমস্যার মধ্যেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। গণতন্ত্রকে, জনগণের সরকারকে খুবই শক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জনগণের সরকার সামরিক সরকারের চেয়েও শক্তিশালী এটি আমাদের বুঝতে হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনার আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, আমাদের অর্থনীতি, সামরিক বাহিনী, প্রযুক্তি, মিডিয়া এবং শিক্ষাখাতকে উন্নত করতে হবে। কিন্তু এজন্য উদ্দীপক ও সৎ নেতৃত্বের প্রয়োজন। আর আমাদের দেশে এটিরই সংকট। এ সংকট থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি?

উত্তর : আলাউদ্দীনের জাদুর চেরাগের মতো এটি হবে না। প্রসেসের মাধ্যমেই যেতে হবে। আমাদের করণীয় হলো গণতন্ত্রকে ভালো করে রক্ষা করা, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষা করা, শক্তিশালী করা। এটি করতে পারলে ৫/৭টি নির্বাচনের পরই জনগণ বুঝে যাবে কি ঠিক আর কি ঠিক নয়। এটি ছাড়া আমি আর কোনো উপায় দেখি না। অন্যান্য কথা সহজেই বলা যায়। পেশীশক্তি বন্ধ করতে হবে, কালো টাকার দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে, এই করতে হবে সেই করতে হবে। কিন্তু মূল জিনিস হলো গণতন্ত্র। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বেশ কিছু নির্বাচন হয়ে গেলেই এগুলো আস্তে আস্তে কমে যাবে। সমস্যাগুলো ধরে নিয়েই এগুতে হবে। আবার এরই মধ্যে কোনো এক পর্যায়ে একজন বিচক্ষণ নেতার আবির্ভাব হবে। যদিও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ বা বিএনপির ভেতরে এ মুহূর্তে আমি তা দেখছি না। যতদিন পর্যন্ত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত We have to live with this type of politics or this type of leaders. এতে আমাদের সময় নষ্ট হবে, গতি শ্লথ হবে। যত তাড়াতাড়ি করতে চাইবো পারব না। কিন্তু এ বাস্তবতার মধ্য দিয়েই আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে।

একজন মিলিটারি নিজেকে যোগ্য মনে করে ক্ষমতা নিলেও আসলে তার কোনো মোরাল অবস্থান থাকে না, সে মনে জোর পায় না। জনগণের ভয়ে তার মন টিপটিপ করে। আসলে তার কোনো ভিত্তি নেই। এসব সমস্যায় ঐ রকম লিডারশিপে কোনো লাভ নেই। কেউ যদি অসংবিধানিকভাবে আসে তাতে কোনো কাজ হবে না।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে যেভাবে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে তা কিভাবে মোকাবিলা করা যায়?

উত্তর : এক কথায় বলব কঠিন। সত্যি কথা কি কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়া অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়। সন্ত্রাস অবশ্যই দূর করতে হবে কিন্তু তা ক্রমেই যে আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটি খুব দ্রুত বন্ধ হবে বলে আমার মন বলে না। বাংলাদেশে সন্ত্রাস দমনের জন্যে আমাদেরকে অনেক ফ্রন্টে কাজ করতে হবে। পলিটিক্যাল রিফর্ম দরকার হবে। রাজনীতিবিদদের সন্ত্রাসীদেরকে দলে নেয়া বন্ধ করতে হবে। তাদের প্রশ্রয় দেয়া বাদ দিতে হবে। যদিও এটিও একটি কঠিন কাজ। কিন্তু এটি টুডে অর টুমরো করতে হবে। যে করেই হোক বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। আরেকটি বড় দিক হচ্ছে পুলিশ ফোর্সকে অবশ্যই ঢেলে সাজাতে হবে। আসলে সার্বিকভাবে সমস্যা সমাধান বেশ সময়ের ব্যাপার। এজন্য আমাদের এমপ্লয়মেন্ট বৃদ্ধি করতে হবে। দারিদ্র্য দূর করতে হবে। এতেও সময় লাগবে। সবকিছু মিলিয়ে এর পিছনে একটি মোরাল ফ্যাক্টর জড়িত। আবার শিক্ষার মধ্যে ইসলামের ভূমিকা ব্যাপক হওয়া দরকার। আমাদের ধর্ম ও নৈতিকতাকে তুলে ধরতে হবে। সব মিলিয়ে ব্যাপক সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়ে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে সংস্কার কর্মসূচি চালানো উচিত। তাড়াতাড়ি এ সমস্যা শেষ করা বাস্তবসম্মতও নয়। কাজেই সন্ত্রাস যেভাবে সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে তা দূর করতে ঠাণ্ডা মাথায় কমপক্ষে দশ বছর মেয়াদী সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমাদের এগুতে হবে।

প্রশ্ন : পুলিশ বাহিনীর ব্যর্থতা, দুর্নীতি সবকিছুই ওপেন সিক্রেট হলেও এ বাহিনী কেন সংশোধিত হচ্ছে না?

উত্তর : আসলে পুলিশ বাহিনীর সংস্কার দরকার। তার রিক্রুটমেন্ট পলিসি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। পুলিশ বাহিনীতে কি ধরনের লোক নেয়া হবে আর কি ধরনের লোক নেয়া হবে

www.pathagar.com

না তা ঠিক করা দরকার। তার ট্রেনিং প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা দরকার। তার মোরাল ট্রেনিং দরকার। তার ইকুইপমেন্ট বৃদ্ধি করা দরকার। সে সাথে পুলিশ বাহিনীর বেতন বৃদ্ধি করা দরকার। এগুলো সবই শক্তভাবে পরিবর্তন করতে হবে। পুলিশ বাহিনীর দুর্নীতিসহ যে কোনো দুর্নীতিকেই শক্তভাবে দেখতে হবে। তবে এ প্রশ্ন উঠতে পারে, কে দেখবে? কিন্তু এভাবেই আমাদেরকে চিন্তা করে দেখতে হবে। কাউকে না কাউকে এগুলো কার্যকর করতে হবে।

প্রশ্ন : কিভাবে?

উত্তর : আমাদের পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট যদি অনেস্ট হয় তাহলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। দুর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলা, দারিদ্র্যমোচন এগুলো এক বছরের মধ্যেই দূর হবে না। এগুলোকে ফেইজ ওয়াইজ দূর করতে হবে। প্রত্যেক সমস্যা দূর করতে নিজস্ব পরিকল্পনা থাকা দরকার। আমি বলেছি সবকিছুর মূলে হচ্ছে পলিটিক্যাল রিফর্ম। এটিই প্রধান। রাষ্ট্র বাস্তবে চালায় রাজনৈতিক সরকার। সে রাজনৈতিক সরকারের রিফর্ম ছাড়া এসব দূর হবে কেমন করে? অথবা মোরাল রিফর্ম করবে কে? একটি সৎ রাজনৈতিক দল যদি ক্ষমতায় আসে, এমনকি সরকার প্রধান যদি সৎ হয়, জ্ঞানী হয় তাহলেই একটি বিরাট গুণগত পরিবর্তন সম্ভব। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে শীর্ষে একজন সৎ লোক থাকতে হবে।

তবে আমি আরেকটি বিষয়ের পরিবর্তন দরকার বলে মনে করি। সেটি হলো আইন। আমরা কেন জানি বৃটিশ আইনের খুব ভক্ত। আমাদের উকিল ব্যারিস্টার সাহেবরা অধিকাংশই এ আইনের খুব ভক্ত। তারা এগুলোকে খুবই সুন্দর আইন বলে মনে করেন। আমি একজন সাবেক চিফ জাস্টিসের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি তিনিও বলেছেন, এর চেয়ে সুন্দর আইন আর হয় না। এ আইনের কোনো দোষ নেই, দোষ শুধু তা বাস্তবায়নের। আমার এ কথাও তিনি শুনতে রাজি হলেন না যে, যে আইন সহজেই বাস্তবায়ন করা যায় সেটিই তো ভালো আইন। যে আইন বাস্তবায়নে এত দীর্ঘসূত্রীতা সৃষ্টি করে সেটি ভালো হয় কিভাবে? কিন্তু তারা এসব তৈরি করা আইনের উপর এতই ঈমানদার যে তা সংশোধনের কথা চিন্তাও করতে পারেন না। তারপরও সরকারের উদ্যোগে কিছু কিছু সংশোধন করা হয়। আমি মনে করি আমাদের আইনের পরিমাণ অনেক বেশি এবং অনেক জটিল। আমাদের বিচার পদ্ধতিও খুব জটিল। সিস্টেমটাই এমন যে উকিল ছাড়া আমরা কেউ তা জানি না। তাই এটি লেখা থাকা না থাকা সমান। তেমনিভাবে বিচার প্রক্রিয়াও খুব ব্যয়সাধ্য হয়ে গেছে। তাই আইন ও বিচারকে সহজ করা দরকার। জনগণ সরাসরি যাতে আপিল করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা থাকতে হবে। একটি রাস্তা থাকতে হবে যাতে সরাসরি যে কেউ কোর্টে গিয়ে নিজের পক্ষে কথা বলতে পারে, কোনোরকম আবেদন ছাড়াই নিজে এসে হাজির হয়ে কিছু বলতে পারে। আমার এ কথাকে কেউ অসম্ভব বলে মনে করতে পারেন? কিন্তু আমি মনে করি এরকম করতে পারলে আসলেই আমরা বড় কাজ করতাম।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে কি আপনি স্বাধীন বলে মনে করেন?

উত্তর : বিচার বিভাগ স্বাধীন নয় বলা ঠিক হবে না। তবে সমস্যা হচ্ছে লোয়ার লেভেলের ক্রিমিনাল জাস্টিস। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেসি সুপ্রিম কোর্ট নয়, পলিটিক্যাল গভার্নমেন্টের অধীনে বলে এটি একটি সমস্যা। তবে আমরা জানি একে সংশোধন করার চেষ্টা চলছে। এজন্য দাবি দাওয়া আছে। প্রচেষ্টা আছে। বোধহয় আইনও হয়ে গেছে। এটি হয়ে যাওয়া দরকার।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : দুঃখজনক হলেও সত্য বাংলাদেশে আজকে অর্থের বিনিময়ে অনেক কিছুই করা সম্ভব।

উত্তর : একটি উদাহরণ দেই। বন্যায় যখন পানি বাড়তে থাকে তখন সবদিক দিয়েই বাড়তে থাকে। তখন কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় বাঁধ দিয়ে কাজ হয় না। আবার যখন বন্যা চলে যায় তখন পানি অটোমেটিক সবদিক থেকেই কমে যায়। মানব সমাজের উন্নয়ন এবং নৈতিক উন্নয়নের মতো বিষয়গুলো এরকম। একটি সময় আসে যখন সমস্যাগুলো বাড়তে থাকে। আবার একটি সময় আসে যখন সমস্যাগুলো কমতে থাকে। যেমন আমরা দেখি আরব বিশ্ব সমস্যায় ভরা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনে সব সমস্যা দূর হয়ে গেল। যত দিকে সমস্যা ছিল সবদিক থেকেই চলে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরের যুগেরও বহু উদাহরণ আছে। এভাবে যদি একটি গুড গভার্নমেন্ট কোনো দেশে আসে তখন যে উন্নয়ন হবে তা হবে সবদিক থেকেই। আবার এ উন্নয়ন অনেক আনুষঙ্গিক উন্নয়নকেই সাথে করে নিয়ে আসবে। কাজেই যেদিন এসব করা সম্ভব হবে সেদিনই সবকিছু বদলাতে থাকবে। নাহলে আমাদের জিডিপিও বাড়তে থাকবে, করাপশনও বাড়তে থাকবে। সন্ত্রাসও থাকবে। আরেকটি হতে পারে সমাজে একটি মোরাল ডেভেলপমেন্ট হবে। একটি নৈতিক গভার্নমেন্ট আসবে। তখন সন্ত্রাস, দুর্নীতি এমনিতেই কমে যাবে।

প্রশ্ন : কেউ কেউ সুশীল সমাজের নামে সুশাসন কায়েমের কথা বলেন। বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে কিভাবে সুশাসন কায়েম করা সম্ভব?

উত্তর : এটি ঠিক আমাদের দেশে সুশাসন নেই। এটি করতে গেলে আমাদের কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমে এর প্রয়োজনটা আমাদের বুঝতে হবে। আমাদের সমাজে সুশাসনের অনুপস্থিতি বোঝা যায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সিভিল সোসাইটির একটি অংশকে কাজ করতে হবে। এখানে বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, কবি, লেখক, চিন্তাবিদ, আলেম সমাজ, সমাজ বিশ্লেষক, সমাজ বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আইনজীবী সবাইকেই কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়ত ঐ একই কথা যে, একটি রিফর্মড পলিটিক্যাল লিডারশিপ লাগবে। আসলে এটিই প্রকৃত ভাইটাল কন্ডিশন। এ অবস্থার পরিবর্তন যতদিন পর্যন্ত না হবে স্কুল, কলেজ, লিটারেসি সবই বাড়তে থাকবে সে সাথে দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও অনৈতিকতাও বাড়বে।

প্রশ্ন : স্বাধীন দুর্নীতি কমিশন সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : এ ব্যাপারে তো জাতি আজ ঐকমত্য হয়ে গেছে। এটি দরকার। এখন যে দুর্নীতি দমন ব্যুরো আছে এর প্রধান এক সময় ছিল কেবিনেট সেক্রেটারি এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব। এটি একটি সরকারি ডিপার্টমেন্ট। সরকারী কর্মচারীরা ভালো হলেও তাদের স্বাধীনতা কম। আর মন্দ হলে তো কথাই নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে আমরা এভাবে গড়ে উঠেছি। আমাদের দেশের অবস্থা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী যে দলের হবেন সে দলের কেস বাদ দেয়া হবে আর অন্য দলের কেস তাড়াতাড়ি নেয়া হবে। কিন্তু স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন যদি হয় এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কিংবা এরকম উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি এর নেতৃত্ব দেন তাহলে তাকে যে ক্ষমতা দেয়া হবে তা দেখে সকলের একটি ভীতি সৃষ্টি হবে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ভীত হবেন যে, এরা তার অফিস পর্যন্ত ভিজিট করতে পারে, ডকুমেন্ট নিতে পারে।

কাজেই এটি হওয়া ভালো। বিশেষ করে আমরা যেখানে একটি মধ্যবর্তী পর্যায়ে আছি সেখানে এরকম একটি কমিশন যদি হয় আর তার কর্তাব্যক্তি যদি যোগ্য হন, সক্রিয় হন তাহলে তিনি বড় কিছু করতে পারেন। তখন মানুষের মনে ন্যায় বিচারের আশা জাগবে এবং দুর্নীতিবাজদের মনে প্রচণ্ড ভীতির সৃষ্টি হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : দেশে সুস্থ রাজনৈতির ধারা কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায়?

উত্তর : রাজনীতিকে তারা যেন ব্যবসায় পরিণত না করেন। একে যেন উপার্জনের উপায় হিসেবে না নেন। তারা যেন তাদের পার্টির ভিতরেও গণতন্ত্রের চর্চা করেন। ক্ষমতায় যাবার জন্য তাদের উচিত পেশীশক্তি ব্যবহার না করে বৈধ পন্থা ব্যবহার করা। অন্যায়ভাবে অর্থের পাওয়ার না খাটানো। কেউ যেন ভোট চুরি না করে। দুনিয়ার অসংখ্য দেশে কোনো প্রকার ভোট চুরি নেই। আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন, জাপানে নেই। এমনকি ইন্ডিয়াতে এটি খুবই কম। তাহলে আমাদের দেশে কেন হয়? আমাদের রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক রুলস মেনে চলতে হবে। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা সহনশীল নন, তাদেরকে সহনশীল হতে হবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল কি হওয়া উচিত নয় বললেই তাতে কি হওয়া উচিত বোঝা যাবে। সরকারই সব উন্নয়ন ঘটাবে আমাদের এরকম চিন্তা-ভাবনা থাকা ঠিক নয়। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বলে উন্নয়ন প্রধানত প্রাইভেট সেক্টর দ্বারাই করতে হয় এবং সারা বিশ্বের উন্নয়ন প্রাইভেট সেক্টর দ্বারাই হয়েছে। সরকারকে প্রয়োজনে কতগুলো শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে হয়। তাই আমাদের প্রাইভেট সেক্টরকে শক্তভাবে গড়ে তুলতে হবে। তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। একটি চমৎকার পরিবেশ করে দিতে হবে যাতে তারা এ কাজটি করতে পারে। তা নাহলে তাদের দ্বারা এ কাজ হবে না। এটি গেল একটি দিক। দ্বিতীয়ত, মাইক্রোক্রেডিট দ্বারা আমরা উন্নয়ন করবো, দারিদ্র্য বিমোচন করবো, আমাদের এরকম কল্পনা বিলাসী হওয়া ঠিক হবে না। মাইক্রোক্রেডিট উন্নয়নের মাধ্যম নয়। এটি বড় জোর দারিদ্র্য বিমোচনের একটি সহায়ক উপাদান। আমি অন্য এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্টত বলেছি দারিদ্র্য বিমোচন মাইক্রোক্রেডিট দ্বারা সম্ভব নয়। বাস্তবেই তা সম্ভব হয়নি। আমি সেদিকে যাচ্ছি না।

আমাদের উন্নয়নের প্রচলিত ধারা হলো সরকার অবকাঠামোর উন্নয়ন করবে। এটি উন্নয়নের প্রথম স্টেজ। আমরা এখনো উন্নয়নের এ স্টেজেই আছি। পরবর্তী স্টেজে এখনো যেতে পারিনি। এদিকে সরকারকে আরো নজর দিতে হবে। পোর্ট, এয়ারপোর্ট আর কমিউনিকেশনের আরো উন্নয়ন ঘটাতে হবে। রাস্তাঘাট, টেলিকমিউনিকেশনের দিকে নজর দিতে হবে। ইন্ড্রাস্ট্রি, এগ্রিকালচার এবং সার্ভিস সেক্টরের উন্নয়নের দায়িত্ব প্রধানত প্রাইভেট সেক্টরকে পালন করতে হবে। এজন্য প্রাইভেট সেক্টরকে সর্বাধিক সাহায্য-সহযোগিতা দিতে হবে। উন্নয়নের জন্য বিদেশী ঋণ ও বিদেশী বিনিয়োগ ভালো, যদি তা কোনো খারাপ শর্তে না হয়। খুব খারাপ শর্তে আমাদের ঋণ নেয়া উচিত নয়। আর তা আমাদের ক্যাপাবিলিটি টু পে ব্যাক-এর আলোকে করতে হবে। কোনোভাবেই যেন ঋণ পরিশোধের অর্থ এক্সপোর্ট আর্নিং এর ১০ বা ১৫ ভাগের বেশি চলে না যায়। এ বিষয়গুলো আমাদের বেশি করে খেয়াল রাখতে হবে।

কৃষির ব্যাপারে - আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র কৃষকদের সহযোগিতা দিতে হবে। কৃষি উপকরণ যাতে মার্কেটে সহজেই পাওয়া যায় এবং দাম কম থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিক্রয়মূল্য যাতে উৎপাদন খরচের চেয়ে বেশি হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তার জন্য যদি শস্যের দাম বাড়েও - সেটি আমাদের মানতে হবে।

প্রশ্ন : ইসলামের আলোকে দারিদ্র্য বিমোচনের উপায়গুলোকে আমরা কিভাবে উন্নয়নের সাথে জড়াতে পারি?

উত্তর : আসলে দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে থাকে। যেমন সরকার মনে করতে পারে মাইক্রোক্রেডিটে এগুবে। ঠিক আছে। কিন্তু আমরা দেখেছি

www.pathagar.com

যে মাইক্রোক্রেডিটে দারিদ্র্য শেষ হয় না। আবার যদি কারো কারো ধারণা মতে গরীবদের ধরে ধরে লিস্ট করে এলাউন্স দেয়া শুরু করলে তা বিশাল এক বোঝা হবে। আমাদের অর্থনীতি এত লক্ষ-কোটি লোকের বোঝা বহন করতে পারবে না। সে ক্ষেত্রে এটি বাস্তব সম্মত হবে না।

তাই আমাদের বোঝার সমস্যা থাকলেও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ইসলামের যে পলিসি তা সঠিক। ইসলামের সাধারণ উন্নয়ন পদ্ধতি একই। ইসলামের যে কোনো অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হয় মনিটরি পলিসি, ফিসকেল পলিসি, এক্সপেন্ডিচার পলিসি (এটি ফিসকেল পলিসিরই অংশ) এবং ব্যাংকিং পলিসি ব্যবহার করে। দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রতি বছর যে নতুন টাকা তৈরি করে তা একদম ফ্রি টাকা। আমার ভাষায় আকাশ থেকে পাওয়া টাকা। সেন্ট্রাল ব্যাংক নোট প্রিন্ট করে বাজারে ছাড়া মাত্রই টাকা হয়ে যায়। এ পাওয়ার রাষ্ট্র ছাড়া আর কারো নেই। এর মানে হলো এ নতুন টাকা হিসাব করেই প্রিন্ট্র করা হয় এবং বাজারে ছাড়া হয়। ধরা হয় বছরে গ্রোথ হবে ৫ পারসেন্ট এবং ইনফ্লাশন হবে ৫ পারসেন্ট। অর্থাৎ ৫ যোগ ৫, ১০ পারসেন্ট নতুন টাকা লাগবে। এ টাকা সরকার পণ্য কেনার মাধ্যমে বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করে বাজারে ছাড়ে। না হলে এ টাকা তো আর শুধু শুধু বিলানো যাবে না। এ টাকা সম্পর্কে ড. ওমর চাপড়া বলছেন এর একটি নির্দিষ্ট অংশ সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য খরচ করতে পারে। প্রতি বছরই এ টাকা আমরা পেতে পারি। তার জন্য গ্রহণযোগ্য, কার্যকরী প্রোগ্রাম দরকার।

তৃতীয় দিক হচ্ছে ব্যয়। সরকার বাজেটে যে ব্যয় ধরে তার মধ্যে একটি অংশ থাকে দরিদ্রদের সাহায্য করার জন্য। এগুলো ইনডাইরেক্ট প্রোগ্রাম। এগুলোকে সুপরিকল্পিত ও সুস্পষ্ট করতে পারলে ভালো হবে। আর যদি ডাইরেক্ট করা যায় তাহলে তা অবশ্যই কল্যাণকর। আমি স্পষ্টত বলতে চাই ইসলামের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে কেউ যেন কেবল যাকাত নির্ভর মনে না করে। এরপর আসে ব্যাংকিং পলিসি। ব্যাংক তার ৮০ ভাগ অর্থ শিল্প-কারখানায় দিলেও ৫ থেকে ১০ ভাগ অর্থ গরীবদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে দিতে পারে। সেখানে জামানত ব্যবস্থা না থাকলে বাড়ি নেবে, তাও না পারলে অন্য কারো কাছ থেকে সার্টিফিকেট নেবে। এরপর যাকাত। তারপর উশর। তারপর ওয়াক্ফ। এসবই সিস্টেমেটিক্যালি করতে হবে।

আসলে ইসলামের মধ্যেই দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলা আছে। এখানেও অন্যদের মতোই বলা আছে। যাকাতের কথা বেশি বলা আছে। এক সাক্ষাৎকারে আমি সুপারভাইজড যাকাতের কথা বলেছি। এ সিস্টেমে যাকাত ফান্ড থেকে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য যাকাত দেয়া হবে এবং তা সুপারভাইজ করা হবে। এর মাধ্যমে স্বনির্ভর হতে না পারলে পরবর্তীতে দেয়া হবে না কিংবা তার জন্য শাস্তিমূলক বা জরিমানা সিস্টেম থাকবে। কাজেই ইসলামের কৌশল যে কোনোভাবেই ভালো।

আরেকটি কথা, বেকারত্ব যে কোনো সরকারের সময়ই থাকবে। কাউকে একটি চাকরি খুঁজতে কিংবা অন্য চাকরি পেতে সময় লাগে। তখন কেউ বেকার থাকতেই পারে। এটি মুসলিম অমুসলিম দেশে এবং সব অর্থনীতিতেই হবে। কিন্তু এজন্য ইসলামী সরকারের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে এর দায়িত্ব আগে পরিবারকে নিতে হবে। পরিবার না পারলে তখন আন এমপ্লয়মেন্ট এলাউন্সের ব্যবস্থা করবে রাষ্ট্র। আজ এটি আমেরিকা বা ইউরোপ করছে, তা আসলে ইসলামেরই স্পিরিট।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট?

উত্তর : আমার মনে হয় কেউই সন্তুষ্ট নয়। এজন্য বিরাট কাজ করা দরকার। আমাদের দেশে প্রাইভেট সেক্টরেও অপরাধ, দূর্নীতি অনেক। দেশে ছিনতাই, ধর্ষণ, খুন আছে। তেমনি পুলিশ, বিডিআর, আর্মির অপারেশনের সময় অনেক ঘটনা ঘটে। এসব কোনোটাই কোনো দেশের জন্য এমনকি কারোর জন্যেও ভালো নয়।

মানবাধিকারে আমরা কেউই সন্তুষ্ট নই। এজন্য একটি স্বাধীন মানবাধিকার কমিশনের কথা উঠছে। তা হতে পারে। আমাদের আইন শৃঙ্খলার ব্যাপক উন্নতি ঘটাতে হবে। পুলিশ বাহিনী রিফর্ম করতে হবে। আইন-আদালত সহজ করতে হবে যাতে এটি সবার সহযোগী হয়। মানবাধিকার ভঙ্গকে অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে। যেহেতু আমরা মুসলিম, ইসলামে মানবাধিকারের যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে তাও আমাদেরকে দেখতে হবে। এ ব্যাপারে ওআইসি ডিক্লারেশন আমাদের জন্য একটি ডকুমেন্ট হিসেবে নিতে হবে।

বিশ্ব পরিস্থিতি

ইসরাইল আরব বিশ্বের উপর ওয়েস্টার্ন আউটপোস্ট

প্রশ্ন : ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেশ মিত্র কিছুদিন আগে ওয়াশিংটনে এক বক্তৃতাকালে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও ইসরাইলের সমন্বয়ে জোট গঠনের প্রস্তাব রাখেন। এ ধরনের জোট বিশ্ব রাজনীতিতে কি ধরনের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : এটি ঠিক, বিশ্ব রাজনীতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে এবং হচ্ছে, বিশেষ করে কোল্ড ওয়ার শেষ হওয়ার পর থেকে। রাশিয়ার পতনের পর আমেরিকার মতো জার্মানী, বৃটেন, ফ্রান্স এরাও ইউরোপের এক একটি শক্তি। সঙ্গে সঙ্গে সাবকন্টিনেন্ট বা মিডল ইস্টের দিকে তাকালে ইসরাইল, ভারত একটি শক্তি। আবার মুসলিম বিশ্ব এজ এ হোল একটি শক্তি হতে পারে। এসব শক্তির মধ্যে আলটিমেটেলি কিভাবে পোলারাইজেশন হবে এটি সুনির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। হানটিংটন এক ধরনের পোলারাইজেশনের কথা বলেছেন এভাবে, আমেরিকা আর ইউরোপকে দাঁড়াতে হবে চায়না এবং মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে। এদিকে ভারত একটি শক্তি হিসেবে আবির্ভাবের স্বপ্ন দেখছে। তার আছে ৯ লাখ বর্গমাইল এলাকা আর লোকসংখ্যা প্রায় একশ কোটি। তার রিসোর্সও কম নয়। তার এডুকেশন বেস অনেক বড়। সেখানে ভারত, ইসরাইল এবং আমেরিকার মধ্যে কম্বিনেশন হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। এটি একটি দিক। তেমনিভাবে প্রকাশ হোক বা না হোক আমেরিকা এবং মুসলিম বিশ্বের মধ্যে অন্তর্মুখী মানসিক সংঘাতের স্রোত আছে। এ প্রেক্ষিতে এরকম একটি জোট গঠনও অসম্ভব নয়।

এর অন্য দিক হচ্ছে, যদি তাই হয় তাহলে এটি একটি মন্দ জোট হবে। কেননা গত ৫০ বছরে আমরা ভারতকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে অনেকটা আক্রমণাত্মক ভূমিকায় দেখেছি। আর ইসরাইলের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা সবাই কমবেশি জানি। ইসরাইল আরব বিশ্বের উপর একটি ওয়েস্টার্ন-আউটপোস্ট, পাশ্চাত্যের একটি ঘাঁটি। এ ঘাঁটি করানোর জন্যেই ইসরাইলকে বানানো হয়েছে। ইসরাইল বলে ১৯৪৮-এর আগে কোনো রাষ্ট্র ছিল না। জাতিসংঘের সহায়তায় ফিলিস্তিনের একটি অংশকে আলাদা করে পাশ্চাত্যের শক্তি এই

www.pathagar.com

আলাদা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৫ সালে যখন জাতিসংঘ গঠিত হয় তখন তার বেশিরভাগ সদস্যই ছিল পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র। কেননা এ এলাকার অধিকাংশ দেশই তখন কলোনি হিসেবে ছিল। ৪৮ সালে যখন জাতিসংঘে রেজুলেশন পাস হলো তখন পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া মাত্র স্বাধীন হয়েছে। বাকি মুসলিম দেশসমূহ, আফ্রিকাসহ সব পরাধীন। ফলে পশ্চিমারা মেজরিটির মাধ্যমে ইসরাইলকে পাস করিয়ে নেয়।

আমি মনে করি না ভারত, ইসরাইল ও আমেরিকার সমন্বয়ে একটি জোট হতে পারে না। তবে হলে তা অবশ্যই ভালো হবে না। সেটি খুবই খারাপ কম্বিনেশন হবে। কিন্তু আমেরিকা প্রকাশ্যে এ ধরনের কোনো জোট করবে বলে মনে হয় না। তাহলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে ইউরোপ, রাশিয়া, চায়না এবং মুসলিম বিশ্ব। আবার এটিও আমার মনে হয় না যে আমেরিকা ইউরোপের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। আমেরিকার সাথে ইসরাইলের সম্পর্ক ভালো। ভারত এতে যোগ দিলে ফরেন পলিসিতে আমেরিকার সাথে ইউরোপের বিভেদ দেখা দেবে। এরকম পোলারাইজেশন হলে ইউরোপ, রাশিয়া, চায়না অন্যদিকে চলে যাবে। চায়নাকে দূরে ঠেলে দিতে আমেরিকা চাইবে কিনা প্রশ্ন আছে। ভবিষ্যতে যে ধরনের পোলারাইজেশন দাঁড়াবে তাতে ১, ২, ৩, ৪টি কম্বিনেশন হতে পারে। কেউ এখনই এর ফোরকাস্ট করতে পারবে না। সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কোনোকিছু নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। তবে এটি বলতে পারি ইসরাইল এবং আমেরিকা একদিকে থাকবে।

প্রশ্ন : যদি এ ধরনের জোট হয় তাহলে মুসলিম বিশ্বে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

উত্তর : মুসলিম বিশ্ব অবশ্যই এর বিপরীত জোটে যাবে। কারণ ইসরাইল যেদিকে থাকবে মুসলিম বিশ্ব সেদিকে থাকবে না। এটি সুস্পষ্ট। আবার এ রকম জোট আমেরিকা করবে বলেও মনে হয় না। বর্তমানে আর যাই করুক ভবিষ্যতের চিন্তায় আমেরিকা এমন কিছু করতে যাবে না যা তাকে মুসলিম বিশ্ব, ইউরোপ থেকে আইসোলেটেড করে দেয়। ইন্ডিয়া এ রকম জোটের পক্ষে হলেও তা আমেরিকার আগ্রহে নয়। আবার ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া হচ্ছে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বড় বন্ধু। সে হিসেবে ইন্ডিয়ারও বিপরীত চিন্তা এটি। যদি ভারত রাশিয়াসহ হতো তাহলে ভিন্ন কথা ছিল। আবার এ মুহূর্তে রাশিয়া ও আমেরিকার একত্রে জোট হওয়া প্রায় অসম্ভব। কাজেই ব্রজেশ মিত্রের কথাটাকে সেভাবে সিরিয়াসলি নেবার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন : সময়ের প্রেক্ষিতে রাশিয়া-আমেরিকা জোট হতে পারে না?

উত্তর : Nothing is impossible - এদিক থেকে বলা যায় সবই সম্ভব। তাতে ভারত-পাকিস্তান কিংবা ভারত-চীনও জোট হতে পারে। কিন্তু এগুলো আমাদের মানসিক হিসাবে অসম্ভব।

প্রশ্ন : ভারতের গতিবিধি ও কার্যবিধিকে সামনে রেখে ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?

উত্তর : যে কোনো ছোট রাষ্ট্রের প্রতিবেশী যদি বড় রাষ্ট্র হয় তাহলে তা তার জন্য সমস্যাই। আবার বড় রাষ্ট্রের সাথে কিছু ছোট প্রতিবেশী থাকবেই। বাংলাদেশকে এ ব্যাপারে কয়েকটি কাজ করতে হবে। এক. আমরা অকারণে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করবো না। ভারত যদি বাধায় আমরা যতটা পারি হজম করবো। কিন্তু নিজেরা কোনোরকম উত্তেজনা সৃষ্টি করা যাবে না। আমাদের জনগণকে সকল ক্ষেত্রেই সব সময়ের জন্য এন্টি ইন্ডিয়ান করে গড়ে

www.pathagar.com

তোলাকে আমি সঠিক বলে মনে করি না। বিদ্বেষমূলক ফরেন পলিসি কোনো রাষ্ট্রের হওয়া উচিত নয়। আমরা আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে দৃঢ় থাকব। স্বাধীনতা নিয়ে সক্রিয় থাকব। শক্ত থাকব। তা রক্ষা করার জন্য সর্বদা তৈরি থাকব, যেদিক থেকেই বিপদ আসুক না কেন। দ্বিতীয়ত, আমাদের নিরাপত্তার দিকে ভালো করে খেয়াল রাখা দরকার। এজন্য সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক রাখা উচিত মিয়ানমার এবং চায়নার সাথে। মিয়ানমারের সাথে আমাদের বর্ডার আছে এবং চীন নিকটবর্তী রাষ্ট্র। তারা প্রয়োজনে কোনো বিষয়ে ইন্টারভেন্ট করতে পারে এবং সাহায্য করতে পারে। চায়নার সাথে আমাদের কোনো আইডোলজিক্যাল সমস্যা নেই। তার কমিউনিস্ট থাকা না থাকা সমান। আর মুসলিম ওয়ার্ল্ডের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে এটি তো আমাদের স্বাভাবিক বন্ধন।

তৃতীয়ত, আমাদের ডিফেন্স শক্তিশালী করতে হবে - আমাদের সম্পদ, সামর্থ্যকে সামনে রেখেই। জনগণকেও সামরিক দিক দিয়ে প্রশিক্ষিত করতে হবে যেটি সম্ভব এবং যতটুকু সম্ভব। যদি কখনো পারসিভড এ্যানিমির মুখোমুখি হতে হয়, সে প্রেক্ষিতে জনগণকে তৈরি করার প্রয়োজন আছে।

প্রশ্ন : মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির জন্য ইসরাইল নিজেই একটি সমস্যা। তারাই আবার ফিলিস্তিনিদের সহিংসতা বন্ধ করার কথা বলে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আপনার দৃষ্টিতে মুসলমানদের স্বার্থ নিশ্চিত করে মধ্যপ্রাচ্যে কিভাবে শান্তি আসতে পারে?

উত্তর : ইতিহাসের ডেভেলপমেন্ট যখন ঘটে যায় তখন তাকে আর তার আগের জায়গায় ফিরিয়ে নেয়া যায় না। এটি একটি বাস্তবতা। তেমনিভাবে বলা যায় এ মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম স্বার্থ পুরোপুরি নিশ্চিত করে কোনো সমাধান নেই। ইসরাইল একেবারেই অবৈধ রাষ্ট্র। যেসব ইহুদী বিভিন্ন দেশে নিগৃহীত হয়েছে, অত্যাচারের স্বীকার হয়েছে তারা ১৯৩০ সালের দিকে এখানে অভিবাসিত হয়। এটি প্রথম অবশ্য শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে অত্যাচারিত না হলেও এখানে অনেকে চলে আসে।

বৃটিশ মন্ত্রী বালফোর এখানে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ডিক্লারেশন দিয়েছিলেন। প্যালেস্টাইন ছিল বৃটিশ রাষ্ট্রের ম্যান্ডেটের অধীন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কতগুলো রাষ্ট্রকে কয়েকটি বড় রাষ্ট্রের দায়িত্বে তুলে দেয়া হয়। যেমন ফ্রান্সের হাতে পড়ে লেবানন, সিরিয়া। বৃটেনের হাতে পড়ে ইরাক, প্যালেস্টাইন। সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে বৃটেন ইমিগ্রেশন অনুমোদন করল। আস্তে আস্তে এখানে ইহুদী বসতি বাড়তে লাগল। বৃটেন বলে তারা বাধা দিয়েছে অথচ ঠেকাতে পারেনি। কিন্তু বাস্তবে দেখার বিষয় কতটুকু তারা বাধা দিয়েছে, আর কতটুকু সুযোগ করে দিয়েছে। বাইরে বলেছে না, আর ভেতরে বলেছে হ্যাঁ। এর ফলে যখন এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তখন বহু মুসলিম-অমুসলিম দেশের উপনিবেশিকতার সুযোগ নিয়ে জাতিসংঘে মেজরিটির মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের প্রস্তাব পাস করিয়ে নেয়। সেখানে এমন একটি বর্ডারের বিভাজন করা হলো যা না আরবরা মানল, না ইহুদীরা। আরবরা এটিকে রাষ্ট্র হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানাল। বলল, যারা এখানে আগে থেকেই আছে সেসব ইহুদী শুধু থাকবে। নতুন ইহুদী না হয় কিছু মানবো কিন্তু এ অবৈধ রাষ্ট্র কেন মানবো? আর ইহুদীরা বলল এ বর্ডারে তারা সন্তুষ্ট নয়। এর ফলে ১৯৪৮ সালের যুদ্ধ হলো। ইসরাইলের ওয়েল আর্মড আর্মি আরবদের পরাজিত করলো এবং প্যালেস্টাইনের বেশিরভাগ এলাকা তারা দখল করে নিল। এভাবে একটি অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইল প্রতিষ্ঠা হলো।

কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে এটিকে এখন উৎখাত করা সম্ভব নয়। ১৯৬৭, ১৯৭৩ সালে যুদ্ধের মাধ্যমে আরবরা চেষ্টা করে। ১৯৭৩-এর যুদ্ধেও তারা তাদের কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে

www.pathagar.com

পারেনি। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পরে দীর্ঘ ৪৫ বছর এখানে অবৈধ অকুপেশন রয়ে গেছে পশ্চিম তীরসহ অন্যান্য স্থানে। এ অবস্থায় রোডম্যাপের ব্যাপারে বলা যায় এটি অবশ্যই ফেল করবে। কারণ অসলো পিস প্রসেসে তবু কিছু সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রোডম্যাপে একদমই নেই। অসলো চুক্তিতে কখনোই এ কথা ছিল না যে শান্তি পূর্ণ অবস্থা হলে পরেই আলোচনা এগুবে, না হলে এগুবে না। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী রবিনের মৃত্যুর পর নেতানিয়াহু এসে তাও বাতিল করে। শ্যারন এটিকে একদমই বাতিল করে দেয়। মধ্যে কিছুদিন ইয়াহুদ বারাক প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন এটি নিয়ে এগুতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পারলেন না। এরপরও বলতে হয় রোডম্যাপ 'অসলো' থেকে আরো খারাপ। কেননা তারা বলছে প্রথমে অবস্থা শান্তিপূর্ণ হতে হবে। তারপর এক-দেড় মাস এ শান্তি অব্যাহত থাকতে হবে। তারপর সেটেল করা হবে, কি কি করা হবে বা হবে না। শেষে ২০০৫ গিয়ে ফাইনাল চুক্তি হবে। এটি একদমই অসম্ভব। প্যালেস্টাইনে বিভিন্ন রকম ফোর্স আছে। ইহুদীদের কথায় এরা যদি নাও গণ্ডগোল বাধায় সেখানে কারো কোনো না কোনো এজেন্ট গণ্ডগোল বাধাবে। এ ব্যাপারে এ পথে অগ্রসর হলে কিছুই হবে না। যেটি হওয়া উচিত ছিল, আমেরিকা তা বোঝে কিন্তু তা বুঝেও না বোঝার ভান করে। প্রকৃতপক্ষে প্রথমে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে হবে। এজন্য আগে জেরুজালেমের স্ট্যাটাস ঠিক করতে হবে। এটি দুই সরকারেরই হেড কোয়ার্টার হবে। ফিলিস্তিনী যারা আছে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য রিফিউজি এগ্রিমেন্ট হতে হবে - তারা তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে কি পারবে না। এগুলো বাস্তবতার আলোকেই করতে হবে।

তৃতীয়ত, সীমানা নির্ধারণ করতে হবে। মূলত ১৯৪৮-এর আলোকেই তা হওয়া উচিত। আর তা যদি না হয় অন্তত ১৯৬৭-এর বর্ডারটাই রাখতে হবে। দুই পক্ষের মধ্যে এসব চুক্তি হওয়ার পর এটি জাতিসংঘের কাছে হস্তান্তর করতে হবে তা বাস্তবায়নের জন্য। প্রয়োজনে সেখানে বেড়া দাও, আর্মি নিয়োগ কর বাকি সবাইকে নিরস্ত্র কর। মূল চুক্তি হওয়ার পরই এটিকে বাস্তবরূপ দিতে হবে। আমেরিকা বলছে দুই পক্ষের আলোচনা হতে হবে। কিন্তু দুই পক্ষের আলোচনার যদি কোনো সম্ভাবনা না থাকে তাহলে অবশ্যই আউট সাইড কোনো পার্টির মাধ্যমে এটি করতে হবে। তাহলে তা অবশ্যই জাতিসংঘের একটি গ্রুপকে করতে হবে।

প্রশ্ন : ফিলিস্তিনে যে ইনতিফাদা বা স্বাধিকার আন্দোলন চলছে একে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর : ইনতিফাদার ব্যাকগ্রাউন্ড কি? ফিলিস্তিনী জনগণ যখন দেখল ইসরাইলী অকুপেশন বন্ধের কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না এবং এটিকে বন্ধও করা যাচ্ছে না, আরব বিশ্ব কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না তখন তারা সোশাল লিডারশিপ গড়ে তোলার চিন্তা করল। সেটি হবে নিরস্ত্র। শুধু এতটুকু যে পাথর মারা। যেখানেই সম্ভব ইসরাইলী সৈন্যদের পাথর মারা হবে। এভাবে পাথর মারল তারা পাঁচ-ছয় বছর। এ সময় নিজেদেরই বেশ কিছু লোক মারা গেল। এটিই বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণ করল। খুবই আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে শিশুদের পাথর মারার মাধ্যমে প্রতিবাদ বিশ্বকে নাড়া দিল। এরই পরিণাম হলো অসলো চুক্তি। অসলো চুক্তিতে সবই আলোচনার মাধ্যমে করার কথা বলা হলো। কোনো সমাধান এতে দেয়া হলো না। তবুও কিছু না থাকার চেয়ে কিছু থাকা ভালো - এটি সে রকমই।

অসলো ব্যর্থ হলো। আইজাক রবিন থাকলে এর কিছু একটি সমাধান হয়তো হতো। কিন্তু শ্যারন ও তার লিকুদ পার্টি সে সম্ভাবনাও নষ্ট করে দেয়। অসলো চুক্তি হওয়াতে স্বাভাবিকভাবেই ইনতিফাদা শেষ হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে শ্যারনের উপস্থিতিতে

www.pathagar.com

ফিলিস্তিনী জনগণের উপর গুলিবর্ষণ করা হলে ৩০/৪০ জন ফিলিস্তিনী নাগরিক মারা যায়। ইতোমধ্যে অসলো চুক্তিও বাতিল হয়ে যাওয়ায় আবার ইনতিফাদার ডাক দেয়া হয়। এবারের ইনতিফাদা ছিল একই সঙ্গে বাচ্চাদের ঢিল এবং অন্যদের অস্ত্র। ফলে ইনতিফাদা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আর নিরস্ত্র থাকল না। শ্যারন তার বাহিনী দিয়ে নির্মমভাবে অত্যাচার করার ফলেই এটি হলো। তারা মানুষ মারতে লাগল, বাড়ি-ঘর ধ্বংস করতে লাগল। ফিলিস্তিনী নেতাদের মেরে ফেলার পলিসি নিল। সব মিলিয়ে তারা এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করল যার ফলে ইনতিফাদা সশস্ত্র হয়ে গেল। এ হচ্ছে ইনতিফাদার ব্যাকগ্রাউন্ড।

ইনতিফাদার হয়েছে একটি হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। কিন্তু এ ইনতিফাদার মধ্যে সমাধান হবে না। এজন্য পলিটিক্যাল সমাধান সবচেয়ে জরুরী। আমেরিকা যদি একেবারে অন্ধভাবে ইসরাইলকে সমর্থন না করত তাহলে এ সমস্যা সমাধান অনেক আগেই হতো। তারা প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি সবকিছুতেই পূর্ণাঙ্গ সহায়তা দিয়েছে আর ইসরাইলী পলিসিকে আত্মস্থ করেছে। এটি রিপাবলিকানরা ডেমোক্রেটদের চেয়ে বেশি করেছে। যত সময়ই লাগুক এজন্য আমার কাছে রাজনৈতিক সমাধানই সবচেয়ে উত্তম ও জরুরী বলে মনে হয়।

প্রশ্ন : আফগানিস্তানের পর ইরাকে মার্কিন দখলদারিত্বের বিষয়টি সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : ২০০৩ সালের জুন মাসে এসে হিসাব-নিকাশ আর পরিস্থিতি বদলে গেছে। Weapon for Much Destruction (WMD) বলতে যা বোঝায় ইরাক বলছে সেই আনবিক বোমা কিংবা রাসায়নিক অস্ত্র কোনোটাই তার নেই। কিন্তু এটি আমেরিকা-বৃটেন মানছে না। আর যারা পরিদর্শনে গেছেন তারাও কোনো পরিষ্কার রিপোর্ট না দিয়ে বলে অস্ত্র পাইনি কিন্তু থাকতে পারে। এমন একটি লেজ লাগিয়ে রাখে যার ফলে আমেরিকার সুযোগ হয়ে যায়। এ অজুহাতেই তারা যুদ্ধ করেছে। কিন্তু আমরা পরিষ্কার দেখছি WMD পাওয়া যায়নি এবং তা নেইও। এখন তারা যদি বলে পেয়েছি তাহলে কেউ আর তা বিশ্বাস করবে না। এখন তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সবাই জেনে গেছে। WMD বাদে আর যে প্রশ্নটি আসে তাতে আন্তর্জাতিক কোনো আইনেই এটি স্বীকৃত নয় যে কোনো শাসককে বদলানোর জন্য আরেকটি দেশ আক্রমণ করবে। অর্থাৎ সাদ্দামকে অপসারণের জন্যেই আমেরিকা লড়াই করেছে- এটিও ভাবা যায় না।

তাহলে কেন আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করল? এর নানা কারণ হতে পারে। সবাই বলে তেল। আমি বলি না যে তেল নয়। আবার এটিও উদ্দেশ্য যে আরব বিশ্বকে এমন লাইন আপে আনা যাতে আমেরিকার সমর্থক সৃষ্টি করা যায়। ইরাক তার জন্য সমস্যাই ছিল। এখানে যদি অনুগত সরকার থাকে তাহলে তা আমেরিকার জন্য সুবিধা হয়। তারা চায় মিশরে একটি অনুগত সরকার থাকুক। ইরানকেও এর আওতায় আনতে চায়। এটিও রিপাবলিকান পার্টির একটি স্ট্রাটেজি হতে পারে। তেল প্লাস এন্টি মুসলিম ভূমিকা, তাদের বশংবদ সরকার বসানো, কোনো মুসলিম পাওয়ার যেন আরো শক্তিশালী না হতে পারে এসব - হিডেন (গোপন) এজেন্ডা থাকতে পারে। আমি মনে করি আছে। ভবিষ্যৎই বলে দেবে কি হবে আর কি হবে না। তবে আমি এটিও বলব আমেরিকার আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে এসব হবেটবে না বলেই আমার মন বলে।

আমেরিকা একটি জালে জড়িয়ে পড়েছে। কাদামাটিতে জড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে ইরাক আক্রান্ত হলেও অদূর ভবিষ্যতে সেখানে একটি ইসলামিক ও গণতান্ত্রিক সরকারই কায়েম

www.pathagar.com

হবে। এটিই ইরাকের জনগণের অভিব্যক্তি। তারা এটিই চায়। সেখানে আমেরিকার উদ্দেশ্য খুব বেশি পূর্ণ হবে না। তেলও সে নিতে পারবে না। কেননা ইতোমধ্যেই বিশ্বের নজর ইরাকের উপর পড়ে গেছে। যদি কেউ বলে আমেরিকা এগুলোর তোয়াক্কা করে না, তা ঠিক। কিন্তু তারপরও আমেরিকাকে এসব তোয়াক্কা করতে হয়। যে কোনো একটিঘটনা ঘটলেই ব্যাখ্যা দিতে হয়। বৃদ্ধাঙ্গুল দেখালেও তার কৈফিয়ত তাকে দাঁড় করাতে হয়।
এখন ইরাকের যে ক্ষয়ক্ষতি আর পুনর্গঠনের দায়দায়িত্ব আমেরিকাকেই নিতে হবে। সে সাথে সহযোগী বৃটেন, অস্ট্রেলিয়ারও। আমি মনে করি ইরাক ও আফগানিস্তান কোনো জায়গাতেই আমেরিকার স্বপ্ন পূরণ হবে না। তারা মুসলিম সমর্থন, সহানুভূতি সবই হারিয়েছে। এমনকি ইউরোপের সমর্থনও অনেক ক্ষেত্রেই হারিয়েছে।

প্রশ্ন : কেউ কেউ একে অর্থনৈতিক আগ্রাসন হিসেবে দেখে থাকেন। অনেকে আবার একে ডলারের পতন ঠেকানোর কৌশল বলে মনে করেন।

উত্তর : কোনো সিরিয়াস বিশ্লেষক এ কথা বলেছেন কিনা আমি জানি না। ডলার তো এমনিই তার স্থান দখল করে আছে। এটি এমন কিছু নয় যে ডলার সংকটে ছিল বা Dollar is not the most important currency of the world. এটি ঠিক যে আমেরিকা ডলার প্রিন্ট করিয়ে নিজের ইচ্ছাকে পূরণ করতে পারে। কিন্তু এটি এত সহজ নয়। সে ডলার আমার হাতে আসলে আমিও তো আমেরিকার মাল কিনতে পারি। It creats a counter demand of American goods. এটি আমেরিকার এডভানটেজ যে ডলার বিশ্ববাজারের বিনিময় মুদ্রা হয়ে গেছে। এটি তো আগে থেকেই ছিল। এতে ইরাক তো কোনো সংকট সৃষ্টি করেনি। মধ্যপ্রাচ্য করেনি। যে সংকট হয়েছে সেটি ইউরোপে হয়েছে। কাজেই ডলারের জন্যই যদি যুদ্ধ করতে হয় তাহলে ইউরোপের বিরুদ্ধেই করা উচিত।

প্রশ্ন : ডলার আর ইউরোর সংঘাতকে কিভাবে দেখেন?

উত্তর : আমি একে সংঘাত মনে করি না। শুধুমাত্র ইউরোপের জন্য বৃটেনের পাউন্ড, ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক, জার্মানীর ডয়েস মার্ক প্রভৃতি কারেন্সিকে একত্রিত করে একটি কারেন্সি ইউরো করা হলো। এতে তাদের বাজার এক হয়ে যায়। কয়েকটি কারেন্সিকে এক করায় অর্থনীতিতে সামান্য সুবিধা বাড়ল। দুর্বল ও শক্তিশালী কারেন্সির মধ্যে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করল। সবকিছু বিবেচনায় তারা মনে করল তাদের এক কারেন্সি থাকা দরকার। সেটি তারা করেছে। তাই বিষয়টিকে বড় করে দেখার কিছু নেই। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সহজ করতে চাই। ইন্ডিয়া বা জাপান যদি বলে আমি ইউরোতে পেমেন্ট নেব তাহলে সেখানে ডলারের কি বলার আছে?

প্রশ্ন : আমেরিকা বারবার কেন মুসলিম দেশগুলোর উপরই আক্রমণ চালাচ্ছে?

উত্তর : বাস্তবেই আফগানিস্তান আর ইরাকের উপর আক্রমণের কোনো যুক্তি ছিল না। আমেরিকায় নিউ কনজারভেটিভ খৃষ্টানদের একটি উত্থান হচ্ছে। এরাই বর্তমানে ক্ষমতায়। At the deep corner of the heart they want the establishment christian domination in the world. যদি তারা শান্তিপূর্ণভাবে তা করতে পারে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু অস্ত্র দিয়ে করবে কেন? তাদের এরকম পলিসি গ্রহণ করা উচিত যেমন ইসলামে আছে- লা ইকরাহা ফিদদীন, অর্থাৎ ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই।

www.pathagar.com

এর সাথে তাদের আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ চলছে। জাতিসংঘের মাধ্যমেও চলছে। আমি এক জায়গায় ইউএনও (UNO)-এর পরিবর্তে তাদের ইউনাইটেড স্টেটস অর্গানাইজেশন, USO করার কথা বলেছি। UNO ওয়েস্টার্ন পারপাস সার্ভ করে ওয়েস্টার্ন ইনিস্টিটিউশনে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের পারপাস সার্ভ করছে না। এজন্য জাতিসংঘকে গ্রহণযোগ্যভাবে পুনর্গঠন দরকার।

প্রশ্ন : কিভাবে? আমেরিকা তো জাতিসংঘকে তার নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করছে।

উত্তর : বাস্তবে জাতিসংঘ তার রোল প্লে করতে পারছে না। যখন জাতিসংঘ আমেরিকার প্রস্তাব মানে তখন জাতিসংঘ ভালো। তখন আমেরিকা বলে এটি আন্তর্জাতিক কমিউনিটির রায়। আমেরিকা তার পক্ষে প্রস্তাব বা রায়ের জন্য জাতিসংঘকে সবসময় চাপ দিতে থাকে। আর আমেরিকার বিরুদ্ধে কোনো রায় বা প্রস্তাবই দেয়া যায় না। সে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বিশ্বের সবাই জানে যে আমেরিকা জাতিসংঘকে তার নিজের ইচ্ছা ও সুবিধা মতো ব্যবহারের ফলে জাতিসংঘ তার পকেট সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তারা হুমকি এবং নানা কথা বলে প্রস্তাব পাস করে। এ জাতিসংঘ দিয়ে মানবতার তেমন কোনো কল্যাণ হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। ১৯৪৫ থেকে আজ পর্যন্ত তেমন ভালো কাজ করতে পেরেছে তা আমরা বলতে পারছি না। হতে পারে এ জাতিসংঘের না থাকার চেয়ে থাকার দরকার ছিল। না থাকলে হয়তো বা আরো বিপদ হতে পারত। কোল্ড ওয়ারের সময় যদি জাতিসংঘ না থাকত তাহলে হয়তো আরো বড় ধরনের বিপদ হত।

কিন্তু এখন মানবতার ভবিষ্যতের দাবি হলো জাতিসংঘ পুনর্গঠন করা। এখানে সিঙ্গেল কান্ট্রি ভেটো পাওয়ার বাতিল করতে হবে। সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য ১৫ থেকে ২১ করা যেতে পারে। সাধারণ প্রস্তাব ভোটের মাধ্যমে পাস হবে। কিন্তু টু ফিফথ যদি বলে আমরা ভেটো দিলাম তাহলে সে প্রস্তাব পাস হবে না। এজন্য অনেক গভীর চিন্তাভাবনা করা দরকার। সিকিউরিটি কাউন্সিলে সদস্য পদ বন্টনের সময় নিরপেক্ষতার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। বর্তমানে এতে ওয়েস্টার্ন দেশের সংখ্যাই বেশি। এর পাশাপাশি ন্যাম (NAM) যদি একটি নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে তাহলে অনেক ভালো হবে। তখন ছোট ছোট দেশগুলোর জন্য ন্যাম একটি ভালো প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হবে। তারাই তখন বলবে আমাদের সমস্যা আমরাই দেখতে পারব, তোমাদের আর আসার দরকার নেই।

এদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোটেরও একটি ইতিহাস আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গণতন্ত্র হুমকির সম্মখীন হলো। রাশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশেই সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠিত হলো কোথাও আভ্যন্তরীণ শক্তিকে ইন্ধন যুগিয়ে আবার কোথাও রাশিয়ার দ্বারা দখলকৃত হয়ে। তখন আমেরিকা কয়েকটি জোট করে। ন্যাটো, সেন্টো, সিয়াটো এরকম কিছু জোট এমনভাবে গঠিত হয় যা রাশিয়াকে ঘেরাও করে রাখে। তারা আক্রান্ত হলে তাদেরকে সাহায্য করার গ্যারান্টি দেয়া হয়। ন্যাটো করাও হলো ওয়েস্ট ইউরোপকে রক্ষা করার জন্য। আজ আর এগুলোর কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না।

প্রশ্ন : অবস্থা দেখে কি মনে হয় সবকিছু আমেরিকার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে?

উত্তর : আসলে আমেরিকার এখন যে দুর্দান্ত দাপট চলছে মনে হবে এর কোনো শেষ নেই। তবুও আমরা জানি সবকিছুরই শেষ আছে। আমেরিকার এ দুর্দান্ত দাপট তার আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক শক্তির দ্বারা ভেঙে যেতে পারে। ইউরোপ থেকে সিরিয়াস প্রোটেস্ট আসতে

www.pathagar.com

পারে। আবার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো একত্রিত হয়ে তারাও আমেরিকার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে পারে। অন্যদিকে আমেরিকা যা চায় তা আবার হয়ও না। আফগানিস্তানে হয়নি। তারা ভেবেছিল ইরাকে তারা ওয়েলকাম পাবে কিন্তু তা তারা পায়নি। যে সমস্ত দালাল পেয়েছিল তাদের দ্বারাও তারা সুবিধা করতে পারেনি। তারা বিশ্ব সমর্থনের আসা করেছিল, তাও হয়নি।

প্রশ্ন : ইরাক আক্রমণের প্রধান যুক্তি ছিল যে দেশটিতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে। কিন্তু এখন প্রমাণিত হয়েছে ঐ তথ্যের পেছনে কোনো সত্যতা ছিল না। গোটাটাই ছিল বুশ-ব্লেয়ার প্রশাসন ও মিডিয়ার কারসাজি। মিডিয়া কেন এ ধরনের মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় এবং সহযোগিতা দিল?

উত্তর : আমরা তো জানি ইহুদী মিডিয়া হোক আর খৃষ্টান মিডিয়াই হোক ওভার অল মিডিয়া আমেরিকার স্বার্থই দেখছে। কিন্তু তবুও তার ফাঁক-ফোকর দিয়ে অনেক কথা বেরিয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা পরিদর্শকদের জানায় আমরা যুদ্ধে যাব তোমরা তাড়াতাড়ি ইরাক থেকে চলে আসো। পরিদর্শক তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে আসল। জাতিসংঘের প্রস্তাব অনুযায়ী তাদের রিপোর্ট দেয়ার কথা। কিন্তু আমেরিকার কথায় দেয়া হলো না। এজন্য পরিদর্শক টীমের ভেতর অসন্তোষ এবং গভীর একটি ক্রোধ আছে। আর সে ক্রোধেরই প্রকাশ হয়েছে এখানে-সেখানে। হ্যান্স ব্লিক্স যা বলছে এগুলো তার ক্রোধেরই কথা। হ্যান্স ব্লিক্সকেও আমি খুব একটি ভালো বলব না। এ যুদ্ধের ঘটনায় সেও কমবেশি দায়ী। সে সোজা ভাষায় সহজ করে বলতে পারত এখানে আমরা কোনো কিছু পাইনি, এখানে আক্রমণের কোনো বৈধতা নেই। তাহলে কিন্তু আজকে এমন ঘটনা ঘটত না। আমরা আরো দেখব, আমাদের আরো সময় দরকার, পাওয়া যায়নি কিন্তু নেই বলা যাবে না - এসব কথা বলে ব্লিক্স কিন্তু আমেরিকাকে কমবেশি সুযোগ করে দিয়েছিল। সে হিসেবে আমি ব্লিক্সকে দোষী পাই। আল বারাদে অনেক ক্লিয়ার কথা বলেছে। সে বলেছে নিউক্লিয়ার ওয়েপনের ক্যাপাবিলিটি ইরাকের নেই আর পাওয়াও যায়নি।

প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রশ্নে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের কৌশল কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা হিসেবে ছোট রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিষয়টি আমরা ধরতে পারি। এ নিরাপত্তা কেমন হবে তা নির্ভর করবে সে কি পরিস্থিতিতে আছে? রাষ্ট্র যদি ছোট হয় আর তার চারদিকে শত্রুভাবাপন্ন দেশ বা যাদের সাথে তার ঐতিহাসিক সংঘাত আছে এ রকম ব্যাপার না থাকে তাহলে তার তেমন কোনো নিরাপত্তাজনিত সমস্যা থাকবে না। যেমন সুইজারল্যান্ডের কথা বলতে পারি। সুইজারল্যান্ড খুবই ছোট দেশ, বিশ্ব নিরপেক্ষ দেশ এবং তার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পাশে যদি কোনো বড় রাষ্ট্র থাকে, যেমন - রাশিয়া, ভারত, আমেরিকা বা চীনের আশপাশের রাষ্ট্রগুলো, তাহলে এক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। ছোট রাষ্ট্রের নিজেরই দায়িত্ব হচ্ছে সে যেন প্রতিবেশী বড় রাষ্ট্রের সাথে অহেতুক কোনো বিতর্কে জড়িয়ে না পড়ে এবং তার উচিত হবে সাধ্যমতো ভাব রক্ষা করা। এ কথাগুলো আমি আগেও বলেছি। একই সঙ্গে তার উচিত আরো কিছু বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করা। তাহলে হয়তো প্রয়োজনে তার সাহায্যে বড় কোনো রাষ্ট্র এগিয়ে আসতে পারে। যদিও রাজনীতিতে এটি বলা কঠিন। তার নিজের রক্ষার জন্য সম্ভব হলে সামরিক শক্তি বাড়ানো উচিত। প্রয়োজনে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জনগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত। এটি একটি ফরমেট যা সবখানেই ব্যবহার করা যায়।

www.pathagar.com

এরপরও আমি বলতে বাধ্য ছোট রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সমস্যা সবসময় হুমকির সম্মুখীন থাকবে, যদি জাতিসংঘের মতো সংগঠন শক্তিশালী না হয়। যদি বড় রাষ্ট্রগুলো আরো সভ্য না হয়। তারা যতই নিজেদের সিভিলাইজড দাবি করুক তারা আসলে সিভিলাইজড নয়। তারা যা করে তাতে তাদেরকে সভ্য বলা চলে না। বর্তমানে আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া, ভারত যা করছে তাকে সভ্য বলা চলে না। তারা যতই নিজেদের ভদ্র ভাবুক বা দাবি করুক তারা যে আইনকানুন মেনে চলে তা কিন্তু বলা যাচ্ছে না। কাজেই যদি আন্তর্জাতিক সংগঠন শক্তিশালী না হয় এবং বড় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার মতো মানসিকতা ডেভেলপ না করে তাহলে ছোট রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন থাকবে। এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে এই বাস্তবতা মেনেই চলতে হবে।

প্রশ্ন : এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি ইরাকের পর আমেরিকা ইরান সরকারকে উৎখাতের বা অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। এ বিষয়ে ইরান বা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর কি ধরনের ভূমিকা নেয়া উচিত?

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমেরিকার মতো রাষ্ট্র যদি কোনো রাষ্ট্রকে হুমকি দেয় সেখানে ঐ রাষ্ট্রের পক্ষে এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবার আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমেও তেমন কিছু করা যাচ্ছে না। তারা তো এসব সংগঠনকে মানে না। সে সংগঠনগুলোও শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারে না। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে প্রত্যেককে যতটুকু সম্ভব নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে। আমি জানি সব রাষ্ট্রের পরিস্থিতি এক নয়। ইরাকের পরিস্থিতি আর ইরানের পরিস্থিতি দু'রকম। ইরাকের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে সেখানে অত্যাচারী শাসক ছিল। কিন্তু ইরানের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যাচ্ছে না। আমেরিকা এ পরিপ্রেক্ষিতে কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। ইরান অনেক শক্তিশালী ও বড় দেশ। ইরাকের তুলনায় ইরানের জনসংখ্যাও অনেক বেশি। তাদের নিজেদের মধ্যেও বড় ধরনের কোনো সংঘাত নেই। আমেরিকা এখানে কোনো সংঘাত বাধাবে বা বাধাতে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। ইরাকেই তো আমেরিকা বিব্রতকর অবস্থায় আছে। প্রায় প্রতিদিনই তাদের সৈন্য মারা যাচ্ছে। ইরাকী জনগণ ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছে। সামনে এ সংঘাত আরো বাড়তে পারে। কাজেই আমেরিকা ইরাক, আফগানিস্তান নিয়ে অনেক ব্যস্ত। সামনে তাদের নির্বাচনও। এসবকে সামনে রেখে আমার মন বলে না কোনো নতুন সংঘাতে সে জড়াবে। যদি জড়িয়েও পড়ে তাহলে তার জন্য সেটি ইরাকের চেয়ে বেশি অকল্যাণকর প্রমাণিত হবে।

প্রশ্ন : আমেরিকান প্রফেসর হানটিংটন পশ্চিমাদের সাথে ইসলামের সভ্যতার যে সংঘাতের কথা বলেছেন তা কোথায় গিয়ে শেষ হবে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : সংঘাত শব্দটি আগে ব্যবহৃত হতো না, তবে সংঘাত আগেও ছিল। ক্রুসেড আসলে কি ছিল? ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে খৃষ্টান ইউরোপের বরাবর একটি বিরোধ ছিলই। তখন আমেরিকা কিছুই ছিল না। ইউরোপ থেকে আমেরিকায় সাদারা গেলই তো সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে। প্রথমে 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজ গেল। এভাবে আমেরিকার ইতিহাস হলো তিনশ বছর। তারও আগে ইউরোপ আর মুসলিম বিশ্ব ছিল। এদিকে চায়না ছিল। সে সময়ের ক্রুসেডই তো আজকের সংঘাত। তখন খৃষ্টান ইউরোপ কর্তৃক মুসলমানদের বশ্যতায় রাখার প্রচেষ্টা ছিল। কিন্তু পারেনি। এরপর ঔপনিবেশ, এটাও এক প্রকার আগ্রাসন, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে এবং সাধারণভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে ইসলাম ও খৃস্ত্রীয়বাদের মধ্যে একটা সংঘাত তো আছেই। আবার হিন্দুবাদ ও ইসলামের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই তা বলা যাবে না। এদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য প্রভৃতির সংঘাত আছে। কিন্তু সে সময় সংঘাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। তবে তা একদিকে ভালো ছিল। কিন্তু হানটিংটন একটি ডর্মেন্ট, প্রকাশ্য নয় লুপ্ত এবং অস্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্টকরণ করল, ব্যাখ্যা দান করল এবং এর মাধ্যমে বিশ্বের নজর সংঘাতমুখর করে তুলল। এতে একটি দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট রূপ নিল। হানটিংটন শুধু এ কথাই বলল না যে সংঘাত আছে। আরো বলল সংঘাত হচ্ছে ইসলামের সঙ্গে, সংঘাত কুনফুসিয়াস চায়নার সঙ্গে। তাই এখনই সামরিক শক্তিতে আমাদেরকে অপরাজেয় হতে হবে। তাদের সামরিক শক্তি গড়ে তুলতে দেয়া যাবে না। তাদের (ইসলামের) মধ্যে ঐক্য ভেঙে নিজেদের মধ্যে ঐক্য বাড়াতে হবে। ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার শক্তি বাড়াতে হবে। রাশিয়াকে সঙ্গে নিতে হবে। সুতরাং এটি শুধুমাত্র সংঘাতের একটি থিওরাইজেশন ছিল না, এটি সংঘাতের একটি ম্যাপ। এটি একটি ম্যানিফেস্টোর মতো। সেখানে এ পরিকল্পনা বা রূপরেখা মতো এই পথে অগ্রসর হতে হবে।

আসলে হানটিংটন ভালো কথা বলেননি। চাইলে তিনি উল্টো কথা বলতে পারতেন। তিনি যদি মানবতাবাদী হতেন তাহলে বলতেন, দেখ, এ সংঘাত আছে। এর থেকে যদি আমরা উদ্ধার না পাই তাহলে মানবতা বিপদাপন্ন হবে। সে জন্য আমাদের সংস্কারের পথেই আগানো উচিত। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমন্বয় সমঝোতা করা উচিত। ডায়ালগে আসা উচিত। কিন্তু তিনি সেটি বললেন না। সংঘাতকে আরো সংঘাতমুখী করে তুললেন। এদিক থেকে তিনি মানবতার বহুবিধ ক্ষতি করলেন। যদি হানটিংটন উল্টো কথাই বলত তাহলে মুসলমানরাও বলতে পারতো যে ইসলামও এ কথা বলে। রাসূলুল্লাহ (সা) মদিনাতে একটি সহ-সম্পর্কের দৃষ্টান্ত খাড়া করলেন; ইহুদী ও মুসলমানরা তাদের নিজস্ব জীবনধারা অনুসরণ করবে। একই রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক জীবনধারা চলবে। এতে কোনো সমস্যা নেই। পরবর্তীতে যার উদাহরণ আমরা চায়নায় দেখি ওয়ান স্টেট টু সিস্টেমের মতো। একই রাষ্ট্রে চায়না এক সিস্টেম আর হংকং আরেক সিস্টেম অনুসরণ করছে। এতে ওয়ান স্টেট টু সিস্টেম ধারণা বেরিয়ে আসছে। কিন্তু রুট খুঁজলে আমরা দেখব ইসলামে এ সিস্টেম সবসময়ই ছিল। ইসলাম তো সকল জাতিকেই আলাদা আলাদা মিল্লাত মনে করে। তার মানে হলো ইসলাম একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন সিস্টেমে বিশ্বাস করে। ইসলামে 'লা ইকরাহা ফিদ্বীন' এর কথা বলা হয়েছে। ইসলাম বলেছে, 'লাকুম দ্বীনকুম ওয়াল ইয়াদ্বীন'। যা আজকের দিনেও সত্য। রাষ্ট্র ইসলামকে অনুসরণ করবে। যার যার ধর্ম তার তার কাছেই থাকবে। কাজেই আমি বলব হানটিংটন ভালো করেননি, মন্দ করেছেন।

প্রশ্ন : বর্তমানে বিশ্ব যে পর্যায়ে এসে পৌছেছে তাতে কি মনে হতে পারে পশ্চিমাদের সাথে মুসলমানদের সংলাপের প্রয়োজন?

উত্তর : আমি বলব প্রয়োজন। দুনিয়া যত অস্ত্রবাজরাই নিয়ন্ত্রণ করুক না কেন কিছু গ্রেট ফিলোসফারই মানব ইতিহাসের গতি ঘুরিয়ে দেয়। তারা যে তত্ত্ব দেয় তাই বিশ্ব শেষ পর্যন্ত মেনে চলে। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে ইসলাম ও ইসলামের বাইরে কিছু গ্রেট ফিলোসফারের আবির্ভাব ঘটবে - যারা শান্তির কথা বলবে, সভ্যতার কথা বলবে, সংস্কৃতির কথা বলবে। মানব ঐক্য ও সম্মানের কথা বলবে। আমি নিজেও মনে করি ইসলাম জোর

www.pathagar.com

করে চাপিয়ে দেয়ার কোনো বিষয় নয়। মুসলমানদের মধ্যে এরকম চিন্তা থাকলে বাদ দেয়া উচিত। অবশ্যই আমাকে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়া উচিত কিন্তু জোর করে নয়। জোর করে সাম্রাজ্য করা যাবে না। এটি ইসলামের লক্ষ্যও নয়। আগে বর্ডার অনির্দিষ্ট ছিল। এখন সমস্ত বর্ডার নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আর প্রত্যেক রাষ্ট্রের এ নির্দিষ্ট সীমানা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। জাতিসংঘ তা স্বীকার করে নিয়েছে। আবার নানারকম দ্বিপাক্ষিক কিংবা বহু দেশের মধ্যে চুক্তিগুলো আমরা মেনে নিয়েছি। কার কি অধিকার, কি করা যাবে কি করা যাবে না, সামরিক চুক্তি, আকাশ কিংবা নৌপথের চুক্তি অর্থাৎ সকল ধরনের চুক্তিই তৈরি হয়েছে এবং তা আমরা সবাই মেনে নিয়েই চলছি। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতিসহ সব আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোতেই তো আমরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলো সাইন করেছি। কাজেই এখন আমরা জোর করে যেমন চুক্তি ভঙ্গ করতে পারব না তেমনি কাউকে আক্রমণও করতে পারব না। আর চুক্তি ভাঙাও উচিত হবে না। ইসলাম এসব চুক্তি মেনে চলারই কথা বলে। কেননা আল্লাহতায়ালাই তো চুক্তি মানতে কুরআনে বলেছেন। সূরা মায়েদার ১ম আয়াতেই তো বলেছেন, 'আউফু বিল উকুদ'- তোমরা চুক্তি মেনে চল। সুতরাং এখন আর আমাদের অন্য রাষ্ট্রগুলোর উপর হামলা করার সুযোগ নেই। তবে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর চিন্তাভাবনা মুসলমানদের মধ্যে একেবারে নেই তা বলা যাবে না। সেগুলো মুসলমানদেরকে দমন করতে হবে। অনুরূপভাবে হিন্দু, খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদেরও এরকম চিন্তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন : এখন তো ইউএনও (UNO) ইউএসও (USO) অর্থাৎ ইউনাইটেড স্টেটস অর্গানাইজেশনে পরিণত হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে জাতিসংঘ থেকে কি মুসলিম দেশসমূহ বেরিয়ে আসতে পারে?

উত্তর : সেটি আরেকটি দিক। যদি সত্যিকার অর্থেই জাতিসংঘকে রিফর্ম করা না যায় তাহলে আমি আবার বলব ছোট রাষ্ট্রগুলোর উচিত ন্যামের (NAM) মাধ্যমে আলাদা জাতিসংঘ গঠন করা। তার নিজস্ব একটি সিকিউরিটি কাউন্সিল থাকা। আমি তো বুঝি না জাতিসংঘ থেকে লাভ কি? না থাকলে ক্ষতি, কিন্তু থেকে লাভ কি? আমরা আমেরিকাকে জাতিসংঘ থেকে বহিষ্কার করতে পারব না। যদি বহিষ্কার করতে পারতাম তাহলে আমরা জাতিসংঘে থেকে যেতাম। এ বাস্তবতায় আমরা যেতে পারছি না। এরচেয়ে বিকল্প হিসেবে আমরা ন্যামকে খাড়া করতে পারি।

প্রশ্ন : আমেরিকার সাধারণ মানুষসহ বিশ্বের জনগণ ইরাক আগ্রাসনের বিরোধিতায় রাস্তায় নেমেছে। এ বিশ্ব জনমতকে একটি সুপার পাওয়ার ধরে এটিকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি?

উত্তর : এটি তো আর একদিনে হয় না। একটি রাষ্ট্রের আর্মড পাওয়ার জোর করে ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু বিশ্ব জনমতের যে ভূমিকা তা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে। হঠাৎ করে কার্যকরী হয় না, বিশেষ করে বড় শক্তির বিরুদ্ধে। এর প্রমাণ দেখলাম বিশ্ব জনমত একরকম হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা বিরুদ্ধ কাজ করল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিশ্বজনমত আমেরিকান রাষ্ট্রশক্তির কাছে হেরে গেল। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে তা নয়। আসলে হেরেছে আমেরিকা। এজন্য আমেরিকা চিরদিন ধীকৃত হবে। ইতিহাসে এটি ধীকৃত হতে থাকবে যে আমেরিকা বিশ্বজনমতের বিরুদ্ধে ছিল, আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ করেছিল, জাতিসংঘকে অস্বীকার করেছিল। ইরাকে যতই সমস্যা বাড়বে তাদের প্রতি ধিক্কারও ততই বাড়বে। আমার মনে হয় বিশ্বজনমত বাস্তবিকই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের অধিকারের পক্ষে, সকল মানুষের অধিকারের পক্ষে থেকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে।

www.pathagar.com

ইসলাম বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিরোধী নয়

প্রশ্ন : অনেকেই গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের বিরোধ খোঁজার চেষ্টা করেন। গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের আদৌ কোনো বিরোধ আছে কি ?

উত্তর : হ্যাঁ, এটি ঠিক। তবে বিশ্বের সব দেশে এ রকম বিরোধ নেই। পাকিস্তানে এ বিরোধ নেই। আমরা যদি একটু পেছনে যাই দেখব, পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর গঠিত সংবিধানের একটি অংশ ছিল where in the principle of democracy, equality, social justice and freedom shall be observed as enunciated by Islam. এটি ৪৯ সাল থেকেই ছিল। এটি ১৯৫৬ সালে সংবিধানে সংযুক্ত হলো। এর অবজেক্টিভ রেজুলেশন যার ভিত্তিতে জনগণ আন্দোলন করেছিল তার মধ্যে এসব শব্দ ছিল। এটি গেল সে সময়ের কথা। ১৯৭৩-এর সংবিধানে একই অবস্থা। এরপর ২০০২ সালে এমএমএ, আহলে সুন্নাহর চারটি বড় দল ও আহলে শিয়ার একটি বড় দল, এ ৫টি দল মিলে নির্বাচনে শিয়া-সুন্নির ঐক্যের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য লড়াই করে। সামরিক শাসনকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা তো বলে we shall fight for sovereignty of parliament. তারা পার্লামেন্টকে সার্বভৌম করার কথা বলে। এটিকে তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সঙ্গে কোনো সংঘাত বা বিরোধ বলে মনে করে না। আমরাই এ ধারণা পোষণ করি যে কাউকে ক্ষমতা দিলে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব চলে যাবে। কিন্তু এ সার্বভৌমত্ব মানে হলো ক্ষমতা। রাষ্ট্রকে এক ধরনের ক্ষমতা দিতে হয়। পার্লামেন্টকে এক ধরনের ক্ষমতা দিতে হয়। তার সঙ্গে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের নির্ঘাত একটি সংঘাত আছে সে কথা সত্য নয়। আমি এমএমএ-এর বক্তৃতাগুলোতে প্রায়ই দেখি sovereignty of the people and sovereignty of the parliament। তারা এসব শব্দকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাথে সংঘাত বলে মনে করে না। এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটি কথা বলব। ইরানের সংবিধানে দেখেছি সার্বভৌমত্বকে তারা দু'ভাগে ভাগ করেছে - sovereignty of Allah and sovereignty of people. এটি তাদের সংবিধানের ৫৮ ধারায় আছে। সুতরাং সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা ঠিক নয়। আমাদের আরো ব্যাপকভাবে এ তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা দরকার।

ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হলো ৪৭-এর ১৭ আগস্ট। এর কয়েকদিন আগে ১৪ ও ১৫ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়। ইন্দোনেশিয়াতেও ৫টি দফায় এক মত হতে দেখা যায়। একে পঞ্চশীলা বলা হলো। আল্লাহর উপর আস্থা (faith in one God) প্রথম। এরপর ডেমোক্রেসি, ন্যাশনালিজম, সোশ্যাল জাস্টিস। সেখানেও আমরা দেখি যারা এর ড্রাফট করেছিল তাদের মধ্যে ছিল ইসলামী আন্দোলনের মোহাম্মদ নাসির, যিনি প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন- তার নেতৃত্বে এটি পার্লামেন্টে পাস করা হয়। সেখানে 'গণতন্ত্র' শব্দের ব্যবহার ছিল। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সারা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী দলগুলো গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে। তারা নির্বাচনের জন্য, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। নির্বাচিত পার্লামেন্টের জন্য সংগ্রাম করছে। আজকে সৌদী আরবের লোকেরা সংগ্রাম করছে- যতটুকু তারা করতে পারে, একটি পার্লামেন্টের জন্য যাতে নির্বাচনের মাধ্যমে তারা সেখানে যেতে পারে।

www.pathagar.com

থিওরিটিক্যাল এনালিসিসে আমরা দেখি মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহ), ইমাম হাসান আল বান্না (রহ)-সহ ইউসুফ আল কারযাভীর মতো বড় আলেমগণ গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখেন না। তারা গণতন্ত্রকে ইসলামী বলেন। তবে পরিভাষাগতভাবে বোঝাতে আমরা এটিকে ইসলামী গণতন্ত্র বলতে পারি।

আসলে মূল বিষয় হলো যেখানে আল্লাহতায়ালার আইন দেয়া আছে সেখানে সেটি মানতে হবে। এটিকেই সার্বভৌমত্ব বলা হয়। আল্লামা ইকবালের যদিও গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা ছিল, তারপরও বলেছেন এর থেকে বেটার সিস্টেম নেই। তিনি নিজেও পাঞ্জাব এসেম্ব্লির সদস্য ছিলেন। বৃটিশ আমলেই তিনি ইলেকশন করাকে বৈধ মনে করেছেন। আর সেখানে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রে গণতন্ত্রকে বৈধ মনে না করার কোনো কারণ নেই। ইকবাল একটি রূহানী গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। রূহানী গণতন্ত্রের মানে হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে, আল্লাহর চূড়ান্ত ক্ষমতার অধীনে মানুষের গণতন্ত্র।

খিলাফত মানেও গণতন্ত্র। খিলাফত হলো প্রতিনিধিত্ব। জনগণের যারা প্রতিনিধি তারা রাষ্ট্র শাসন করবেন। তারা আল্লাহর প্রতিনিধি গণ্য হবেন, ইসলাম মোতাবেক শাসন করবেন এটিই খিলাফত। গণতন্ত্রে জনগণের প্রতিনিধিরা শাসন করবেন। খিলাফতের বাংলা অনুবাদ আমি গণতন্ত্র করতে পারি। গণতন্ত্র মানে আল্লাহর শাসন লঙ্ঘন নয়। আল্লাহর শাসনের বিপরীতে আমরা জনগণের শাসন বলি না। আমরা বলি রাজার শাসনের বিপরীতে জনগণের শাসন। মিলিটারি ডিক্টেশনের বিপরীতে জনগণের শাসন। গণতন্ত্র বলতে আল্লাহর শাসনের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে- এটি একেবারেই ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে আমরা রাজার শাসন, স্বৈরশাসন কিংবা রাজতন্ত্রের শাসন চাই না। আমরা জনগণের শাসন চাই। এ শাসন জনগণের। বাস্তবে শাসন তো আল্লাহতায়ালা করেন না। আল্লাহ মানুষকে খলিফা হিসেবে পাঠিয়েছেন। মানুষই সে খলিফার দায়িত্ব পালন করে। দুনিয়া চালাবে খলিফারা।

প্রশ্ন : গণতন্ত্র সম্পর্কে এ ধারণা কি পশ্চিমা অপপ্রচার, না আমাদেরই ভুল বোঝাবুঝি?

উত্তর : পশ্চিমারা বলে আমরা গণতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত নই। তারা বলে, ইতিহাস প্রমাণ করে যে আমরা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি না। তাদের কথা এ পয়েন্টে। কিন্তু গণতন্ত্র ইসলামিক নয়- এ ধারণা আমাদের ভেতরই একদল লোকের। এরা নিজেরা বুঝতে পারে না যে এরা ইসলামের ক্ষতি করছে। গণতন্ত্রকে ইসলাম বিরোধী হিসেবে দেখাতে চায় যা ইসলামের জন্য সংকট সৃষ্টি করে, বিশেষ করে এলিটদের মাঝে এটিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে।

আমরা ইসলামকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলছি আমাদের দোষে। এমন যদি হতো ইসলামই গণতন্ত্র চায় না এবং এজন্য এটি অগ্রহণযোগ্য, তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা এটিকে অগ্রহণযোগ্য করে রাখতে পারি না। এটি আমাদের ব্যর্থতা। এটি দুঃখের কথা। যাদের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে খুবই কম জ্ঞান আছে তারাই আজ এর বড় প্রবক্তা হয়ে গেছেন। যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স ভালো করে পড়েছেন তারা কিন্তু এ কথা তুলছেন না। প্রশ্ন তুলছেন এমন কিছু সংখ্যক লোক যাদের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত কম, যারা রাষ্ট্র বিজ্ঞানী নন।

প্রশ্ন : এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান এবং ইসলামে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আদর্শভিত্তিক দলগুলো ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকায় এখনো আসতে পারছে না কেন?

উত্তর : আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে এর কয়েকটি কারণ আছে। একটি কারণ হলো ইসলামী দলগুলোর ওভারঅল যোগ্যতার ঘাটতি। এ ব্যর্থতা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না।

www.pathagar.com

যদি কোনো দোকানদার কিংবা কোনো কোম্পানী তার পণ্য বিক্রি করতে না পারে তার জন্যে তো মার্কেটিং- এর ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়। ইসলাম একটি মহৎ আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা - এটি যদি আমরা বলি এবং মানি তাহলে এটিকে আমরা সেল করতে পারছি না কেন? তার জন্য সেলসম্যান ও সেলস উইমেন যেই হোক না কেন, সেলস পার্সনকেই আমাদের দোষারোপ করতে হবে। এর কারণ হচ্ছে তাদের মধ্যে যোগ্যতার অভাব, স্টাডির অভাব। যে ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন, পড়াশুনা জানা লোক দরকার সে ধরনের লোকের অভাব।

এ যুক্তি সকল ইসলামিক দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইসলামকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। যেমন- খুৎবার মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে ইসলামের যে বাণী কোটি কোটি লোকের কাছে পৌঁছায় তার মান এত নিম্ন যে মানুষের মনে ইসলামের মান সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা জন্মায়। তারা ভাবে এটি একটি খুবই সাধারণ জিনিস। ইসলামের বিশালত্ব সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা হয় না। ইসলাম যে একটি ইউনিভার্স্যাল বিষয়, মানবতার মুক্তির বিষয় তা খুৎবা শুনে মনে হয় না। দু-এক স্থানের খুৎবা ব্যতীত এ হলো সামগ্রিক অবস্থা। অথচ বছরের ৫২ সপ্তাহে যদি পরিকল্পিতভাবে খুৎবা দেয়া হতো তাহলে তা যে কত বড় মহৎ কাজ হতো, তা আমাদেরকে বুঝতে হবে।

ইসলামকে আজ একটি ভীতিকর বিষয় বানানো হয়েছে। হাত কাটা, জেনার শাস্তি পাথর মারা - এ ধরনের বিষয়গুলো খুব বেশি তুলে ধরা হয়েছে এ দেশের মানুষকে পূর্ণরূপে কনভিন্সড করার আগেই। বলা হয় গুলিস্তানের সামনে যদি একটি লোককে ফাঁসি দেয়া হয় কিংবা পাথর দিয়ে মেরে ফেলা হয় তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা জানা জরুরী যে শরীয়াহ আইন মানেই শুধু এসব নয়। ইকোনোমিক আইন, বিজনেস আইন - সবই শরীয়াহ আইন। গভর্নমেন্টের আইন যদি ইসলামভিত্তিক হয় তাহলে তাও শরীয়াহ আইন। ফ্যামিলি থেকে শুরু করে কালচারাল ক্ষেত্র পর্যন্ত যে আইন হবে সবই শরীয়াহ আইন। অথচ শুধু ক্রিমিনাল আইনকেই আজ আমরা শরীয়াহ আইন বানিয়ে ফেলেছি।

তেমনিভাবে ছোট ছোট বিষয়গুলোকে বড় বেশি তুলে ধরা হয়েছে। শার্ট-প্যান্ট পরা যাবে না, টুপি পরতে হবে - মসজিদে গিয়ে টুপি না পরলে আগে শাসনই করা হতো। এ যে ছোটখাট বিষয়গুলোকে হাইলাইট করা হয়েছে তা শরীয়াহর মেজাজ কিংবা এর গুরুত্ব বা অগ্রাধিকারের বাইরে। এসব বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণে তিনটি শ্রেণী ভুল বুঝেছে। যুব সমাজ, নারী সমাজ এবং এলিট শ্রেণী। এটি একটি মারাত্মক অবস্থা। এরকম সমাজে ইসলাম কিভাবে অগ্রসর হবে। অন্যদিকে কৃষক, শ্রমিকদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ঠিকমত দেয়া হচ্ছে না। যাদের মধ্যে পৌঁছাচ্ছে তাদের মধ্যে আবার এ তিন শ্রেণী বাদ পড়ে যাচ্ছে। যদিও যুবকদের মধ্য থেকেই ইসলামী আন্দোলনের লোক বেশি সংখ্যায় আসছে কিন্তু মেজরিটি বাদ পড়া ইসলামের জয়ের জন্য সমস্যা। তবুও আমি বলব এদেশের প্রায় ৭০ ভাগ লোক ইসলামকে মেনে চলে। যে দলটি বর্তমানে ক্ষমতায় আছে তারাও নিজের ভোট বাদ দিয়ে বাকি ভোট ইসলামিস্টদের কাছ থেকে পেয়েছে। জেনারেল সাহেবের দলের যে ১০/১২ ভাগ ভোট, তারও আবার ৮/১০ ভাগ ইসলামিক ভোট। এমনকি প্রধান বিরোধী দলের ভোটেরও একটি অংশ ইসলামিস্টদের ভোট। এসব হিসাব বলে দেয় এদেশের এক বিরাট অংশই ইসলামের পক্ষে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলোর ঐক্যের পথে বাধা কোথায়? এ বাধাগুলো কিভাবে দূর করা যায়?
উত্তর : এদের মধ্যে ঐক্য যে হচ্ছে না তাতেই বোঝা যায় কোনো না কোনো কিছু এতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যদিও আমি মনে করি ইসলামিক দলগুলোর মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং

www.pathagar.com

হওয়ার দরকার। আমি ঐক্য বলছি না, বলছি সংযোগ বা বোঝাপড়া থাকা ভালো। একে অন্যকে বোঝা, ঝগড়াঝাটি না হওয়া উচিত। তা ইতিহাসের অনেক পর্যায়েই হয়নি। বর্তমান সরকারে ইসলামি দলগুলোর একটি ঐক্য যদিও আছে তবে তা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে। কিন্তু মধ্যে বিরাট সময় গেছে যখন এরকম ঐক্য ছিল না।

এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে সবই সেনসেটিভ কথা হয়। ইসলামী দলগুলো ধর্মীয় ছোটখাট বিষয়ে মতবিরোধ করে। যেমন কেউ একজন ইসলামের ইতিহাসের উপর একটি বই লিখে তাতে বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে কোনো এক খলিফার অমুক আচরণ ইসলামের সংকট সৃষ্টি করেছে। এতে তিনি হিস্টোরিক্যাল এনালিসিস করলেন। কিন্তু এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে সে লেখকের বিরোধিতা শুরু হলো। বলা হলো তিনি ইসলামের বিরোধিতা করেছেন, তিনি নবীর সঙ্গীদের নিন্দা করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিংবা কোনো আলেম হয়তো ফুকাহদের কোনো একটি মতের সমর্থন দিয়ে বললেন যে, সেহরী একটু দেরি করে করা যায়। তখন এটিই ইস্যু হয়ে গেল আরেকদলের বিরোধিতা করার জন্য। আসলে এতে বিরোধিতাকারীদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় ফুটে ওঠে।

যারা ইসলামের জন্য কাজ করেন, বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের মধ্যে সংকীর্ণতা খুব বেশি। এ সংকীর্ণতার কারণে তারা ছোটকে বড় মনে করে। যদি শুধু বড়গুলোই তারা দেখতেন তাহলে কোনো মতবিরোধ হতো না। যেমন ইমাম হাসান আল বান্না বলেছেন- আমরা ঐক্যের দিকগুলোকে ভিত্তি করে একত্রে মিলে কাজ করবো আর অনৈক্যের যে ছোটখাট দিক আছে তাতে একে অন্যকে ক্ষমা করে দেব - এ মূলনীতি তারা এখনো এখানে গ্রহণ করতে পারেননি। তারা প্রতিটি ছোট ছোট বিষয়কে নিয়েই অনৈক্যের ভিত্তি দাঁড় করিয়েছেন। ফলে ঐক্য হয়নি। এ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার পেতে হবে। এ কারণেই যত সমস্যার সৃষ্টি। আর এটি তাদের শিক্ষার সাথে জড়িত। সে শিক্ষার যদি সংস্কার না হয়, পরিবর্তন না হয় তাহলে তাদের এ মানসিকতা দূর হবে না। আর মানসিকতার পরিবর্তন না হলে প্রতিবন্ধকতা থেকে যাবে।

আবার আরেক দল লোক আছেন যাদেরকে পীর বলা হয়। তাদের একটি অংশ যে কোনো কারণেই হোক পলিটিক্যাল ইসলামকে ভালো চোখে দেখেননি। তবে নিজেদের প্রয়োজনে তারা নিজেরা কোনো কোনো সময় পলিটিক্সে জড়িয়েছেন। ইসলামের মূল দলগুলো তাদের সমালোচনা ও নিন্দার সম্মুখীন হয়েছে। কেউ যদি পীরদের কাছে যায় তাহলে পীর খুব খুশি হন। আর যারা যান না তাদের উপর তারা বেজার হয়ে যান।

এমনিভাবে আমাদের তাবলীগ জামাত আছে। তারা সারা দেশে ঘুরে বেড়ায়। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। তারাও আবার এদেরকে না বুঝে ভুল বোঝে। তারা এটি বুঝতে পারেন না যে ইসলামের কাজের বিভিন্ন ডাইমেনশন আছে। কতগুলো হায়ার দিক আছে। কতগুলো সাধারণ দিক আছে। তারা সাধারণ দিক নিয়ে ব্যস্ত- ঠিক আছে, ভালো কথা। কিন্তু যারা হায়ার দিক নিয়ে এগুচ্ছেন, জাতির মূল সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করছেন, আইন ইসলামিক করার চেষ্টা করছেন, শিক্ষা ও কালচারকে ইসলামিক করার চেষ্টা করছেন সেগুলোকে তারা দেখছেন না। প্রকাশ্যে না হলেও অপ্রকাশ্যে তারা উল্টো ইসলামের মূলধারার বিরোধিতা করছেন, কিংবা ভুল বুঝছেন।

তবে ঐক্য না হবার পিছনে আমি কোনো মৌলিক কারণ খুঁজে পাই না। কেন তাদের মধ্যে আন্ডার্স্ট্যান্ডিং হবে না? পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়েছে (২০০১ সাল থেকে)। একবার

www.pathagar.com

ঐক্য হলে তাতে ফাটল দেখা দেবে বলে আমি মনে করি না। কেননা একবার একত্র হবার পর নতুন করে ফতোয়া দেয়া তো মুশকিল।

প্রশ্ন : অনেকেই আগামী কয়েকটি নির্বাচন চারদলীয় জোটের মাধ্যমে করার পরামর্শ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উত্তর : এটি কোনো সাময়িক বিষয় নয়। কেবলমাত্র একটি নির্বাচন হলো। তিন-চারটি নির্বাচন মানে পনের-বিশ বছরের ব্যাপার। এখন এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে রাজনীতির অবস্থা কি হয় বলা যায় না। এমনকি এটিও বলা মুশকিল যে আগামী দিনগুলোতে চারদলীয় জোটের কী অবস্থা হবে। এ জোট আগামীতে থাকবে কি থাকবে না, একত্রে নির্বাচন করতে পারবে কিনা, নতুন কোনো দল আসে কিনা সব সময়ের ব্যাপার।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এ রকম চারদলীয় জোটের নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য কল্যাণকর। এটি গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে সাহায্য করবে। কিন্তু পনের-বিশ বছরের যে সময়কাল, সেখানে সব ফ্যাক্টর তো আর এক থাকবে না। যেমন ক্ষমতার বাইরে অন্য কারুর শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। সার্বিক বিবেচনায় গণতন্ত্র সুসংহত করার মূল পদ্ধতি এটি নয়। গণতন্ত্র সুসংহত করার মূল পদ্ধতি হবে, we must play by the democratic rule - এটি যেন সব দলই বোঝে। এটি তারা না বুঝলে গণতন্ত্র সুসংহত হবে না। পার্টিতে গণতন্ত্র থাকবে, পার্টির মধ্যে নিয়মিত নির্বাচন হবে, পেশীশক্তি ব্যবহার হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারলে অনেক কিছু করা সম্ভব। এগুলো না মানলে গণতন্ত্র সুসংহত হবে না। এটিও একটি কঠিন ব্যাপার। জোটের দলগুলো যদি ডেমোক্রেটিক রুলসের ব্যাপারে সিনসিয়ারিটি দেখাতে না পারেন তাহলে সমস্যা দেখা দেবে। ভোটে ফেল করলে আমরা নীরবে চলে যাব এবং যারা জিতবে তারা খুব সহজেই ক্ষমতা নেবে - জটিলতা সৃষ্টি বাদেই, এটি আমরা কেন করতে ব্যর্থ হবো? ভারতে আমরা এটি কমবেশি দেখছি। কিন্তু আমাদের ব্যর্থ হবার কোনো কারণ দেখি না।

আমি আবার বলব চারদলীয় জোটের একত্রে নির্বাচন করার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ভেরি ফ্রাঙ্কলি, অনেকে মনে করেন এর সাথে গণতন্ত্র সংহত হবার সম্পর্ক আছে। তবে এটি জাতীয়তাবাদের সংহতির জন্য ভালো। বর্তমান প্রেক্ষিতে ইসলামের জন্য এটি সাহায্যকারী। কোনো জোটের সঙ্গেই গণতন্ত্রের ডাইরেক্ট কোনো সম্পর্ক নেই। এর সাথে কে ক্ষমতায় যেতে পারবে কেবল তারই সম্পর্ক আছে।

প্রশ্ন : আপনি প্রসঙ্গত তাবলীগ জামাতের কথা বলেছেন। অনেকেই ধারণা করে তাদের কাজের প্রক্রিয়াটি ভালো। অথচ বাস্তবে জাতীয় ইস্যুগুলোতে তারা সক্রিয় নয়। তাহলে তাবলীগ জামাতের সংকট বা সমস্যা কোথায়?

উত্তর : এটিও একটি সেনসেটিভ ইস্যু। এদেশে অনেক লোক তাবলীগ জামাতকে মনে প্রাণে ভালো জানে, যদিও তারা তাবলীগ জামাতে অংশ নেয় না। সে হিসেবে এখানে সত্য কথা বলাও একটি কঠিন ব্যাপার। তাবলীগ জামাতের উদ্দেশ্যকে আমি ভালো জানি। তাদের উদ্দেশ্যে কোনো ত্রুটি আছে বলে আমি জানি না। কারোর মনের খবরই আল্লাহ ছাড়া কেউ ভালো জানেন না। তবে তাদের আমল তাদের উদ্দেশ্যকে খারাপ বলে না।

দ্বিতীয়ত তাদের কাজের ধরণ একটি পদ্ধতি মাত্র। সকল পদ্ধতিই বৈধ যাতে শরীয়ত বিরোধী কিছু নেই। তারা যে পদ্ধতি অনুসরণ করে সেটিও বৈধ। তবে তারা যদি দাবি করে বসে তাদের পদ্ধতিই একমাত্র বৈধ পদ্ধতি - এ দাবি সঙ্গত হবে না।

www.pathagar.com

তৃতীয়ত কথা হলো তাদের পদ্ধতি কতটুকু যুগোপযোগী? আমাদের কাজের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে পরিবর্তন করা। কিন্তু তারা যে পদ্ধতিতে কাজ করছেন তাতে আজকের যুগে সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এটি নিয়ে অনেক সময় ধরে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু আমি বলব সমাজ পরিবর্তনের জন্য এ পদ্ধতি উপযুক্ত নয়। আমরা দেখি, ফ্রান্স, রাশিয়ার বিপ্লব কিংবা ইউরোপ, আমেরিকার সমাজ পরিবর্তন কিন্তু এ ধরনের পদ্ধতি দ্বারা হয়নি। ইরানের পরিবর্তন এভাবে হয়নি। সুতরাং এ পদ্ধতি দ্বারা আমার মতে খুব বড় কিছু হবে না। এর মধ্য দিয়ে কিছু লোক নামাজ শিখতে ও কিছু লোক রোযা রাখতে পারে। অনেকের ধারণা তাদের দ্বারা কিছু লোক কুরআন শিখে ফেলবে। কিন্তু কুরআন শেখার একটি ট্রাডিশনাল পদ্ধতি আমাদের সমাজে আগে থেকেই ছিল। ছিল বলেই আগেও প্রতিটি ছেলেমেয়ে কমবেশি কুরআন পড়া শিখতে পারত। কাজেই এটি এমন নয় যে তাবলীগ জামাত আসার পরেই এগুলো হয়েছে।

সে সাথে তাদের ত্রুটিগুলোর মধ্যে দেখি তারা অন্যের ভালো কাজ পছন্দ করতে পারে না। এটি আরেক সমস্যা। আমরা তাদের ভালোটার প্রশংসা করি, ফাইন। কিন্তু তারা অন্যদের ভালো জিনিসের প্রশংসা করতে পারছে না। অন্যরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছেন, কাজ করছেন, নির্বাচন করছেন, তার মাধ্যমে আইনও পরিবর্তন করতে চেষ্টা করছেন, শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করছেন, ব্যাংক করছেন, বীমা করছেন, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি করছেন। তারা জনগণের কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করছেন, পত্রিকা বের করছেন, টিভি চ্যানেল করে অশ্লীলতাকে রুখবার চেষ্টা করছেন। তাবলীগ জামাতে এগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই।

আমি বলব তাবলীগ জামাতের কাজ এ পর্যায়েই থাকবে এবং আমি এর কোনো ব্যাপক বিস্তারও আশা করি না। তাবলীগ জামাতের যতটুকু রাইজ করার করে গেছে। বছরে তারা একবার একটি মাঠে একত্রিত হয়। আবার ছড়িয়ে পড়ে। আবার একত্রিত হয়। সার্বিক বিবেচনায় এদের আর কোনো উত্থান হবে না। এ পর্যন্ত তারা সমাজের কোনো দিক থেকেই তেমন কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। যেমন শিক্ষার দিক থেকে, কালচারের দিক থেকে এরা কোনো অবদান রাখেনি। তারা পার্লামেন্টে কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি। মিডিয়াতেও নয়। এমনকি সমাজ সেবাতেও নয়। তারা বলতে পারবে না আমরা ৫০টি এনজিও করেছি এবং তার মাধ্যমে সমাজ সেবা করছি। তারা অনেক মাদ্রাসা, স্কুল, ইউনিভার্সিটি, ব্যাংক, পত্রিকা প্রতিষ্ঠার কথা বলতে পারবে না। সুতরাং এটি তাবলীগ জামাতের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। তারা সিনসিয়ার লোক, ভালো লোক কিন্তু তারা ব্যর্থ।

প্রশ্ন : তাদের পড়াশুনার সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্য করা যায়।

উত্তর : আমি সত্যিকারভাবে জানি না তাদের পলিসি কী? এটি আরোপিত কথা কিনা তাও জানি না। হতে পারে তারা ফাজায়েলের দু'তিনটি বই ছাড়া অন্য কিছু পড়ে না। আমি তাদের এমন কোনো নীতি নির্ধারণী বক্তব্য বা স্টেটম্যান্ট পাইনি যাতে তারা কুরআন পড়তে নিরুৎসাহিত করে। তবে তারা এগুলোতে উৎসাহিত করে না এ রকম একটি ধারণা জনগণের মধ্যে আছে। কারণ তাদেরকে পড়তে কম দেখা যায়। যদি সত্যিই তারা ঐ ধরনের কয়েকটি বই ছাড়া এ বিষয়ে নিরুৎসাহিত করে থাকেন তাহলে আমি মনে করি সেটি তাদের নিজেদের জন্য যেমন বড় ক্ষতি, জাতিরও ক্ষতি। তাদের উচিত তাদের কর্মীদেরকে জানার জন্য উৎসাহিত করা। বিশেষ করে কুরআন মজিদ পুরোপুরি অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ জানা উচিত। সে সাথে ইসলামের যেসব আলেম সম্পর্কে তাদের কোনো সন্দেহ নেই সেসব

www.pathagar.com

আলেমদের লেখা বই তাদের পড়া দরকার। তারা যদি মনে করেন শামসুল হক সাহেব, নূর মোহাম্মদ আজমী সাহেবের বই পড়া যায় তাহলে তাদের সেগুলো পড়া উচিত। তবে সব ধরনের বই পড়তে হবে। ইসলামের শুরুর যুগে ইমাম গাজ্জালী তো মুশরিক ও নাস্তিকদের বই পড়েছেন। তারা তো ওই সব বই পড়েই মুশরিক বা নাস্তিকদের উত্তর দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আসলে তাদের ইসলামের মৌলিক বইগুলো পড়া প্রয়োজন।

উত্তর : অবশ্যই। রাসূলের যে জীবনী তা তাদের পড়া উচিত। তাই বলা যায় তাদের বিরুদ্ধে পড়াশুনা না করার অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে তা মোটেই ভালো নয়।

প্রশ্ন : তাবলীগ জামাতকে কি ইসলামী আন্দোলনের জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখা উচিত নয়?

উত্তর : তাদের সিস্টেম এমনই যে তারা তা বদলাতে পারছেন না। এটি অনেকেরই দোষ যে একটি সিস্টেমে অভ্যস্ত হয়ে গেলে প্রয়োজনেও তা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারেন না। সে দলই ভালো যে নিজেকে রিভিউ করতে পারে এবং প্রয়োজনে চেষ্টা করতে পারে। দোষ অন্যদেরও আছে। অনেকেই তাদের কাঠামোর বাইরে যেতে চেষ্ঠা করেন না। এটি মোটেই ঠিক নয়।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আসেনি। এটি কেন আসেনি এবং কিভাবে তাদের আরো সক্রিয় করা যায়?

উত্তর : সেটি তো আমারও প্রশ্ন। আর এটিই বর্তমান বাস্তবতা। আমাদের দেশে মহিলাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক গুরুত্ব ২০/২৫ বছর আগেও এতটা ছিল না। যেমন ভোটের ব্যাপারে সেই ১৯৩৫ সাল থেকেই পুরুষকে সার্বিকভাবে পরিবারের নারীর ভোটের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা গেছে। আমাদের দেশে নারীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে রাজনৈতিকভাবে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার আগমনের সময় থেকে। তার আগে গুরুত্ব ছিল, তবে তা কম। এটি একটি প্রেক্ষিত। আবার, হয়তো বা ইসলামী আন্দোলন যতটা পুরুষকে দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে ততটা নারীকে দেয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেনি। তারা মনে করেছে পুরুষকে দাওয়াত দিলেই নারী তার কাছ থেকে দাওয়াত পেয়ে যাবে। এটি একটি ধারণা। কিন্তু সরাসরি দাওয়াত আর ইনডাইরেক্ট দাওয়াত কখনোই এক নয়।

১৯৮০ সালে নারী বর্ষ ঘোষণা করা হলো। ১৯৯০ সালে বেইজিং-এ নারী সম্মেলন হলো। সেখানে নারী ইস্যু আবার আলোচিত হলো। পরিবেশের মতো জেন্ডার ইস্যু বিশ্বব্যাপী একটি এজেন্ডাতে পরিণত হলো। ফলে ইসলামী মুভমেন্টও বাধ্য হলো একে গুরুত্বের সাথে নিতে। এটি যে তাদের পজেটিভ আন্দোলন ছিল তা নয়। এটি একটি রিএকটিভ অবস্থান ছিল অর্থাৎ একটি ঘটনা ঘটছে, 'আই মাস্ট রেসপন্স নাউ' - সে হিসেবে নারীদেরকে এপ্রোচ করা শুরু হলো। সেটি দেরি হলো এবং একটি বাধ্যগত অবস্থার মধ্যে দিয়ে হলো। এ গুরুত্ব আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমরা যদি নারী জাগরণ থেকে দূরে থাকি তাহলে বিশ্বব্যাপী আমরা একপেশে হয়ে যাব। এ কারণে আমরা নারী ইস্যু গ্রহণ করলাম। কিন্তু এটিকে এভাবে হিসেব করা ঠিক হয়নি। তারা মানুষ, তারা মানবতার অর্ধেক। তাদের ইস্যু মানুষের ইস্যু, আমাদের ইস্যু। এ হিসেবে নারীর ইস্যু মেরিটের উপর গ্রহণ করা উচিত ছিল। ভালো-মন্দ, দুঃখ-আনন্দ সব বিষয়েই নারী-পুরুষ উভয়েই জড়িত। ইসলামের নারী-পুরুষ সমতার বিষয়টি থিওরিটিক্যালি যতটা বলা হয়েছে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা সে সমতা দেখাতে পারিনি। তারপরও নারীরাও এগিয়ে আসছে। ইসলামিক মুভমেন্টে আরকান বা রুকনদের

www.pathagar.com

মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ এখন নারী। তাদেরকে শূরাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আস্তে আস্তে সবখানে তারা পলিসি লেভেলে চলে আসছে। বর্তমানে ছাত্রীদের মধ্যে কাজ হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে নারীদের মধ্যে ভালো কাজ হচ্ছে।

প্রশ্ন : বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারযাভী বলেছেন নারী আন্দোলন এখনও পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নারী যদি পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন এবং তারা যদি নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তাহলে এর গতি আরো বাড়বে এবং এজন্য দরকার জয়নব আল গাজ্জালীর (মিশরের প্রখ্যাত ইসলামী নারী নেত্রী) মতো নেতৃত্ব। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর : জনাব কারযাভীর কথার সাথে আমি একমত। আজকে বাংলাদেশে মেয়েদের মধ্যে বিভিন্নভাবে কাজ হচ্ছে। কিছু স্মল ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ আছে যারা হাইলি ইন্টেলেকচুয়াল। তারা দেশ-বিদেশে পড়াশোনা করছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করছেন। এর থেকে অনেকেই এগিয়ে আসবে। এরা আমার জানা মতে দেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রধান দলটির সমর্থক। সব মিলিয়ে একটি আধুনিক এবং একই সঙ্গে সম্পূর্ণ ইসলামিক একটি নেতৃত্ব সামনে আসবে।

নারীদের কাজ নারীদের দ্বারা স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। পুরুষের চেয়ে নিঃসন্দেহে নারী ইস্যু নারীরাই বেশি ভালো বুঝবেন। সেখানে নারী ইস্যুতে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ থাকা ঠিক নয়। গাইডেন্স নিতে পারে মাত্র। গাইডেন্স তো আমরাও নারীদের কাছ থেকে নিতে পারি। রাসূল (সা) হুদায়বিয়ার যুদ্ধের সময় যখন কোনো দিক পাচ্ছিলেন না তখন হযরত উম্মে সালমার সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তার পরামর্শ মতোই তিনি কাজ করেছিলেন। তাহলে এটি তো শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বৈধ। সূরা শূরাতে বলা হয়েছে 'তোমরা পরামর্শ মতো কাজ কর'। তার মানে পুরুষ-নারীও প্রয়োজন অনুসারে পরামর্শ করবে। রাসূলুল্লাহর (সা) জীবনের খুবই ক্রিটিক্যাল মুহূর্তে হযরত উম্মে সালমার (রা) পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন, যখন সাহাবীরা রাসূলকে (সা) অপমানজনক চুক্তি সই করার জন্য অভিযোগ করেন এবং কোরবানী করতে রাজি হচ্ছিলেন না।

মুসলমানরা বিভিন্ন সময় মুসলিম নারীকে নেতা হিসেবে মেনেছে। যখন হযরত উসমান (রা)-এর রক্তের বদলার কথা উঠল তখন বিরাট একটি অংশ হযরত আয়েশার পক্ষ নিয়েছিল। আর আমি এর কোনো যুক্তি বুঝি না যে, কেন জাতি প্রয়োজনে নারীর দিকে টার্ন করবে না।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে অসংখ্য নারী সংগঠন আছে। অনেকেই নারী অধিকারের নামে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। নারীর অধিকারকে সামগ্রিকভাবে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন?

উত্তর : আমি সহানুভূতির সাথেই দেখি। দুটি কারণে, একটি হচ্ছে- নারীদের লিবারেট করার দরকার ছিল, কিন্তু ইসলামী মহল এ ব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছিল না। নারী শিক্ষার জন্য লড়াই প্রথম দিকে ইসলামিস্টরা করেনি। সে লড়াই তাদেরই করতে হয়েছে যারা ততটা ইসলামিস্ট বলে পরিচিত নন। স্যার সৈয়দ আহমদ আলীগড় প্রতিষ্ঠা করলেন। তাকে দারুণ বিরোধিতায় পড়তে হয়েছিল। বেগম রোকেয়া কত বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন শুধুমাত্র মেয়েদের সামান্য একটুখানি লেখাপড়া করানোর চেষ্টা করতে গিয়ে। সত্যি কথা হচ্ছে আমাদের দেশের কনজারভেটিভ একটি অংশ কোনো ক্ষেত্রেই মেয়েদের এগিয়ে নেবার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি। মেয়েরা শত শত বছর ধরে সম্পত্তির অধিকার পাচ্ছিল না। আমার জানা মতে এজন্য কোনো সামাজিক আন্দোলন বেশিরভাগ আলিম করেননি।

www.pathagar.com

সুতরাং এ প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী নারীর মুক্তির যে আন্দোলন হয়েছে সেটি পজেটিভ। তবে যাদের হাতে হয়েছে তারা যেহেতু ইসলামকে অত ভালো জানত না, সেজন্য এটি বিভিন্ন সময় রং ডাইমেনশনে গিয়েছে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। আমাদের নেতৃত্ব না দেয়াতে অন্যরা এটিকে মিস গাইড করেছে। তবু আমি মনে করি, সার্বিকভাবে নারী মুক্তি আন্দোলন আশাব্যঞ্জক। আমরাও তো আজ নারী অধিকার আন্দোলনের সাথে জড়িত। এখন আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এ মুক্ত নারীকে বা আধামুক্ত নারীকে পূর্ণ মুক্ত করা এবং সে সাথে ইসলামাইজ করা।

প্রশ্ন : ছাত্রজীবনে অনেক মেয়েই আন্দোলনে নেতৃত্বের পর্যায়ে থাকার পরও বৈবাহিক অবস্থার শুরুর সাথে সাথে তাদের আর সে অবস্থায় দেখা যায় না। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

উত্তর : এটিকে আমি শুধু দুঃখজনক বলব। আমি বলব, আল্লাহতায়ালা যাকে যে মেধা ও যোগ্যতা দিয়েছেন তাকে তা ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া দরকার। স্বামীরা যদি এটিতে বাধা দেয় তাহলে তারা মুনকার কাজ করল। আল্লাহ্ বলেছেন, 'ইন্নামাত তায়াতু ফি মারুফ'- আনুগত্য শুধু ভালো কাজের। সঠিক মেধাকে সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে স্বামীরা বাধা দেবে তা হতে পারে না। আল্লাহর রাসূল নারীদের যে আনুগত্যের শপথ করিয়েছিলেন তার একটি অংশ ছিল, সূরা মুমতাহিনাতে বলা হয়েছে "লা ইয়াছিনাকা ফি মারুফীন" - তারা তোমাকে অমান্য করবে না মারুফ কাজে। তার মানে শুধু মারুফ কাজে অমান্য করা যায় না। মুনকারে অমান্য করা যায়। সেখানে আমার মেধাকে বিকাশ করতে দেবে না, আমাকে লিখতে দেবে না, আমাকে প্রকাশ করতে দেবে না- এটি কখনো কি মারুফ হতে পারে? এটি তো মুনকার। একটি নারীর লেখার ক্ষমতা আছে তাকে লিখতে দেবে না, বক্তৃতার ক্ষমতা আছে বক্তৃতা দিতে দেবে না, সাংগঠনিক যোগ্যতা আছে, সমাজসেবার যোগ্যতা আছে তাকে তা করতে দেবে না, আমি এগুলোকে বলব মুনকার। নারীরা তা মানতে বাধ্য নয় বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন : সে ক্ষেত্রে তো সামাজিক বিপর্যয়ও দেখা দিতে পারে?

উত্তর : প্রাথমিকভাবে সকল বড় বিপ্লবের শুরুতে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এটিকে Teething trouble বলে। এগুলো হবে, কিছু লোক ভয় পেয়ে যাবে। কিন্তু পিছানো ঠিক হবে না। সমস্যা না হলে ভালো। কিন্তু সেটি হলেও আমাদের মানতে হবে যে বড় অর্জনের জন্য ছোট অসুবিধাকে মেনে নিতে হবে।

প্রশ্ন : ইসলামিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন দল গঠনের অবকাশ আছে কিনা?

উত্তর : ইসলামের শুরুতে কতগুলো গ্রুপের আবির্ভাব ঘটে। তাকে আধুনিক পরিভাষায় দল বলা যায়। প্রথম দিকে সবাই একই ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আলী (রা) সমর্থকদের একটি গ্রুপ হয়। এরপর এক পর্যায় খারিজীদের উদ্ভব হয়। তাদের কেউ ব্যান্ড করার কথা বলেনি। খারেজীরা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরমপন্থী ছিল। তারা ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করত। তবে তাদের মূলত একটি পার্টি হিসেবে আবির্ভাব হয়। তাদের সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বলেছেন, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ভায়োলেন্স না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের উপর কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করবো না। এরপর বনি উমাইয়ার শাসন কায়েম হলো। তখন আব্বাসী আন্দোলনের মাধ্যমে আব্বাসীরা একদিকে তার বিরুদ্ধে রিভল্ট করল। তারা একটি দল আকারে আবির্ভূত হয়ে বলল খিলাফত আমাদের। আমরা খিলাফত পাওয়ার অধিকারী। বর্তমান প্রশ্নের এটি একটি দিক।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, ইসলাম ঠিকই ঐক্যের কথা বলেছে। কিন্তু ঐক্য মানে এ নয় যে সকল মুসলমানকে একটি পরিবার হয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন পরিবার হতে পারবে না। এর মানে এও নয় যে বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারবে না। আমরা বাস্তবে বিভিন্ন ইসলামিক রাষ্ট্রকে হিকমাহ বা পারস্পরিক ঐকমত্য বা সম্মতির ভিত্তিতে মেনে নিয়েছি। এমনকি আমরা জানি ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্র ছিল। একদিকে ছিল আব্বাসীয় খিলাফত। অন্যদিকে উমাইয়ার কিছু লোক পালিয়ে গিয়ে স্পেনে খিলাফত কায়েম করল। কায়রোতে ফাতেমী খিলাফত ছিল। এ চিত্র বাস্তবে ছিল। আজকে আমাদের একটি ওআইসি আছে। বিশ্বের সকল মুসলিম দেশ এর সদস্য। তারাও রাষ্ট্রের ধারণাকে মেনে নিয়েছে। এটি হলো এই প্রশ্নের উত্তরের দ্বিতীয় কথা। অর্থাৎ ঐক্য মানে এ নয় যে, সব এক পরিবার হয়ে যেতে হবে, এক রাষ্ট্র হয়ে যেতে হবে।

তেমনি আমরা বলতে পারি না যে, যে সমস্ত মাজহাব রয়েছে তাদের সবগুলোকে এক হয়ে যেতে হবে বা আইনের ক্ষেত্রে একটি মতের অনুসারী হতে হবে। আমরা দেখেছি যে, আইনের ক্ষেত্রে অনেক মত থাকলেও এর মধ্যে ৪টি মত হলো প্রধান। এর বাইরেও মাজহাব আছে, এগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং টিকে গেছে। এখানেও আমরা দেখি ঐক্যের মানে এ নয় যে একটি মাজহাবই হতে হবে। আরো বলা যায়, ঐক্য মানে এ নয় যে, কখনো দুই, তিন বা চার দল হবে না। আমরা দেখি পাকিস্তান বা ইরানের সংবিধান আলিমদের দ্বারা অনুমোদিত। আবার বিভিন্ন মুসলিম দেশের জনগণের প্রত্যেকের মত প্রকাশের অধিকার আছে। প্রত্যেকের দল গঠনের অধিকার আছে। আজকে এটি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হতে পারে। তার বড় প্রমাণ পাকিস্তানের এমএমএ। তারা বলেনি যে আমাদের এক হয়ে যেতে হবে। কিন্তু সেখানে আজ বিভিন্ন দল একত্রে মিলিত হয়ে ইসলামের জন্য কাজ করছে। কাজেই বলা যায়, ইসলামে যে একটিই দল হতে হবে সে ধারণাটি কল্পিত ও আরোপিত। ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে পণ্য এবং পদ্ধতির ব্যাপারে যা কিছু হারাম নয় তাই হালাল। সুতরাং এ পদ্ধতি আল্লাহতায়ালা হারাম করেননি। আল্লাহতায়ালা কখনো বলেননি, তোমাদের একটিই দল করতে হবে। তবে উম্মাহ এক। উম্মাহর মধ্যে অসংখ্য সংগঠন আছে, মতামত আছে।

সার্বিক বিবেচনায় অসংখ্য দল হওয়ার মধ্যে আমি কোনো নীতিগত বাধা বা আপত্তি তাত্ত্বিকভাবে, ঐতিহাসিকভাবে এবং বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি না। ঐক্যের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। সেখানে কুরআন ও হাদিসের কথা বলা হয়েছে। এটিই ঐক্য। ইসলাম অবশ্যই ঐক্য চায়। আর ঐক্য মানে এ নয় যে সবাইকে এক দল হয়ে যেতে হবে, এক মত হয়ে যেতে হবে। আগেও বলেছি এ ঐক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন মাজহাব হয়েছে এবং একে অপরকে মেনেও নিয়েছে। তারা গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ফলে (result) পৌঁছানোকে প্রাণের লক্ষণ বলে মনে করছেন। এটি জীবনের লক্ষণ। এটি আমাদের সুষ্ঠু চেতনার লক্ষণ। এটি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের লক্ষণ।

প্রশ্ন : অর্থাৎ ইসলাম বহু দলে বিশ্বাস করে?

উত্তর : অবশ্যই। এর পক্ষে আমি আরো বলতে পারি। ইসলামের বর্তমানে যে শ্রেষ্ঠ দলগুলো আছে তারা প্রত্যেকেই বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। জামায়াতে ইসলামী কখনোই তার মেনিফেস্টোতে বলেনি এক দল হতে হবে। তাদের গঠনতন্ত্রের কোথাও দেখি না যে তারা একদল করতে চায়। তেমনি অন্যান্য ইসলামী দলগুলোও এক দল করার কথা

www.pathagar.com

বলেনি। এটি অন্যান্য দেশের ইসলামী দলগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানবাধিকারের ব্যাপারে যত বই আছে এবং যারাই মানবাধিকারের উপর বই লিখেছেন তারাই বলছেন ইসলামে দল গঠনের অধিকার আছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা আছে। মত প্রকাশের কথাই তো দল। রশীদ ঘানুষী একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, যাকে এ যুগের ইকবাল বলা হয়, তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্রকে অবশ্যই মেনে নেয়ার কথা বলেছেন। হতে পারে আনাচে-কানাচে থেকে কিছু লোক অনেক রকম কথা বলে। কিন্তু যারা চিন্তাবিদ নয় তাদের কথা বাস্তবে গুরুত্ব পাওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন : ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী আদর্শ বিরোধী দল গঠন করা কি সম্ভব?

উত্তর : বিষয়টির গভীরে যেয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে। আমরা যদি বলি পারবে না তাহলে অমুসলিমরা অন্য কোনো অমুসলিম দেশে ইসলামী দল গঠন করতে দেবে না। আবার ইসলামের কোথাও সুস্পষ্ট করে বলা নেই যে অমুসলিমরা দল গঠন করতে পারবে না। যে ইসলাম একটি রাষ্ট্রে তাদের রাজনীতি, সমাজ, আইন, শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ সব ব্যাপারে ইহুদীদের স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিল সেটি দল গঠন থেকে অনেক বড়। সেখানে আধুনিক ব্যবস্থায় আমি কোনো আপত্তিই দেখি না।

ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানে বলা থাকবে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন করা যাবে না। সেখানে অমুসলিমরা যদি মাইনরিটি হয় তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তারা তাদের অধিকার চাইবে। তাদের উপর কোনো অন্যায় করা হলে তারা তার বিচার চাইবে। তারাও একটি এলাকায় বাস করে বলে সে এলাকার উন্নয়ন দাবি করবে। তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতির দাবি করবে। তারা ফরেন পলিসি নিয়ে কথা বলবে। এগুলো বলার অধিকার তাদের আছে। এ রাষ্ট্র তাদেরও। অমুসলিম মানেই ইসলাম বিরোধী এবং ইসলাম বিরোধী কাজ করা তাদের দায়িত্ব এটি ধরে নিলেও তারা সম্পূর্ণভাবে একটি শাসনতন্ত্রকে মেনেই কাজ করবে।

কাজেই আমরা যদি আমাদের মনকে বড় করতে পারি, আমরা যদি ইসলামের মৌলিক বিষয় বুঝতে পারি এবং খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর জোর না দেই তাহলে আধুনিককালে অমুসলিমদের ইসলামী রাষ্ট্রে দল গঠনে আমি কোনো আপত্তি দেখি না। এটিকে সমস্যাও বলে মনে করি না। আর যারা এর বিপরীত কথা বলেন তাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে অমুসলিম রাষ্ট্রও মুসলিমদেরকে সে অধিকার নাও দিতে পারে। আপনি যা করবেন, আপনার উপরও তা আসবে।

প্রশ্ন : ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : আমি অনেকবার বলেছি ইহুদীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দিয়েছিলেন। এটি অল মোস্ট রাষ্ট্রের ভেতর রাষ্ট্র - এতটাই স্বাধীন। এটিও হতে পারে অথবা আধুনিক পদ্ধতিতে হতে পারে। যে কোনো বিকল্পই গ্রহণযোগ্য। আধুনিক পদ্ধতির মত হচ্ছে একটি সংবিধান হবে। তাতে বলে দেয়া হবে কার কি অধিকার। এদিকে ওআইসি তার মানবাধিকার ঘোষণায় সকল নাগরিকের অধিকারের কথা বলে দিয়েছে। সেটি সকলেই ভোগ করবে। এখন প্রশ্ন হলো তারা পলিটিক্যাল কোন কোন পোস্টে যেতে পারবে? এটি খুবই ছোট বিতর্ক। ইন্দোনেশিয়ার সংবিধানে দেখি একজন অমুসলিমও সে দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। পাকিস্তানের ইসলামিক সংবিধান হওয়ার পরও আমরা দেখেছি পাকিস্তানের স্পীকার ছিলেন নন মুসলিম। প্রেসিডেন্ট দেশের বাইরে গেলে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্পীকারই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আজকের রাষ্ট্র প্রধান খলিফার পদের সমতুল্য কিনা?

www.pathagar.com

আমি মনে করি, তা নয়। কেননা খলিফা অনেক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি বিচার ক্ষমতা, মিলিটারি ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করতেন। সেখানে আজকের যুগের ব্যবস্থা অনেক ভিন্ন। এটি সে যুগের খলিফার সমতুল্য নয়।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার কাজ করতে হবে সংবিধানের মধ্যেই। কেউ অসাংবিধানিক কাজ করলে তার অধীনের লোকজনই তো তাকে মানবে না। রাষ্ট্র যেহেতু সংবিধানের উপরই ভিত্তি করে থাকে, পার্লামেন্টে যে আইন পাস হবে তা মুসলিম-অমুসলিম যেই প্রেসিডেন্ট হোন না কেন তাকেই তাতে সই করতে হবে। আবার কেবিনেটের ভূমিকাও অনেক। আগে সংবিধান লিখিত ছিল না। সবকিছু অস্পষ্ট ছিল, স্বচ্ছ ছিল না। বর্তমানকালে সংবিধানে সবই বলা থাকে। কার কি কাজ তা সবাই জানে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যখন আমরা সংবিধান তৈরি করি তখন সবকিছুই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে যায়। এর মধ্যে থেকে কেউ সহজে অন্যায় করতে পারে না। সে যুগে খলিফাদের ক্ষমতা অনেকটা ব্যাপক ছিল। কিন্তু আজকের যুগে প্রসিডেন্টের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আইন ও সংবিধান দ্বারা লিখিত হওয়ার কারণে সীমাবদ্ধ। এ রকম চেকস এন্ড ব্যালান্সের মধ্যে আমি মনে করি একজন অমুসলিম প্রেসিডেন্ট হলে তিনি দেশের কিছুই ক্ষতি করতে পারবেন না। অবশ্য মুসলিম দেশে অমুসলিম প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

কাজেই আমি মনে করি যারা অতি থিওরিটিক্যাল তারা ইসলামের ক্ষতি করবে। তারা ইসলামের মূল স্পিরিটকে হারাবে। তারা ছোটখাট বিষয়কে ফাইন টুইনিং করতে গিয়ে আসল বিষয়কে হারিয়ে ফেলবে। এটি হিকমার খেলাপ। এটি পরিস্থিতির মূল্যায়নের ব্যর্থতা হবে। ইসলাম আমাদের সকল পরিবর্তিত পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে শিখিয়েছে।

শিক্ষা

প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কখনই পাবলিক ইউনিভার্সিটির বিকল্প হতে পারে না

প্রশ্ন : আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি ধারা আছে- আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা আর মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। আবার মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও দুটি ধারা - আলিয়া ও কওমী। এগুলোর মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করা যেতে পারে?

উত্তর : আমি নিজে আলেম এবং চিন্তাবিদদের সামনে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আমি মনে করি সেটি করতে পারলে অনেক কাজ হতো। একদিকে বলেছি সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে পর্যায়ক্রমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা, এটি ইসলামী নামকরণে নয়, টাইপে হবে। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে মালয়েশিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। অর্থাৎ এখানে সকল বিষয়ই পড়ানো হবে। সে সাথে ইসলাম বিষয়ক বিষয়ও থাকবে। আমি এ প্লানকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। এটি অনেক সুপরিকল্পিত। জাতি সিদ্ধান্ত নিলে এটি বাস্তবায়ন সম্ভব। এখানে সোশিওলজি, হিস্ট্রি, ইকোনোমিকস, আরবী, ইসলামিক স্টাডিজ, পালি, সংস্কৃত সব সাবজেক্টই থাকবে। সায়েন্সও থাকবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিজ্ঞান ও সেসব প্রত্যেক সাবজেক্টের ভেতর দু-একটি ইসলামিক পেপার ঢুকে যাবে। কিছু বিষয় থাকবে যেগুলো সবাইকে পড়তে হবে। এর মধ্যে একটি লিমিটেড পর্যায়ে এরাবিক

www.pathagar.com

লেংগুয়েজ পড়নো হবে। অর্থাৎ মূল কথা হচ্ছে ফাউন্ডেশন লেভেল পর্যন্ত কিছু ইসলামের বিষয় থাকবে আর সাবজেক্টের মধ্যে কিছু। যেখানে সম্ভব নয় যেমন ফিজিক্সে, ইসলামিক ফিজিক্স বলে কিছু থাকবে না। কেমিস্ট্রিতে ইসলামিক কেমিস্ট্রি থাকবে না। ইকোনোমিকসে ইসলামিক ব্যাংকিং একটি পেপার থাকবে, ইসলামিক ফাইন্যান্স একটি পেপার থাকবে। পলিটিক্যাল সায়েন্সে মুসলিম কন্ট্রিবিউশনের উপর একটি পেপার থাকবে। ইসলামিক পলিটিক্যাল থট থাকবে। এভাবেই ৪০/৫০টি কোর্সের মধ্য ইসলামিক কোর্সগুলো থাকবে। এ আদলে যদি আমরা জেনারেল ইউনিভার্সিটি গড়ে তুলি তাতে কোনো সমস্যা নেই। কেবলমাত্র অমুসলিমদের ব্যাপারে সমস্যা থাকতে পারে। এজন্য অমুসলিমদের ক্ষেত্রে যথার্থ অপশন দিতে হবে যাতে করে তাদের মনে কোনো কষ্ট না থাকে। আর পড়লে তারা জেনেই পড়বে, আমরা যেমন পড়ি। আমাদের আমেরিকা গেলে তাদের হিস্ট্রি পড়তে হয়। ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ পড়তে হয়। জার্মানীতে গেলে জার্মান ল্যাংগুয়েজ পড়তে হয়। এটি করতে পারলে ইসলাম, মুসলমান সম্পর্কে তাদের মনের সন্দেহ দূর হবে। এটুকু সামান্য সমন্বয় করতে হবে, যে সমন্বয় ইতিমধ্যেই ইসলামিক ইউনিভার্সিটি করেছে।

অন্যদিকে কওমী ও আলিয়া মাদরাসা স্ট্রীমের পরিবর্তনের কথাও আমি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে বলেছি। আমি বলেছি মাদরাসায় কামেলে চারটি ডিগ্রি বর্তমানে দেয়া হয়। এর সাথে আরো তিন-চারটি ডিগ্রি দেয়া হোক। ইন্টারমিডিয়েট লেভেল আলেম পর্যন্ত ১২ বছরে কোর্স একই থাকবে । ফাজিলে, কামেলে গিয়ে সম্পূর্ণ সাবজেক্ট ওয়াইজ হবে। অর্থনীতি, পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন কিংবা বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশনের মতো বিষয়ে কামেল হবে। আর একদিকে কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, আদব বিষয়ে সম্পূর্ণ আলাদা কামেল তো পূর্বের মতো থাকছেই। এ রকম যদি আমরা করতে পারি তাহলে কামেল মাদরাসা সম্পূর্ণ আধুনিক লাইনে চলে আসবে। একদিকে আলেমও তৈরি হবে অন্যদিকে ইসলামের শক্ত ব্যাকগ্রাউন্ডসহ শিক্ষিত আধুনিক মানুষ তৈরি হবে। এরা অর্থনীতি এবং প্রশাসনের জন্য খুবই কার্যকর হবে। কওমী মাদরাসা ক্ষেত্রেও প্রথম ১২ বছর ঠিক রেখে ওইভাবে সমন্বয় করতে হবে। তারা এখন দাওরায় হাদিস দিচ্ছে। তার সাথে দাওরায় অর্থনীতি দিতে হবে। বেশি না করে আপাতত দুটোই করুক। না হলে দাওরায় পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন চালু করুক। এ রকম করতে পারলে সেখানে আধুনিক শিক্ষার একটি পর্যায় আসবে। তারপর একটি পর্যায়ে পূর্ণ সমন্বয়ের জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে।

এ পরিকল্পনাটিই আমি আলেমদের সামনে পেশ করেছি এবং যতটুকু জানতে পেরেছি তারা এটি পছন্দ করেছেন। এটি জেনারেল লাইনের শিক্ষিতরাও বুঝতে পারলে আরো ব্যাপকভাবে আমরা লাভবান হবো। এতে বহুমুখী উদ্দেশ্যপূরণ সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ সমন্বয়ের দিকে এগুতে পারি। সব ভেঙে চুরে একটি করতে চেষ্টা করার চেয়ে এটি ভালো। একটি পর্যায়ে পৌছাতে পারলে তখন লোকেরা হয়তো বা কিছু দাবী করতে পারেন। তখন ডিমান্ড অনুযায়ী কাজ হবে। আমাদের এখন ভাববার দরকার নেই যে ৩০/৩৫ বছর পর কি হবে?

প্রশ্ন : আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা কি যুগের চাহিদা পূরণ করতে পারছে?

উত্তর : আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন দরকার, এটি অস্বীকার করা যাবে না। যে সমস্ত শিক্ষা কমিশন হয় এবং তারা রিপোর্ট ও সুপারিশে যা বলে ঠিকই বলে। শুধু আইডিওলজিক্যাল প্রশ্নে তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়। কুরআন হাদিস বা ইসলাম পড়ানো

www.pathagar.com

হবে কি হবে না এরকম। বিষয়টি আমি বেশি লম্বা না করে বলব, আমাদের সর্বশেষ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টগুলোতে যে বিষয় জোর দেয়া হয়েছে তা হলো- বিজ্ঞান শিক্ষা ও জেনারেল শিক্ষা। সেগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। আমি এর বেশি আর বলতে চাই না এজন্য যে, আমি সব বিষয়ে এক্সপার্ট নই এবং সব বিষয় এক্সপার্ট হওয়া আমি জরুরীও মনে করি না। এজন্য সুপারিশমালাগুলোর ভালো দিকগুলোকে যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে এ প্রশ্নের যে উদ্দেশ্য তা পূরণ হতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের সাথে জড়িত। আপনি কি মনে করেন আমাদের দেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের অপরাপর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উম্মাহর চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখতে পারছে?

উত্তর : বাংলাদেশের অনেক মাদরাসা নামের জামেয়া বাদ দিলে ইউনিভার্সিটির সংখ্যা প্রায় ৫০টি। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে যে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় তা মাত্র ৮ কি ১০টি। ফলে এর দ্বারা উম্মাহর যে চাহিদা তা তারা পূরণ করতে পারবে না। তবে এর একটি মডেল বিল্ড আপ হচ্ছে। ফলে মুসলিম বিশ্বের বিরাট উপকার হবে। যেমন আমি নিজের কথাই বলি, ইসলামী ইউনিভার্সিটি চিটাগং-এ আমরা বলতে গেলে তেমন কিছুই করতে পারিনি। কিন্তু যা কিছু হয়েছে তাই নিচ্ছে অন্যরা। মানারাত, তারা কোর্স নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে। নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি আমাদের কাছ থেকে কোর্স নিচ্ছে। এর থেকে এর ডিমান্ড বোঝা যায়। যদি আমরা মালয়েশিয়ার মতো একটি সাকসেসফুল মডেল দাঁড় করাতে পারি তাহলে এর খুবই চাহিদা আছে। তাদের মডেলকে শত শত ইউনিভার্সিটি স্টাডি করছে। তার থেকে কোয়ার্টার, হাফ বা ফুল নেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের এখানে যারা এটি নিয়েছেন তারা ড. আবদুলহামিদ এ. আবুসুলাইমান বা তাদের মতো জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমকক্ষ না হওয়ায় এটিকে সেভাবে আত্মস্থ করতে পারছেন না। সে ক্ষেত্রে একশ'র জায়গায় হয়তোবা ৬০ কি ৭০ করছেন। এদের থেকে আবার অন্যরা নিচ্ছেন। তবুও এর গুরুত্ব বিরাট।
কাজেই আমি এ প্রশ্নের উত্তরে বলব, এটি উম্মাহর চাহিদা পূরণ করতে পারছে। একটি মডেল তৈরি হচ্ছে। ইসলামের অগ্রযাত্রা যে গতিতে চলছে তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে এটি তাড়াতাড়িই অনেক বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এটি একটি আশার বিষয়।

প্রশ্ন : কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো শুধুমাত্র গুটিকয়েক বিশেষ বিষয়ের উপরই জোর দিয়ে থাকে?

উত্তর : বিষয়টি হলো একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে একশ' সাবজেক্ট খোলা সম্ভব নয়। এটি এখন পর্যন্ত নয় - যা একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলে সরকারী টাকায়। সেখানে ৪০/৫০ কোটি টাকা যাই লাগুক সবটাই সরকার দিয়ে থাকে। ছাত্রদের বেতনে এসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলে না। সেখানে ছাত্রদের বেতনেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চলতে হয়। ফলে স্বভাবতই তাদেরকে এমন সব সাবজেক্ট খুলতে হয় যেসব সাবজেক্ট পড়ার জন্য ছাত্ররা লাখ লাখ টাকা খরচ করতে রাজি। সেসব সাবজেক্ট পড়ার জন্য ছাত্রও পাওয়া যাচ্ছে। অথচ যদি আরবী খোলা হয় তাহলে ৫ লাখ টাকা খরচ করে আরবী পড়ার জন্য ছাত্র পাওয়া যাবে না। বাংলার জন্যেও পাওয়া যাবে না। সুতরাং তারা শুরুতেই এমন সব সাবজেক্ট খুলছে যেগুলো মার্কেটেবল। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কখনই পাবলিক ইউনিভার্সিটির বিকল্প হতে পারে না। তারপরও তারা যেসব বিষয় খুলছে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ শিক্ষা দেয়ারই চেষ্টা করছে। যেমন কম্পিউটার সায়েন্সে সরকারী ইউনিভার্সিটিতে যা পড়ানো হয় এখানেও তাই হচ্ছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : হুজুগপ্রিয় এ দেশে গার্মেন্টেস ও কোচিংয়ের মতো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার এক মহাউৎসব শুরু হয়েছে। দু-একটি বাদে বেশিরভাগ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিকে বড় ধরনের কোচিং সেন্টার বললেই যথার্থ বলা হয়। অনেকে এটিকে আলু-পটলের ব্যবসার মতোই একটি ব্যবসা হিসেবে নিয়েছেন।

উত্তর : ঠিকই আছে। যারা বলছেন তারা এ অর্থে বলছেন যে, এ ইউনিভার্সিটিগুলোর মান সঠিক কিনা? এ প্রশ্ন আমারও রয়েছে। সরকারের যারা লাইসেন্স বা অনুমতি দিচ্ছেন, মান ঠিক আছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব তাদেরই। এটি না দেখলে ভুল করবেন। এত অনুমতি দিচ্ছেন কেন যদি তারা মান দেখতে না পারেন? এটি যেমন ঠিক আবার বেশিরভাগ লোকের মত হচ্ছে এত সংখ্যক এক সাথে অনুমতি দেয়া ঠিক হয়নি। আস্তে আস্তে দিলে ভালো হতো।

এখানে কর্মাশিয়াল প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা এসেছে। তবে লাভের জন্যেই যে করছে তা বলব না। বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটিরই এখন ট্রাস্ট হয়েছে। এতে একটি পয়সাও ব্যক্তির পকেটে যায় না। এর হিসাবেও গণ্ডগোল করা সম্ভব নয়। বাস্তবে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের হিসাবে সহজেই সমস্যা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এখানে ডাইরেক্ট পেমেন্ট হয়। পে-অর্ডার, ড্রাফটের মাধ্যমে পেমেন্ট হয়। এগুলো গোপন করাও সম্ভব নয়। কিছু ইউনিভার্সিটির মান পুওর - এ কথা ঠিক। এজন্য আমি বলব তারাই দায়ী। আর সরকার যদি সুপারভাইজ না করে তাহলে মানুষ লাই পেয়ে যাবে, কেয়ারলেস হয়ে যাবে। তাই হয়েছে। কিন্তু ওভারঅল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি মুভমেন্ট দরকার ছিল। এর ফলে বিদেশে যাবার প্রবণতা কিছুটা হলেও বন্ধ হয়েছে। এসব ছেলেমেয়েদেরকে তো বিদেশে পাঠানো হতো। এখানে লেখাপড়া হয় না কিংবা অন্যান্য নানা অজুহাতে ইউরোপ-আমেরিকায় মানুষ তাদের ছেলেমেয়েকে পাঠাতো। এখন এখানে ৫ লাখ টাকা লাগলেও বাবা মা খরচ করছেন। আগে ছেলেদের বিদেশে যাবার অনুরাগ ছিল। আসল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশে যাওয়া, উছিলা ছিল পড়াশোনার, এখন সেটি কমছে। বর্তমানে ১১ সেপ্টেম্বরের পর আমেরিকা যাবার হিড়িক কমে গেছে। তারাও নিতে চাচ্ছে না। এটি আমাদের জন্যেই ভালো হয়েছে।

প্রশ্ন : কিন্তু তারপরও কোথায় যেন একটি ঘাটতি আছে। প্রতিযোগিতামূলক চাকরির ক্ষেত্রে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ধারেকাছেও আসতে পারছে না অন্যান্য পাবলিক ইউনিভার্সিটি। আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির তো কোনো খবরই নেই। এ পার্থক্যটি কেন?

উত্তর : চল্লিশ বছর আগেও, আমরা যে বছর সিভিল সার্ভিসে যাই প্রায় শতকরা ৯০ জনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই সে সময় সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। তাও আজকের মতো এত সাবজেক্ট ছিল না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন হাতে গোনা কয়েকটি সাবজেক্ট ছিল। দেশের সব ভালো ছাত্রই প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করে। না পেলে অন্যস্থানে যায়। কাজেই ভালো ছাত্রের সংখ্যা বেশি হওয়ায় যে কোনো প্রতিযোগিতায় এরাই টিকে থাকে। আসলে তারা গোটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মানে ঢাকা শহর নয়, ৬৪টি জেলার ছেলেমেয়ে, যারা কম্পিটিশনে টিকে এখানে এসেছে। বেশি ভালো ছেলেমেয়েগুলো যদি এখানে চলে আসে তাহলে কি করে অন্য প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতায় সমান হয়? কোয়ালিটি সব প্রতিষ্ঠানের প্রায় একই। কিন্তু ফার্স্ট বয়রা যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় আর সেকেন্ড

www.pathagar.com

বয়রা যদি অন্যখানে ভর্তি হয় তাহলে তো তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পারবে না। তাই আমার মন বলে এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। একটি কথা সবাই স্বীকার করবে গ্রামের কলেজগুলোর টিচারের মান ঐ পর্যায়ের নয়, যে পর্যায়ের মান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচারদের আছে।

প্রশ্ন : স্কুল লেভেলে যদি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে না আসতে পারে তাহলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ভালো ছাত্র পাওয়া যাবে না। তখন এ সমস্ত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা কি হবে। তাহলে কি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আগেই স্কুল লেভেলে স্ট্রাস্ট করে সামর্থ্যবানদের এগিয়ে আসা উচিত নয়?

উত্তর : এটি ঠিক যে প্রাইভেট সেক্টরের স্কুল লেভেলে আগে এগিয়ে আসা উচিত। স্কুল লেভেলে আমরা যেমন মানারাত করেছি সে রকম প্রাইভেট সেক্টরে যদি আরো ১০০ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তাহলে ভালো হবে। তবে ব্যবসা গড়ে উঠেছে স্কুল এডুকেশনে। এটি আনফরচুনেট যে কিন্ডারগার্টেনগুলো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। আর তাদের মানের ব্যাপারে আমার অত ইনফরমেশন জানা নেই। সার্বিকভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় মানের তো সমস্যা আছেই। তবে প্রত্যেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি যদি একটি করে ভালো ল্যাবরেটরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে তার ফল ভালো হবে।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে কোচিং সেন্টারের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কেন?

উত্তর : আসলে এটি একটি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। সারা দুনিয়ায় কোচিং সেন্টার সিস্টেম নেই। এমনকি ইস্ট পাকিস্তানেও কত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র বেরিয়েছে, কোনো কোচিং সেন্টার ছিল বলে মনে পড়ে না। কোচিং সিস্টেম চালু হওয়ার ফলে দেশে জ্ঞানের বিকাশ হয়েছে তা কিন্তু নয়। বাস্তবে জ্ঞানের কোনো বিকাশ হয়নি। আমি যতটুকু জানি, তারা একটি ফরমেট ফলো করে। এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রি কিংবা ভর্তি পরীক্ষার উপর তারা একটি স্টাডি করে, কি কি প্রশ্ন হতে পারে এবং তারা তা গিলিয়ে দেয়। এটিকে তারা মডেল টেস্ট বলে। আট-দশটা মডেল টেস্টের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদেরকে গিলানোর চেষ্টা করা হয়। এতে তাদের নলেজ কিছুই বাড়ে না বরং নলেজ কমে। কারণ তারা সব বাদ দিয়ে কিছু নির্দিষ্ট পড়াশুনা করে। এভাবে নেরো ডাউন (narrow down) করে নিয়ে আসে তারা।

এটি আমাদের জন্যে ক্ষতিই হচ্ছে। এটি সরকার চাচ্ছে তুলে দিতে। কিন্তু তারা একটি লবি হয়ে গেছে। তারা এর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আয় করছে। এতে যদি সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা মামলাও করে এখানে তারা লাখ লাখ টাকা মামলার পেছনে ব্যয় করতে দ্বিধা করবে না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি কোচিং সেন্টার উঠে যাওয়া উচিত। এর জন্য সরকারকে নতুন আইন যদি করতে হয় সে আইন করা উচিত। এতে একটি প্রশ্ন কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে উঠতে পারে যে কিছু লোকের রুজি নষ্ট হবে। বলবে কোর্স করলে ছেলেদের ভর্তি সুবিধা হয়। তবে এটি কিন্তু সত্যি নয়। ধরলাম ৫০ হাজার ছেলে কোচিং নিল। কিন্তু আলটিমেটলি ২০০০ সিটের জন্য তো ২০০০ ছাত্রেরই ভর্তির সুযোগ হবে। অর্থাৎ কোচিং করা ৫০ হাজারের মধ্যে মাত্র ২০০০ ছাত্রই সুযোগ পাবে। আবার কোচিং সিস্টেম না থাকলেও ৫০ হাজারের মধ্যে ঐ দু'হাজারই ভর্তির সুযোগ পেতো। বরং নন কোচিং অবস্থায় রিয়েল ট্যালেন্ট ছাত্ররাই চান্স পেত। তাই কোচিং সেন্টার থাকার কোনো দরকার নেই। এটি তুলে দিতে হবে, যদি একবারে না পারা যায় তাহলে দুই-তিন বছরে

www.pathagar.com

তুলে দিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারকে দৃঢ় হতে হবে। আমি জানি সরকারের বিরোধিতা হবে। এসব প্রব্লেম আছে। কিন্তু তার মধ্যেও যদি কোনো সরকার দৃঢ় হয় তাহলে তা জাতির জন্যই ভালো হবে।

প্রশ্ন : গাইড বই আরেকটি ফ্যাক্টর, স্কুল লেভেলে পাঠ্যবই গাইড ছাড়া বিক্রয় না করার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়। গাইডের মানও যাচ্ছে তাই অবস্থা।

উত্তর : আমি জানি না শিক্ষাবিদদের মত কি? আগে হাতে গোনা দু'একটা নোটবুক ছিল। কিন্তু আমরা তো সে নোটবুক পড়িনি। তাও সবাই কিনতো না। গাইড বই সিস্টেম সারা দুনিয়ার কোথাও নেই। তবে যদি সরকারের অনুমতি নিয়ে গাইড বই উপকারী লেভেলে তৈরি করা যায় তাহলে তাতে আপত্তির কিছু দেখি না। তা অবশ্যই টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। কিন্তু কোচিং সেন্টার এর থেকে অনেক বেশি খারাপ। এতে গার্জিয়ানদের অর্থ খরচ হয়। আমাদের ইকোনমি দুর্বল। আমাদের আয় কম। এতে বাবা-মার উপর প্রেসার পড়ে। আজকাল তো বাবা-মায়ের উপর প্রেসার সাংঘাতিক। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে তাদেরকে হিমশিম খেতে হয়। গাইড বইও যদি কেনে হাজার টাকার বেশি লাগে, আর কোচিং সেন্টারগুলোতে হাজার টাকা তো মাসেই লাগে। মৌলিক সমস্যা না হলেও কোচিং সেন্টারের মতো গাইড বইও একটি সমস্যা।

প্রশ্ন : শিক্ষাখাতের বর্তমান ব্যয়কে কি আপনি পর্যাপ্ত মনে করেন?

উত্তর : আসলে বর্তমানে আমাদের যে বাজেটের আকার তাতে শিক্ষাখাতে সবটুকু বরাদ্দ দেয়া সম্ভব নয়। তবে এখানেও টার্গেট ভিত্তিক এক একটি করে কাজ শেষ করা সম্ভব। তার জন্যে আগে আমাদের ঠিক করতে হবে কোন কাজ অগ্রাধিকার পাবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের দেশে এখন সরকারী খাতে আছে। এতে সব খরচ সরকারের উপর চলে আসে। যে কোনো কারণেই হোক এরশাদ সাহেবের সময় থেকে সরকারীভাবে টিচারদের বেতন দেয়া শুরু হয়। তখন এটি ভালো মনে হলেও আসলে তা ছিল একটি ভুল পদক্ষেপ। এরপর বেতনের ক্ষেত্রে আরো অনেক দাবি দাওয়া উঠতে শুরু করে। অথচ বৃটিশ আমল আর পাকিস্তান আমলের মতো শুধুমাত্র জিলা স্কুল ছাড়া সকল স্কুল প্রাইভেট সেক্টরে থাকা উচিত ছিল।

মিডিয়া

মিডিয়াকে সঠিক গুরুত্ব দেয়ার একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে

প্রশ্ন : মিডিয়া নিয়ে আপনার ভাবনা কি?

উত্তর : মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো সংগঠন, যে কোনো আদর্শ (ideology) বা যে কোনো দেশ যদি নিজেকে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে তাকে মিডিয়ার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। দুনিয়াতে বড় শক্তিগুলো মিডিয়ার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেমন আমেরিকা, বৃটেনের বিশ্ব মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় টিভি চ্যানেল BBC, NBC, ABC, CNN সবই বৃটেন ও আমেরিকায়। আবার

www.pathagar.com

জার্মান, ফ্রান্সেরও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল রয়েছে। আমি আলজেরিয়াতে ফ্রান্স চ্যানেলের ব্যাপক প্রভাব দেখেছি। কেননা তারা আরবীর পরেই ফ্রান্স জানে।

বিশ্বে নানা ধরনের শক্তির মাধ্যম আছে। এর মধ্যে অর্থ একটি। মিলিটারি পাওয়ার একটি। আর বর্তমান বিশ্বে মিডিয়া একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শক্তির মাধ্যম। তবে এটি ঠিক আমেরিকার মিডিয়ার উপর একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব বেশি। এরা দু'দিকের স্বার্থেই কাজ করে থাকে। যখন আমেরিকান হিসেবে দেখি এরা আমেরিকান পারপাস সার্ভ করে এবং গোষ্ঠীর স্বার্থ হিসেবে গোষ্ঠীর পারপাস সার্ভ করে। মিডিয়ার প্রধান মাধ্যম হলো বর্তমানে টিভি চ্যানেল এবং বড় বড় সংবাদ এজেন্সিগুলো। যেমন রয়টার এপি, এএফপি প্রভৃতি। সে সঙ্গে শক্তিশালী সংবাদপত্র যেমন নিউইয়র্ক টাইমস, ফিনান্সিয়াল টাইমস, ইকোনোমিস্ট, টাইম, নিইজ উইক ইত্যাদি। এরকম গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল, পত্র-পত্রিকা প্রায় সব তাদেরই নিয়ন্ত্রণে যারা শক্তিশালী। অথবা আমরা উল্টো করেও বলতে পারি পাওয়ারফুলদের দ্বারাই মিডিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

তাই আমরাও যদি চাই বাংলাদেশের দুনিয়াতে নাম হোক তাহলে তারও মিডিয়াতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ইসলামের জন্য মিডিয়াতে শক্তি বৃদ্ধি প্রয়োজন। যে কোন কারণেই হোক মিডিয়াকে তারা উপেক্ষা করেছে। হয়তো তারাও চিন্তা করেছে তাদের ভালো পত্রিকা দরকার। কিন্তু চ্যানেল করার চিন্তা তাদের মাথায় এসেছে গত কয়েক বছর ধরে। কারণ টিভি চ্যানেল সারা বিশ্বে প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়ই জনপ্রিয় হয়েছে। তখন CNN নাম করে। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল ২০-৩০ বছর ধরে থাকলেও তখনই ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। এদিক দিয়ে ইসলামিক মুভমেন্টের অবস্থান ততটা মজবুত নয়। সংবাদপত্র থাকলেও আর্থিক লিমিটেশনের জন্য তারা তাতে প্রভাব রাখতে পারেনি। এখন কেউ যদি মনে করে আরবদের অর্থ ইসলামের অর্থ, আমি তার সাথে দ্বিমত পোষণ করি। আরব লোকগুলো যদি তাদের অর্থকে ইসলামের জন্য অনুভব না করে, না বোঝে এবং তারা যদি মিডিয়ার গুরুত্ব না বোঝে তাহলে শুধু অর্থ থাকলেই হবে না। যার হাতে অর্থ আছে সে মুসলিম হলেই হবে না। তাকে অনুভূতিপ্রবণ হতে হবে। তাকে বিশ্ব রাজনীতি বুঝতে হবে। এ রাজনীতির ভারসাম্য, তার সমীকরণ, ভবিষ্যৎকে বুঝতে হবে। এটি না বুঝলে অর্থ থাকলেও সে অর্থ কাজে লাগবে না।

ইসলামী শক্তিগুলোর যদিও মিডিয়ার প্রতি চিন্তা ছিল কিন্তু তারা সেটি বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এসব ব্যাপারে যেসব এলাকা সবচেয়ে দুর্বল তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। পাকিস্তানে ইসলামী শক্তির এবং অনৈসলামী শক্তির মিডিয়া কন্ট্রোল ব্যালান্সড। আমার ধারণা আরব বিশ্বেও মোর অর লেস ব্যালান্সড। এটি অবশ্য সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে। মুসলমানরা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে নতুন। অবশ্য আল জাজিরা চলে এসেছে। ইসলামী শক্তি হিসেবে না আসলেও এটি মুসলিম চিন্তার বাইরে নয়। আরব বিশ্বে ইতোমধ্যে বেশ কিছু পাওয়ারফুল মিডিয়া হওয়াতে ওয়েস্টার্ন চ্যানেলের আধিপত্য বর্তমানে সেখানে তত নেই। আমার মনে হয় ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার টিভি চ্যানেলগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী। ইন্দোনেশিয়ার ভাষা ইংরেজি না হওয়ার কারণে সেখানে ইংলিশ টিভি চ্যানেলের তেমন কোনো আকর্ষণ নেই। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি প্রব্লেম এরিয়া যেখানে ইসলামী শক্তির নিজস্ব কোনো টিভি চ্যানেল নেই। সত্যিকার শক্তিশালী ইসলামী টিভি চ্যানেল সাউথ এশিয়াতে নেই।

www.pathagar.com

এটি একটি বড় সমস্যা। এ সমস্যা আরব দেশগুলোতে তেমন নেই। তারা ইংলিশ স্পিকিং পিপল নয়। তাদের নিজস্ব চ্যানেল আছে। ইংলিশ টিভি এরিয়ার মুসলিমদের নিজস্ব তেমন কিছুই নেই। এসব জিনিস ওভার অল আমাদের বিবেচনা করতে হবে। অন্ততপক্ষে পাঁচ বছরের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী কাভারেজসহ একটি টিভি চ্যানেল করতে হবে। আল জাজিরা বর্তমানে যে অবস্থানে আছে তারা চাইলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী হতে পারে।

প্রশ্ন : আমরা পাশ্চাত্য আগ্রাসনের কথা বলে থাকি। তারা কিন্তু যোগ্যতা এবং সামর্থ্য নিয়েই তো এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা তো তার মোকাবিলার চেষ্টাই করি না। আমাদের দুর্বলতাকে কি পাশ্চাত্যের দোষ বলে চালানো যায়?

উত্তর : পাশ্চাত্যকে দোষ তো দেয়া যায়ই। কেননা যে কোনো শক্তিকেই যদি অপব্যবহার করা হয় তাহলে তা নৈতিকতা হারায়। কোনো কিছুর উপর যদি নিয়ন্ত্রণ থাকেই তাহলে তার নৈতিক ব্যবহার করতে হয়। সারা বিশ্ব আসলে চলছে একটি নৈতিক বিধানের উপরে। এখানে মানুষ একে অপরকে কেয়ার করবে, খেয়াল করবে। কেউ কাউকে ধ্বংস করবে না। সুতরাং আজকে আমেরিকা বা ইহুদীদের কাছে যে মিডিয়া পাওয়ার আছে তা যদি তারা অপব্যবহার করে তাহলে সেটি একটি অপরাধ। তা অস্বীকার করা যাবে না। আমাদের অর্থ আছে। অর্থের যদি আমরা অপব্যবহার করি তাহলে তো তা নৈতিক অপরাধ হবে। আইন, নৈতিকতা, বিবেক বলবে এটি অপরাধ। কাজেই যে কোনো শক্তিরই অপব্যবহার করা হলে তাকে ভালো বলা যায় না।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের স্বার্থে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়?

উত্তর : এজন্য মিডিয়াকে সঠিক গুরুত্ব দেয়ার একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমার ধারণা এ বিষয়টি নিয়ে সবাই ভাবছে। কিন্তু এটি কি করে করা যায়, কিভাবে করা যায় তা আমার পক্ষেও বলা মুশকিল। কারণ এজন্য একটি গ্রুপ লাগবে যারা অর্থ-বিত্ত নিয়ে এগিয়ে আসবে।

বাংলাদেশে মিডিয়া কেন দরকার? ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেলগুলো মোকাবিলা করার জন্য মিডিয়ার অতটা দরকার নেই। সে শক্তি এ মুহূর্তে আমাদের নেই। এখানে এ বিষয়টি গভীরভাবে বোঝার দরকার যে আমাদের মিডিয়াতে গভীরভাবে প্রবেশ করার প্রয়োজনীয়তা কোথায়। এটি এজন্য প্রয়োজন যে, স্থানীয়ভাবে অনৈসলামিক পরিবেশ আছে তা বন্ধ করা। স্থানীয়ভাবে ইসলামের বিপরীত ধারার দিকে সমাজকে, কালচারকে, জাতিকে বিপরীতগামী করার যে চেষ্টা করা হচ্ছে তা রোধ করা। স্থানীয় চ্যানেলগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে ওই পর্যায়েরই কয়েকটি টিভি চ্যানেল লাগবে। আমি জানি বেশ কিছু ব্যক্তি এ বিষয়টি নিয়ে ভাবছেন। তাদেরকেই এর উদ্যোগ নিতে হবে।

এর মাধ্যমেই স্যাটেলাইট চ্যানেলের জবাব সম্ভব মতো দিতে হবে। সে জবাবটা কার্যকরী হবে কেবল বাংলাদেশেই, বাংলা ভাষাতেই। কিন্তু বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার জন্য ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান কিংবা মিডল ইস্ট থেকেই এগিয়ে আসতে হবে। নয়তো ইউরোপ থেকে আসতে হবে। ইউরোপেই মুসলিমদের বড় টিভি চ্যানেল করতে হবে। সেখানে স্বাধীনতার সুযোগ আছে। সে সুযোগকেই কাজে লাগাতে হবে। সুতরাং আমাদের দেশে টিভি চ্যানেলগুলোর উদ্দেশ্য আমার মতে এ পর্যায়ে আপাতত থাকবে যে কেবল স্থানীয় পর্যায়ে অনৈসলামিক গতিধারাকে সঠিক পর্যায়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা।

www.pathagar.com

এদেশে ইসলামী আন্দোলনের উপর সবসময়ই রাজনৈতিক চাপ ছিল

প্রশ্ন : বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থান কোন পর্যায়ে?

উত্তর : আমার মতে পর্যায়ে নেই। আমাদের কর্মীদের মধ্যে লক্ষাধিক গ্রাজুয়েট আছে। এদের কেউ আবার মাস্টার্স, কেউ কামিল পাস। কিন্তু খুব কমই আউটস্ট্যান্ডিং। যদি বাংলাদেশের দিকে তাকাই তাহলে এখানে আমি মাওলানা মওদূদী পাই না। আমিন আহসান ইসলাহী পাই না। সাইয়্যেদ কুতুব পাই না। আল্লামা ইকবালের মতো লোক পাই না। ড. কারযাভী, মুহাম্মদ আল গাজ্জালী, জয়নাব আল গাজ্জালীর মতো ব্যক্তিত্ব পাই না। সে পর্যায়ের লোক তো এখানে তৈরিই হয়নি। ইন্টেলেকচুয়াল পর্যায়ে আমরা যে কোনো বড় কিছু অর্জন করিনি এটি তার একটি প্রমাণ।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে আমাদের তেমন কোনো মৌলিক কাজ নেই। যেমন যাকাতের ফিকাহ বইয়ের মতো একটি কাজ আমরা করতে পারিনি। মুহাম্মদ গাজ্জালীর লেখা ইসলামের আকীদার পর্যায়ের কোনো বই এখানে লেখা হয়নি। ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা অথবা ড. আবদুলহামিদ আহমাদ আবুসুলাইমানের বই ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (Towards an Islamic Theory of International Relations), দি ক্রাইসিস অব দি মুসলিম মাইন্ড কিংবা ড. ওমর চাপড়ার অর্থনীতির উপর যে তিনটি বই আছে সে রকম পর্যায়ের বই আমরা কি এখানে প্রকাশ করতে পেরেছি? দশটি বই পড়লে একটি বই লেখা যায়। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে উপস্থাপন করার মতো আমাদের এমন কী কাজ আছে? আমাদের এখানে ভালো ভালো বইয়ের কিছু অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু লেখকদের ভালো মৌলিক লেখা কোথায়? লেখার মূল্যায়নে আমি তা দেখতে পাই না। ড. কারযাভীর মতো সিরিজ অব বুকস আমরা পাচ্ছি না। অথবা ইকবালের রিকন্সট্রাকশন অব রিলিজিয়ান ইন ইসলাম - এ একটি বইয়ের কথা বললেও এর সমান কোনো বই আমাদের এখানে লেখা হয়নি।

আকরাম খাঁর উপর আমার রেসপেক্ট আছে। তিনি পুরানো মতগুলোকেই আধুনিক চিন্তার সাথে মিলিয়ে "তরজমানুল কুরআন" বের করেছিলেন। এটি একটি বড় কাজ। নজরুল ইসলাম ইসলামী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি অসাধারণ কাজ করে গেছেন। হামদ, নাত বা রাসূল প্রশস্তির ক্ষেত্রে তার এটিকে অসাধারণ বলতেই হবে। এটি একদম অরিজিনাল কাজ, মৌলিক কাজ। ফররুখ আহমেদ তার কাব্যে মৌলিকত্ব নিয়ে এসেছেন। এটি আমি একজন এনালিস্ট হিসেবেই বলছি। আমার দায়িত্ব এনালিসিস করা। আমার দায়িত্ব স্বীকৃতি দেয়া যার স্বীকৃতি প্রাপ্য। সব মিলে বলা যায় ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে আমাদের এখানে এখনও যথার্থ কাজ হয়নি।

সমাধান কী? সমাধান দু'টি। এক, বাইরে থেকে যত গুরুত্বপূর্ণ বই আছে অনুবাদ করে নিতে হবে। মৌলিক কাজ এ মুহূর্তে জরুরী হলেও বর্তমানে তার ঘাটতি আছে। দুই, আমাদের ইয়াং যে ব্যাচ আছে তাদের ১ হাজার ছেলেকে এখনই পড়াশোনায় যুক্ত করে দেয়া যে তোমরা পড়তেই থাকো। ২ লাখ কর্মী থেকে ১ হাজার আলাদা করে ফেললেই হয়। তাহলে তার মধ্যে থেকে অন্তত ১০ জন স্কলার বেরিয়ে আসবে। এটি হবে হয়তো ২০-২৫ বছর পর। তখন তারা সত্যিকার মৌলিক কাজ করতে পারবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : এজন্য কি কাঠামোগত কোনো পরিকল্পনা আপনার আছে?

উত্তর : এ ব্যাপারে হঠাৎ করে আমি কোনো সাজেশন দিচ্ছি না। তবে আল্লামা কারযাভীর সাজেশন আছে লিডারশীপ ট্রেনিং করা। এটি চিন্তা করা যেতে পারে। তেমনিভাবে হিসাম আল তালিবের ট্রেনিং গাইডে যে সাজেশন আছে তা দেখা যেতে পারে। আমি শুধু ট্রেনিং প্রোগ্রাম নিয়ে একটি কথা বলতে পারি। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের যে ৭ দিন, ১০ দিন ট্রেনিং দেয়া হয় সে ট্রেনিং থাকবে। কিন্তু একদল লোককে ছয় মাসব্যাপী ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। অন্তত ৩০ জন করে ৩/৪ টি ব্যাচে একটি একাডেমীতে ইসলামী সাহিত্যের কোর্সের মাধ্যমে তাদেরকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য থাকতে হবে। ১৫ দিনের ট্রেনিংয়ে কোনো ট্রেনিং হয় না। বর্তমানে সেখানে কয়েকটি হাদিস ও দরসে কুরআন এবং কয়েকটি অতি পরিচিত বিষয়ে আলোচনা থাকে যা ৩০/৪০ বছর ধরেই চলছে। সে ট্রেনিং দ্বারা হবে না। এখানে উচ্চ পর্যায়ের ট্রেনিং-এর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বইকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে কম্পিটেন্ট টিচার দ্বারা। টিচারের অভাব মেনেই এর মধ্যে এ কাজ করতে হবে। এটি যদি ইসলামী আন্দোলন করতে পারে তাহলে প্রতি বছর প্রায় একশ লোক এবং ১০ বছরে ১ হাজার লোক তৈরি সম্ভব। এ কাজটি নিয়ে তারা ভাবতে পারে।

প্রশ্ন : ইসলামী আন্দোলনে বাংলাদেশে শ্রমিকরা সেভাবে সাড়া দিচ্ছে না কেন যেভাবে এক সময় তাদের ভেতর বাম আন্দোলনের সাড়া পড়েছিল?

উত্তর : এটি ঠিকই। আর এ ব্যাপারে আমার যে খুব একটি সঠিক উত্তর আছে তাও বলব না। তবে আমি দেখি বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন দুর্বল হচ্ছে। তার একটি কারণ সম্ভবত এ যে শ্রমিকদের জীবনের মান সারা দুনিয়াতেই বেড়েছে। ইউরোপসহ সাবেক সোশ্যালিস্ট দেশগুলোতে বেড়েছে। উপমহাদেশের দেশগুলোতেও বেড়েছে। দ্বিতীয়ত, কমিউনিজমের পতনের পরে তাদেরকে দেখার মতো আর তেমন কেউ নেই। শ্রমিকরা এতিম হয়ে গেছে। আগে বামপন্থীরা তাদের গার্জিয়ান ছিল। কিন্তু এ জায়গাটি ইসলামিস্টরা নিজেদের দখলে নিতে পারেনি। এ ব্যাপারে তাদের কি অসুবিধা আমি জানি না। তবে এটি ঠিক একটি সময় পর্যন্ত ইসলামী মুভমেন্ট নিজেই নিজেদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে অবতীর্ণ ছিল। যেখানে নিজেদের টিকে থাকার প্রশ্নই ছিল বড় সেখানে অন্যকে তারা আর কিভাবে সাহায্য করবে? বেশিরভাগই সরকারের, সাম্রাজ্যবাদের, আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। আর বাংলাদেশে পলিটিক্যাল ঝড় সবসময় ছিল। শ্রমিকের গার্জিয়ান হওয়ার একটি যোগ্যতা ইসলামিক মুভমেন্টের ছিল কিন্তু আমাদের দেশে তারা পারল না। অন্য কোনো দেশের শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা অবশ্য আমার ভালো জানা নেই। বস্তুত বিশ্বব্যাপী ইসলামী মুভমেন্টে শ্রমিক আন্দোলন কোথায় কি অবস্থায় আছে, কি করছে, কি করতে পেরেছে, কি করতে পারেনি, এটিও একটি স্টাডির বিষয় বলে আমি মনে করি।

আমাদের মতো দেশে আরেকটি সমস্যা হলো শ্রমিক আন্দোলন নানাভাবে নিজেকে বিতর্কিত করে তোলে। নিজেরা হরতালের সুযোগকে অনেক সময় খুব খারাপভাবে ব্যবহার করে। ইউনিয়নকে খারাপভাবে ব্যবহার করে। ইউনিয়নের সুযোগে বদলীতে, নিয়োগের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ শুরু করে। এ ব্যাপারে আমার নিজেরই বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকাকালীন সময়ের অভিজ্ঞতা আছে। শ্রমিক ইউনিয়ন এক ধরনের স্বার্থবাদী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। তাদের নেতাদের মানসিকতা হচ্ছে খালি ঘোরাঘুরি করবো, কাজ করবো না। ব্যাকিং-এর ক্ষেত্রে এমনও হলো যে, কে লোন পাবে আর কে পাবে না- তাতেও তারা হস্তক্ষেপ করতে লাগল!

www.pathagar.com

ফলে এর কুফল হিসেবে শ্রমিক ইউনিয়নের ভূমিকা আমাদের দেশে শ্রমিক স্বার্থের বিরুদ্ধে চলে যায়। আস্তে আস্তে জনগণ বুঝতে পারে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ খুব ভালো নয়। তারাও হলো এক ধরনের স্বার্থপর। এদিকে সৎ নেতৃত্বের ভেতর দুর্বলতা অনেক। সব মিলিয়েই শ্রমিক আন্দোলনের একটি পতন (ডিকলাইন) হয়। এটি সামনে কি রূপ নেবে জানি না। এটি আমার পক্ষে বলাও মুশকিল। তবে সামনে এটি একটি নতুন ফর্মে আসবে। বর্তমান ফর্ম আর টিকবে না। যেখানে গণতান্ত্রিক কাঠামো বিশ্বব্যাপী শক্তভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, জীবনের মান ক্রমশই উন্নত হয়ে আসছে, সেখানে শ্রমিক আন্দোলনের পুরনো কথা, পুরনো শ্লোগান টিকবে বলে মনে হয় না।

মুসলিম বিশ্ব

মুসলিম দেশগুলো ডিক্টেটরে ভরা

প্রশ্ন : মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরা দেশ ও জাতির স্বার্থ যত না দেখেন তার চেয়ে বেশি দেখেন পশ্চিমাদের স্বার্থ। এ অবস্থায় মুসলিম দেশসমূহে জনগণের মতামত কিভাবে প্রতিফলিত হতে পারে?

উত্তর : আমি বরং বলব তারা যতটুকু জনগণের স্বার্থ দেখে তার চেয়ে বেশি দেখে নিজের স্বার্থ। মুসলিম দেশগুলোতে ডিক্টেটরে ভরা এবং ডিক্টেটররা আসলে দুর্বল। আজকের যুগে পলিটিক্যাল অবস্থান নির্ভর করে জনগণের গ্রহণযোগ্যতার উপর। আগের যুগে রাজারা পলিটিক্যালি গ্রহণীয় হতো। শুধু দেখা হতো সেই ব্যক্তি রাজার আসল সন্তান কিনা। আমাদের বেশিরভাগ মুসলিম সরকারের জনসমর্থন নেই। তারা নিজের স্বার্থ খুব বেশি করে দেখে। এর মধ্য দিয়ে দেশের যতটুকু উন্নয়ন হয় হলো। এটি দেখতে গিয়ে তারা আমেরিকা আর পাশ্চাত্যের শক্তিশালী দেশগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারা ভাবে আমেরিকা তাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে টিকিয়ে রাখবে। এইখানে আমেরিকার সাথে তাদের একটি জোট তৈরি হয়। আবার সবসময় আমেরিকার চাপও থাকে। আমেরিকার চাপকে এরা ভয় পায়।

প্রশ্ন : ওআইসিকে মুসলিম দেশগুলোর জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে কিভাবে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়?

উত্তর : কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিক ছাড়া ওআইসি বিভিন্ন লেভেলে ভালো কাজ করছে। তারা শরীয়াহর ক্ষেত্রে ভালো কাজ করছে। সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভালো কাজ করছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আইডিবি'র মাধ্যমে ভালো কাজ করছে। কিন্তু পলিটিক্যাল লেভেলে তারা কিছুই করতে পারছে না। কারণ অধিকাংশ সরকার চায় না ওআইসির মাধ্যমে বড় কিছু হোক। তারা চায় জাতিসংঘের মাধ্যমে সব হোক। কিন্তু মুসলিম দেশগুলোর উচিত ওআইসিকে শক্তিশালী করা। ওআইসিকে তাদের প্রথম অগ্রাধিকার দিয়ে জাতিসংঘকে দ্বিতীয়তে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। ওআইসিতেও সিকিউরিটি কাউন্সিল করা দরকার। ওআইসির সদস্যদের মধ্যে যদি কিছু হয় তাহলে তা সিকিউরিটি কাউন্সিলই দেখবে। খুব বড় সমস্যা দেখা দিলে জাতিসংঘ বিষয়টি দেখবে। আসলে ওআইসির কোনো দোষই নেই। দোষ মুসলিম সরকারগুলোর। আর আমরা নিজেরা না বুঝে অনেক সময় ওআইসিকে দোষারোপ করি। আসলে এগুলো হলো নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মুসলিম বিশ্বে একক মুদ্রা প্রবর্তনের কথা উঠেছে। এ বিষয়ে আপনার চিন্তা ভাবনা কি?

উত্তর : এটি ঠিক এ চিন্তা মুসলিমদের ভেতর আছে। মালয়েশিয়ার এ চিন্তা আছে। কিছু পেপারসও তৈরি হয়েছে। আইডিবির, ওআইসির এ ধরনের চিন্তা আছে। বলা যায় এ চিন্তার একটা শেপ দাঁড়াচ্ছে। মুদ্রার জন্য প্রয়োজন একটি ইকোনোমিক ইউনিয়ন। মুসলিম ওয়ার্ল্ডকে একটি ইকোনোমিক ইউনিয়নের মধ্যে এনে এই একক মুদ্রা সিস্টেম প্রবর্তন করলে ভালো হয়। না হলে এই করাটা খুব একটা মিনিংফুল হবে না। আগে ওসমানীয়দের নিয়ন্ত্রণাধীন গোটা উত্তর আফ্রিকা, ইউরোপের অর্ধেক, সেন্ট্রাল এশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যে একক মুদ্রা ছিল। এক ব্যবস্থায় একটি অভিন্ন বাজারে একক মুদ্রা কার্যকর সম্ভব। কাজেই একক মুদ্রা হিসেবে দিনার প্রবর্তনের জাস্টিফিকেশন হবে যদি একটি অভিন্ন বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন : বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন আমেরিকাকে মোকাবিলা করে কিভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে?

উত্তর : ইসলামী আন্দোলনের কাজ আমেরিকাকে মোকাবিলা করা নয়। বিশ্বব্যাপী এর দুটি বড় কাজ আছে। একটি হচ্ছে এর ভেতরে যা ত্রুটি আছে তা কাটিয়ে ওঠা। আরেকটি হলো বাহিরে যদি শত্রু থেকে থাকে তাদেরকে মোকাবিলা করা, অথবা বাইরের বিশ্বে ইসলামকে পৌঁছানো। এ আভ্যন্তরীণ সংকট কাটিয়ে উঠতে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে অবশ্যই সজাগ হতে হবে। মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো কি করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে তা দেখতে হবে। তার শিক্ষার পুনর্গঠন করতে হবে। শিক্ষা আর অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে সফল হলে সায়েন্স, টেকনোলজি, ডিফেন্স উন্নত হবে। এর সাথে সাথে ইসলামের আলোকে মানুষ গড়ে তোলার জন্যও শিক্ষা দরকার। শিক্ষা শক্তিশালী হবে না শক্তিশালী অর্থনীতি ছাড়া। প্রত্যেকটি জিনিস প্রত্যেকটির সাথে জড়িত। এটিই হচ্ছে ইন্টারনাল কাজ এবং সত্যিকার অর্থে জনগণকে একজন ভালো মুসলিম বা ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের মুসলমানদের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে ভালো মানুষ তৈরির দিকে তাদের নজর নেই। ভালো মানুষ আর ভালো মুসলমান আলাদা কিছু নয়। ভালো মুসলমান মানেই ভালো মানুষ। ভালো মানুষ মানেই, যদি সে ঈমান আনে, সে ভালো মুসলিম। শুধু ঈমান আনার কারণেই ভালো মানুষ মুসলিম হয়ে যায়। আর এক্সটারনালি আমাদের দুটি কাজ। শত্রু থাকলে তার মোকাবিলা করা আর ইসলামকে ছড়িয়ে দেয়া। এজন্য যত মাধ্যম আছে সব মাধ্যমের ব্যবহার করতে হবে। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে শত্রুদের মোকাবিলা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জনগণকে সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। যেমন আমেরিকার কাজকর্মে সবাই সচেতন হয়েছে। ইরাকের ঘটনায় আমেরিকা মুসলমানদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : ইদানীং পশ্চিমা শাসক ও মিডিয়া সন্ত্রাস ও জিহাদকে একই কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর : এটিকে পার্থক্য করার মধ্যে ছোটখাট সমস্যা থাকতে পারে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে সন্ত্রাস ও জিহাদ এক নয়। জিহাদের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামিক সোসাইটিকে রক্ষা করা, অন্যকে আক্রমণ করা নয়। দ্বিতীয়ত, মুসলিম বিশ্বে কোথাও যদি অত্যাচার থাকে তাহলে তা দূর করা। আন্তর্জাতিক বিশ্বে থাকলে তাও দূর করা। তবে আমাদের বুঝতে হবে আজকের যুগে আমরা তো আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আজকের দিনে কোনো সমস্যা এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এটি আজকের যুগে জাতিসংঘ কিংবা জেনেভা কনভেনশনের মাধ্যমেই করতে হবে। ইসলামের অবজেকটিভ এটিই যে আমি অত্যাচার দূর করবো, সেটি যেখানেই হোক। আর এটিও আল্লাহর হুকুম যে আমাদের চুক্তি মেনে চলতে হবে।

www.pathagar.com

আমরা মূল জিহাদ ও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে আসি। জিহাদের একটি ফর্ম হচ্ছে নিজের নফসের সঙ্গে জিহাদ। একে তো আর সন্ত্রাস বলা যাবে না। সমাজ সংস্কারের জন্য জিহাদ সন্ত্রাস নয়। কিন্তু সন্ত্রাস যে কাজকর্মের দ্বারা হয় তা সমাজের ভেতরে করার কোনো অধিকারই আমাদের নেই। আর সেখানে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে একটি রাষ্ট্রের ভেতর কেউ সন্ত্রাস করবে তার সুযোগই তো নেই। জিহাদ ঘোষণা করতে পারে কেবলমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র বা মুসলিম পলিটিক্যাল অথরিটি। কোনো ব্যক্তি জিহাদ ঘোষণা করতে পারে না। কেউ যদি করেও তা শরীয়াহর দৃষ্টিতে জিহাদ হয় না।

বর্তমান সন্ত্রাসের রূপ হলো কোথাও বোমা ফেলে দেয়া। তাতে অনেক নিরীহ লোক মারা যায়। নারী-শিশু মারা যায়। কোথাও বিল্ডিং ভেঙে ফেলা হয়। এসব কখনো জিহাদের অংশ নয়, অংশ হতে পারে না। যে ইসলাম বলে যুদ্ধের সময় গাছ কাটবে না, কোনো উপাসনালয় নষ্ট করবে না, কোনো বৃদ্ধ লোককে মারবে না, কোনো নারীকে স্পর্শ করবে না, কাউকে হত্যা করবে না, মন্দিরের যে পুরোহিত তার কোনো ক্ষতি করবে না, ফসল কাটবে না - সে ইসলাম কি করে বোমা মেরে নির্বিচারে লোকদের মেরে ফেলা সমর্থন করতে পারে? টুইন টাওয়ারের ঘটনা যারাই করেছে তারা ভালো লোক নয়। তারা সন্ত্রাসী। এ ব্যাপারে সারা বিশ্বের আলিমরাও একমত হয়েছেন। বিশ্বের সকল ইসলামী আন্দোলন এ সন্ত্রাসের নিন্দা করেছেন।

প্রশ্ন : মুসলিম দেশে ইসলামী দলগুলো এখনো ক্ষমতা অর্জনকারীর ভূমিকায় আসতে পারেনি কেন?

উত্তর : কথাটি ঠিক। এর একটি কারণ হলো মুসলিম বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই এখনো ডিক্টেটরশিপ চালু আছে। সেখানে পলিটিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়া যাচ্ছে না। মিশর, তিউনিসিয়া, মরোক্কোসহ অনেক দেশেই এটি হচ্ছে। কোনো কোনো দেশে মেইন স্ট্রীম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় অন্য নামে চেষ্টা করছে। মরক্কো, বাহারাইন, জর্ডান, কুয়েত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় তারা আগানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু আমেরিকা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে চেষ্টা করছে যেন মুসলিম পলিটিক্যাল ফোর্স মেইন স্ট্রীম পলিটিক্সে না থাকে। আরেক সমস্যা হলো তারাই আবার সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। বিভিন্নভাবে মূল দলগুলোর কাজকর্মে বাধা দেয়। অবাক ব্যাপার ইখওয়ানুল মুসলেমীন ৬০ বছর ধরে ব্যান্ড হয়ে আছে। এখনো তাদের লোকদের গ্রেফতার করা হয় শুধুমাত্র একত্রে বসার জন্য।

কারণগুলোর মধ্যে আরেকটি হলো আমাদের নিজস্ব অযোগ্যতা। আবার মুসলিম দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি না থাকায় এবং ডিক্টেটরশিপ বা সেমিডিক্টেটরশিপ থাকার কারণে ইসলামী দলগুলো প্রকাশ্য ভূমিকায় আসতে পারছে না। তৃতীয়ত, ওয়েস্টও এ ধরনের ব্যবস্থা চায় না। কয়েকদিন আগেই তারা বলেছে ইরাকে তারা ইরানের মতো কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা অনুমোদন করবে না। কিন্তু ইরাকের জনগণ যদি এ ব্যবস্থা চায় তাহলে আমেরিকা তা বলার কে? তারা চায় সেখানে আমেরিকার মতো সরকার করা যাবে কিন্তু ইরানের মতো করা যাবে না।

তবে আমি মনে করি ইসলাম ইনশাআল্লাহ আগাবে। কিন্তু এজন্য শর্ত হচ্ছে সবখানে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা। গণতন্ত্র স্থায়ী হলে জনগণই জয়লাভ করবে। আর জনগণ ইসলাম চায়। এজন্য দরকার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইসলামের সহজ, সঠিক এবং উদার ব্যাখ্যা। আমাদের নেতৃবৃন্দ যদি জ্ঞানী হয়, আমরা যদি ভালো লিটারেচার - একাডেমিক এবং

www.pathagar.com

কনভিন্সিং লিটারেচার তৈরি করতে পারি তাহলে আমি বুঝি না দুনিয়ায় কেন ইসলাম বিজয়ী হবে না। সেটি ১০, ২০ কিংবা ৫০ বছর যাই লাগুক। তবে আমি বিশ্বাস করি ইনশাআল্লাহ, ইসলাম জয়ী হবে। আমি এও বিশ্বাস করি আমেরিকায় খুব শক্তিশালীভাবেই ইসলাম এগিয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের পারস্পরিক যোগাযোগ কিভাবে হতে পারে?

উত্তর : আন্তর্জাতিক লেভেলে এদের মধ্যে যোগাযোগ আছে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ঢাকার একজন কর্মীর সাথে খার্তুমের কিংবা লন্ডনের একজন কর্মীর যোগাযোগ হয় না। এটি সাধারণত নেতৃবৃন্দের মধ্যেই হয়। এটি ইউরোপের মাধ্যমেই বেশি হয়ে থাকে। ইউরোপের কয়েকটি জায়গা আছে যেখানে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আছে। সেখানে এরকম যোগাযোগ গোপনভাবে নয়, প্রকাশ্যে ও সরাসরিই হয়ে থাকে। এখানে গোপন কোনো ব্যাপার নেই। সেটি লন্ডন, জেনেভা, ব্রাসেলসের মাধ্যমে হয়। তবে, এ যোগাযোগ যা হচ্ছে তা আরো বেশি হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : মুসলমানরা ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে কিভাবে তাদের কৌশল নির্ধারণ করবে?

উত্তর : এজন্য আমি একটি লম্বা আলোচনায় যেতে পারি। ইতিহাস হচ্ছে রোমানদের সঙ্গে সংঘর্ষ প্রথমে মুসলমানরা শুরু করেনি। বরং তারাই সচেতন হয় যে এ জাগরণী মুসলিম শক্তির উত্থান এখনই বন্ধ করার দরকার। সে কারণে রোমানদের সঙ্গে তাবুকে, মুতায় যুদ্ধ হয়। পরবর্তীতে ওমর (রা)-এর সময় ইরাক এবং সিরিয়া রোমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। মুসলিম জিহাদকে একজন ঐতিহাসিক বিচার করেছেন এভাবে, তখন আন্তর্জাতিক আইন পুরোপুরি ডেভেলপ করেনি। এরকম অবস্থায় কিছু রাজা বা সম্রাট যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করছিল। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, হয় আমি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবো না হয় আমি ধ্বংস হব। এরকম একটি পরিস্থিতির মধ্যে মুসলমানরাও ছিল। রোমানরা এরকম পরিস্থিতিতে অগ্রসর হলে মুসলমনরা তা প্রতিহত করে। ঐ সময় ঐ নীতি বাস্তবসম্মতহ ছিল। যদিও অন্য রাষ্ট্রগুলো তার নৈতিক ভিত্তিগুলো মেনে চলত না। কিন্তু ইসলাম সেসব মেনে চলে। তারা নারী, শিশু হত্যা করত না। ফসল নষ্ট করত না। যুদ্ধবন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহার করত। গাছ কেটে ফেলত না, ইত্যাদি। এদিক থেকে মুসলমানরা একটি হিউম্যান ল' ফলো করত। এটিও দেখতে হতো যে, সে সময়কার পরিস্থিতিতে আমি যদি দখল না করি তাহলে আমাকেই অন্যরা দখল করে ফেলবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মুসলিম দেশ অন্য দেশ দখল করত। ইসলামের খোলাফায়ে রাশেদীন কিংবা উমাইয়া আব্বাসীয় যুগে পরিষ্কারভাবে অন্যের পদানত হবার ভয় ছিল। সো, ডু অর ডাই। আমি মনে করি এ পরিস্থিতিতে তারা যা করেছিল তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতিতে তা দরকার ছিল। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো তারা সবসময় নৈতিক নীতিমালাকে অনুসরণ করেছিল।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আজকের যুগে জিহাদের ফর্ম কেমন হবে। আজকের যুগে পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখন চাইলেই আমরা অন্য রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করতে পারি না। করা উচিতও নয়। এখন আন্তর্জাতিক আইন আছে। যদিও এটিকেও আমান্য করা হচ্ছে। আমেরিকা কিভাবে অমান্য করছে তাও আমরা দেখছি। কিন্তু আমাদের এসব আইন নীতিগতভাবে মানতে হবে। আইনের এমন পরিষ্কার বিকাশের পরে আমরা

www.pathagar.com

কি করে অন্য রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করতে পারি? আজকে যদি সাউথ আফ্রিকা নামিবিয়া আক্রমণ করে তাহলে আমরা কি বলব? বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন মানতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের বিশ্ব পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে হবে। পরিবর্তন খেয়াল করতে হবে। কিন্তু এ আইন আমরা ভাঙতে পারি না। কেননা একটু আগেও এর পক্ষে আমরা সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতের কথা উল্লেখ করেছি, তোমরা তোমাদের চুক্তিগুলো রক্ষা কর। এ আন্তর্জাতিক আইনের চুক্তিতে ৫৭টি মুসলিম দেশও স্বাক্ষর করেছে। কাজেই আমরা এটি ভঙ্গ করতে পারি না। সুতরাং এখন জিহাদের নামে কোনো আক্রমণ বৈধ হবে না।

আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী তার 'প্রাইওরিটিস অব দ্য ইসলামিক মুভমেন্ট ইন দা কামিং ফেইজ' এ জিহাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে বলেছেন, এ বিতর্ক আক্রমণাত্মক নাকি রক্ষণাত্মক তা অপ্রয়োজনীয়। তিনি কারা কোন পক্ষে তাদের নামও বলেছেন। তারা ইসলামের অনেক বড় বড় স্কলার। আমার মনে হয় ইউসুফ আল কারযাভী বিরোধীদের দলের, যদিও তিনি তা বলেননি। তিনি এ বিতর্ককে অপ্রয়োজনীয় বলছেন। আমরা এটিকে বৈধ বলে মনে করতাম যদি কোনো দেশে না গিয়ে বা রাষ্ট্রীয় কন্ট্রোল স্থাপন না করে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর আর্ব কোনো উপায় না থাকত। কিন্তু আজকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। তথ্য প্রবাহ অবাধ হয়েছে। যে কোনো মিডিয়ায়, প্রিন্টিং হোক আর ইলেকট্রনিক হোক, ইসলামের বাণী পৌঁছাতে কোনো অসুবিধা নেই। এ পরিস্থিতিতে আক্রমণাত্মক চিন্তাভাবনা সঠিক নয়। আজ বিশ্ব সভ্যতা, মানবতা এবং ইসলামের জন্য কল্যাণকর হচ্ছে এ ধরনের সংঘাত থেকে মানবতাকে দূরে রাখা। আজকে আমার শক্তি থাকলে আক্রমণ করলাম কাল যদি আমার শক্তি না থাকে? বর্তমানেও তো আমাদের শক্তি নেই।

কাজেই জিহাদ সম্পর্কে আমি মনে করি, যে কাজ শান্তিপূর্ণভাবে করা যায় সে কাজ অস্ত্রের মাধ্যমে করা ইসলামের শিক্ষা নয়। মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র রাসূলুল্লাহ (সা) শান্তিপূর্ণভাবেই করেছেন। হুদায়বিয়া চুক্তির ফলও হলো অস্ত্র ছাড়াই মক্কা বিজয়। আর আমার কাছে ইসলামের স্বার্থ ও মানবতার স্বার্থ যেহেতু এক, সে কারণে কোনো প্রকার আক্রমণাত্মক পলিসির পক্ষে আমি নই।

সংস্কৃতি

তাওহীদই আমাদের সংস্কৃতির মূল ভিত্তি

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বর্তমান সাংস্কৃতিক ধারাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

উত্তর : সংস্কৃতি একটি জাতির পরিচয়ও বহন করে। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। মানুষের সামগ্রিক জীবনাচারকেই আমরা সংস্কৃতি হিসেবে বুঝে থাকি। বাংলাদেশের বর্তমান সংস্কৃতির মধ্যে বিভিন্ন ট্রেন্ড রয়েছে। একটি হচ্ছে আবহমানকাল ধরে চলে আসা সংস্কৃতি। এখানে মুসলমানরা যখন আসে এ আবহমান সংস্কৃতিই দু'ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগে হিন্দুরা আবহমান সংস্কৃতিকেই মোটামুটি ধরে রাখে। আরেকটিতে মুসলমানরা তাদের মতো করে আবহমান সংস্কৃতিকে বহন করলো। কারণ মুসলমানগণ প্রধানত এ এলাকারই মানুষ ছিল। সেখানে মুসলমানরা আবহমান সংস্কৃতির যেটুকু ধরে রাখার ধরে রাখল আর ইসলামের আলোকে, তাওহীদের আলোকে যেটুকু ছেড়ে দেবার ছেড়ে দিল। তাহলে আমরা

www.pathagar.com

সংস্কৃতিতে দুটি ধারা পেলাম। একটি আবহমান সংস্কৃতি যা মূলত হিন্দুদের মধ্যে থেকে যায় এবং অন্যটি আবহমান উপাদানের সাথে কিছু যোগ-বিয়োগ করে পরিণত হওয়া মুসলিম সংস্কৃতি। এখানে এ কথাও বলা দরকার মুসলিম সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে। ইসলামের ভেতর রিফর্মের একটি আন্দোলন আছে - তা মুরুনা বিল মারুফ, নেহি আনিল মুনকার-এর মাধ্যমে। মুসলিম সংস্কৃতিকে ক্রমাগতভাবে বিশ্লেষণ করে তাকে ইসলামের নিকটবর্তী করা বা খাঁটি করার ভেতরগত একটি আন্দোলন সবসময় আছে অর্থাৎ মুসলিম সংস্কৃতি আমাদের দেশে ক্রমাগতভাবে রিফাইন্ড হয়ে ইসলামের নিকটতর হচ্ছে। তৃতীয় দিক হচ্ছে বিগত দেড়শ, দুইশ বছর ধরে আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এর প্রভাব আমাদের বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, ভাষায় পড়েছে। ফলে আমাদের সংস্কৃতি পাশ্চাত্য দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে।

অন্যদিকে আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক সংঘাত রয়েছে। এ সংঘাত আদর্শিক - এ সংঘাত ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির। আবার ইসলামী সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব আছে। এ দ্বন্দ্বকে সংঘাতে পরিণত করার দরকার নেই। ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে তার নিজের সংস্কৃতিকে রক্ষা করা। কিন্তু যে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব আমাদের রয়েছে তার ভেতর রাজনীতি বড় আকারে প্রবেশ করছে। যেমন, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি না দাঁড়িয়ে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির শ্লোগান তোলেন তারা আসলে ওটারও তেমন সমর্থক নন। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর জন্য তারা এটিকে ব্যবহার করে থাকেন। প্রয়োজনে পশ্চিমা মূল্যবোধকে দাঁড় করান। এর মাধ্যমে সরাসরি না করে তারা ঘুরিয়ে ইসলামের বিরোধিতা করে থাকেন। এ সংঘাত আমাদের দেশে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি কোনোভাবেই তাদের ভালো কাজ নয়। বাংলাদেশের ৯০ ভাগ মুসলিম তাদের সংস্কৃতিকে ইসলামের আলোকে গড়ে তুলবে বা বিচার করবে এটি খুবই স্বাভাবিক কথা। এতে তাদের কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। তারাও তো নামে মুসলিম। আদতে যদি ইসলামের সংস্কৃতি খারাপ কিছু হতো তাহলে এক কথা, কিন্তু তা তো সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে সত্য, শ্লীল। এর আসল সত্য হচ্ছে এটি তাওহীদের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি এক আল্লাহর দুনিয়া তাঁর সঙ্গে শিরককে না মেশানোয় বিশ্বাস করে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শ্লীলতা। অশ্লীলতাকে পরিহার করা। এটি তো মানুষের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর এবং এতে ক্ষতিকর কিছু নেই। আবার এ সংস্কৃতি নাস্তিকতাকে বাতিল করে দেয়। এটিও সঠিক যে নাস্তিকতা কোনো ভালো মানুষ তৈরি করে না। নাস্তিকতা হচ্ছে আল্লাহর উপর বিশ্বাস না থাকা। মানুষ দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়। বেশিরভাগ মানুষ 'যা ইচ্ছা করি' মনোভাব পোষণ করে না। সুতরাং যে সমস্ত ইন্টেলেকচুয়ালরা ইসলামের মূল সংস্কৃতির বিরোধিতা করে তারা সঠিক পথে আছে বলে আমি মনে করি না।

সংস্কৃতি সম্পর্কে সার্বিক কৌশলের প্রশ্নে আমি বলব সংস্কৃতি অত্যন্ত গভীর একটি ব্যাপার। সংস্কৃতিকে অন্য এক জায়গায় বলেছি, এটি আইনের চেয়ে গভীর। একটি সংস্কৃতিকে, এমনকি তার কিছু অংশকেও বদলে ফেলা যুগ যুগের ব্যাপার। এটি আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে। সংস্কৃতি একটি সেনসেটিভ বিষয়। সেজন্য সংস্কৃতি নিয়ে কথাবার্তা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবই সাবধানে করতে হয়। যেমন আমরা ১৯৫২ তে দেখেছি ভাষার ব্যাপারটি কত সেনসিটিভ হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলিম লীগের ব্যর্থতার পেছনে ছিল এ সেনসিটিভিটিকে বুঝতে ব্যর্থ হওয়া। তারা একটি ভুলের কারণে ক্ষমতা হারাল। তারা লোক হিসেবে কোনো অংশে খারাপ ও অযোগ্য লোক ছিল না। তাদের ভিতর দেশপ্রেমও ছিল। কিন্তু যে কোনো কারণে তারা ভাষা ও সংস্কৃতির স্পর্শকাতরতা বুঝতে ব্যর্থ হলো।

www.pathagar.com

মাত্র কয়েকদিন আগের কথা। এবারের বাজেটে পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য মদের উপর থেকে ট্যাক্স কমানো হলো। কিন্তু একদিনের মধ্যে জাতি এমনভাবে বিস্ফোরিত হলো যে সরকার দু'দিনের মাথায় সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হলেন এবং দ্রুত এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিলেন। প্রকৃতপক্ষে তারা সেনসিভিটিকে বুঝতে পেরেছিলেন। ধর্ম যদি সংস্কৃতির অংশ হয় বা সংস্কৃতি যদি ধর্মের অংশ হয়, যেভাবেই আমরা দেখি না কেন সংস্কৃতির কিছু স্পর্শকাতর বিষয় আছে যেগুলো সরাসরি ধর্মের সাথে সম্পর্কিত এবং সম্পৃক্ত। সেগুলো সবাইকে সাবধানে বুঝতে হবে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন দরকার মনে হলে তা খুব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে। খুব দ্রুত তা করা যাবে না। যেটিতে সরকার সহজে জড়াবে না সেটিতে বুদ্ধিজীবীরা মতামত সৃষ্টি করবে। যখন দেখা যাবে বেশিরভাগ মানুষ সে মতামতের দিকে ঝুঁকে পড়ছে তখনই তার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। এটি অনেকটা পলিথিন ব্যাগ তোলার মতো। কিংবা সবাই যেমন তিন স্ট্রোকবিশিষ্ট ইঞ্জিন রাজপথে রাখা সম্ভব নয় বলে একমত হয়েছে বিষয়টি অনেকটা সেরকম। তেমনিভাবে সাংস্কৃতিক বিষয়কে আমাদের খুব সাবধানে হ্যান্ডল করতে হবে। এর স্পর্শকাতরতাকে সব সাংস্কৃতিক কর্মী, ডেমোক্রেটকে বুঝতে হবে যে, এসব বিষয়ে জোর করে দ্রুত কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে তো বাংলাদেশী সংস্কৃতি ও বাঙালী সংস্কৃতির নামে একটি বিতর্ক আছে।

উত্তর : এটি ভাষাগত বিতর্ক। ইংরেজিতে ভাষাগত বিতর্ককে সেমানটিক বলে। কোনটা শুদ্ধ, কোনটা অশুদ্ধ এ নিয়ে তর্ক হতেই পারে। যেমন, আমাদের জাতীয়তা বাংলাদেশী না বাঙালী? এ নিয়ে টেকনিক্যালি বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু এ বিতর্ক যারা করছেন উভয়ের কাছেই আমরা দেখি রাজনীতিই প্রধান। যদি আমি দেশভিত্তিক জাতীয়তার কথা বলি তাহলে আমাদের জাতীয়তা বাংলাদেশী হওয়া উচিত বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। কিন্তু এটি নিয়ে লড়াই করতে আমি পছন্দ করি না। এ বিতর্কের অর্থ হচ্ছে মূল কাজ বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজে জড়িয়ে পড়া। তেমনি বাংলাদেশী সংস্কৃতি আর বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে আমি মনে করি না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষকে বাঙালী বা বাংলাদেশী যাই বলা হোক না কেন তাদের মূল সংস্কৃতির উপাদান তো হচ্ছে একটিই। এটিতে তো কোনো পার্থক্য হচ্ছে না। বাঙালী সংস্কৃতি মানে মুসলিম প্রভাব মুক্ত, পাশ্চাত্য প্রভাব মুক্ত প্রাচীন বাঙালী সংস্কৃতি - এ রকম ব্যাখ্যা যদি কেউ দেয় তাহলেই কেবলমাত্র সে অর্থে বাঙালী সংস্কৃতি আর বাংলাদেশী সংস্কৃতি আলাদা হয়ে যাবে। আবার বাঙালী সংস্কৃতি বলতে যদি সব বাংলাভাষীর সংস্কৃতি, সে যে দেশের বাসিন্দাই হোক এবং বাংলাদেশী সংস্কৃতি মানে যদি হয় বাংলাদেশী এলাকার লোকদের সংস্কৃতি তাহলেও পার্থক্য হবে। তবে তারা যদি বাংলাদেশী ও বাঙালী সংস্কৃতি বলতে বাংলাদেশের ভেতরের সংস্কৃতিকে বুঝায় তাহলে এর ভেতর প্রকৃতপক্ষেই আমি কোনো পার্থক্য দেখি না। এটি শুধু সেমানটিকসের ঝগড়া। ভাষাগত ঝগড়া। সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি একে বাংলাদেশী সংস্কৃতি বলাই ভালো এ অর্থে যে এটি এ এলাকার লোকদের সংস্কৃতি। যেমন আমরা আমেরিকার সংস্কৃতির কথা বলে আমেরিকার লোকদের সংস্কৃতিকে বুঝে থাকি।

আমি মনে করি যারা সচেতন সমাজকর্মী, সাহিত্যসেবী, বুদ্ধিজীবী, সচেতন মুসলিম তাদেরকে এসব অহেতুক বিতর্ক থেকে জাতিকে উদ্ধার করা উচিত। আমরা নিজেরাও এসব বিতর্কে যেন অহেতুক না জড়িয়ে পড়ি। যদি আমাদের সংস্কৃতিতে কোনো আপত্তিকর কিছু থাকে তাহলে তা আস্তে আস্তে সংস্কার করতে হবে। সেটি ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু এর বাইরে গিয়ে অহেতুক বিতর্কে জড়ালে কোনো কাজ হবে বলে আমার মনে হয় না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : কিন্তু এ বিতর্কে আমরা কেন বারবার জড়িয়ে পড়ছি?

উত্তর : আমার মনে হয় কিছু লোক এটি করছে এজন্য যে বিতর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে জাতিকে বিভক্ত করলে তাদের সুবিধা হয়। অথবা যারা বোকা, যারা মনে করে এসব বিতর্ক করাই জাতির স্বার্থ - তারাও এটি করতে পারে। এটি বোকাদেরও কাজ হতে পারে অথবা ধূর্তদের কাজ হতে পারে যারা জাতিকে ভাগ করে রাখতে চায়। যেহেতু এ রকম বিতর্ক চলছে আমার মনে হয় এর পেছনে কোনো না কোনো ধরনের শয়তানী বুদ্ধি কাজ করছে। বাংলাদেশকে কারা ভাগ করে রাখতে চায় সেটিও আমাদের এখানে ভাবতে হবে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের কিছু লোকও ভাবতে পারে আমাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে রাখাই ভালো। যতভাবে আমাদেরকে সমস্যায় রাখা যায় - সেটিও হতে পারে। যেমন অতীতে গ্রাম দেশে কেউ যদি অন্যের ক্ষতি করতে চাইত তাহলে তারা সে পরিবারের মধ্যে নানারকম ঝগড়া লাগিয়ে দিত। নয়তো মামলায় জড়াতো।

প্রশ্ন : সংস্কৃতির স্পর্শকাতরতার প্রশ্নে ধর্মের অবস্থান ব্যাখ্যা করবেন কি?

উত্তর : মুসলিম বিশ্বসহ বিশ্বের সবাইকে জানতে হবে ধর্ম খুবই সেনসেটিভ বিষয়। এজন্য অহেতুক ও উদ্দেশ্যমূলক ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করাটা সঠিক নয়। এর সাম্প্রতিক উদাহরণে আমি আগেই মদের কথা উল্লেখ করেছি। আমাদের ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে সংস্কৃতিও একই রকম সেনসেটিভ। কাজেই যে কোনো দেশের জন্যই ভাষা, সংস্কৃতিকে সেনসেটিভভাবেই গ্রহণ করতে হবে। এর বড় প্রমাণ হলো বাংলা ভাষার সেনসেটিভিটি বুঝতে না পারার কারণে আমাদের ইতিহাসই পরিবর্তন হয়ে গেল। তাই এসব যদি পরিবর্তনের কথা ভাবা হয় তাহলে তাতে খুবই চিন্তার অবকাশ থাকে এবং এজন্য অনেক লম্বা সময় প্রয়োজন। ইসলামপন্থীদের জন্য ভালো হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব এগুলোর সাথে সমন্বয় করার চেষ্টা করা, পরিবর্তন করতে হলে সেটি পরিকল্পিতভাবে, জনগণের পূর্ণ মেন্ডেট নিয়ে করা। সংস্কৃতির স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে মেন্ডেট না নিয়ে কিছু করা যাবে না।

প্রশ্ন : সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধে আঘাত করতে দেখা যায়। আমরা একে কিভাবে মোকাবিলা করতে পারি?

উত্তর : আমাদের সবচেয়ে গভীর জিনিস কোনটি? বিশ্বাস। মানুষ যদি গভীরভাবে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে তাহলে সে সেভাবেই কাজ করবে। কারণ মানুষের কাজ নির্গত হয় তার বিশ্বাস থেকে। অর্থাৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই কাজ হয়। এজন্য আমাদের মূল কাজ হচ্ছে, কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়া। এটিকে আরো সংক্ষেপ করে বলব, তাওহীদের জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়া। ইসলামের মূল পিলার হচ্ছে তাওহীদ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর গোটা কুরআন এর ব্যাখ্যা। এজন্য আমাদের খুব সুন্দরভাবে মানব জাতিকে তাওহীদ বোঝাতে হবে। গভীরভাবে তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য বোঝাতে হবে। আমরা যদি আমাদের ৯০ ভাগ মুসলমানের মনে তাওহীদের উপলব্ধি পুরোপুরি বোঝাতে পারি তাহলে ইসলাম বিরোধী সকল উপাদান আমাদের কালচার তথা মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর কালচার থেকে চলে যাবে।

আর আগ্রাসন শব্দটিকে ঠিকই ধরা হয়েছে। এক গ্রুপ পাশ্চাত্য থেকে সংস্কৃতি আমদানীকে নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য সঠিক ভাবতে পারে। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ আমাদের জন্য আগ্রাসন। আমরা মুসলিম এবং ইসলামে বিশ্বাসী বলে এর বিপরীত কোনো জিনিস আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমরা ইসলাম, তাওহীদ বিরোধী ও শিরক মনোভাবসম্পন্ন কোনো জিনিসকে আমাদের কালচারে আসতে দিতে পারি না। এটিকে যদি আগ্রাসন নাও বলি তবুও এর মোকাবিলার দায়িত্ব আমাদের। এটি

www.pathagar.com

মোকাবিলা বা প্রতিরোধ করার জন্য সরকারের যেসব ব্যবস্থা নেয়া দরকার তা নেয়া উচিত। জনগণকে এ ব্যাপারে কাজ করা উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের চেতনা বৃদ্ধি না করে এটি কখনো করা সম্ভব নয়। মানুষ যদি অসচেতন হয় তাহলে একটি বন্ধ ঘরের সব দরজা-জানালা খুলে দিলে বাতাস যেমন হুহু করে ঢুকে পড়ে আমাদের সংস্কৃতিতেও তেমনি নানা জাতীয় উপাদান ঢুকে পড়বে। কিন্তু আমাদের ঘর যদি বাতাসে ভরা থাকে তাহলে সেটি হবে না। অথবা যদি এভাবে বলি - আমরা যদি ইসলামের জ্ঞানে জ্ঞানী হই, ইসলামের সত্য, ইসলামের সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যদি আমরা সচেতন হই বা সচেতনতা বাড়াই তাহলে আমি মনে করি পাশ্চাত্য কালচার আমাদের কিছু করতে পারবে না।

ইসলাম অত্যন্ত শক্তিশালী একটি বিষয়। ইসলামের আধ্যাত্মিক উপাদান খুব মজবুত। এর মধ্যে এমন সব উপাদান ও নীতিমালা রয়েছে যা মানবজাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, বড় করতে পারে। এটি এমন একটি জিনিস, যে কোনো ছোটখাট আক্রমণাত্মক বা অপসাংস্কৃতিক বিষয়কে বাহ্যিকভাবে বড় বলে মনে হলেও তা আসলে এর কিছুই করতে পারবে না। ইসলামের পতনের যুগেই তো পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের জোয়ার এসেছে। তাই আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ ইসলামকে নির্মূল করতে ক্রুসেডাররা পারেনি। এতো বড় ইনভেশন দুনিয়াতে কখনো হয়নি যা চেঙ্গিস খান করেছিল। সেই চেঙ্গিস খান ইসলামের কিছুই করতে পারেনি। উল্টো ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এমনকি প্যালেস্টাইন দখল করেও তা তারা হাতে রাখতে পারেনি। দেড়শ বছরের ইম্পেরিলিজমের আক্রমণের নির্মমতাও ইসলামকে শেষ করতে পারেনি।

তাই আমি মুসলিম বিশ্বকে বলতে চাই ইসলাম ইজ সো স্ট্রং, সো গ্রেট - একে কেউ কিছু করতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ শুধু একটি জিনিস আমাদের কাছে চান তা হলো আমরা যেন আমাদের কাজ করে যাই। তাই আমরা যদি তাওহীদের জাগরণ ঘটাতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহুতায়ালা, ইসলামী কালচারের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব নয়। এভাবে যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে কেবল ইসলাম বিরোধী কালচার তো আসতেই পারবে না, কুসংস্কারও থাকবে না।

প্রশ্ন : আমাদের সাংস্কৃতির মূল ভিত্তি হিসেবে কি তাওহীদকে গ্রহণ করতে হবে?

উত্তর : আমার তাই মনে হয়। তাওহীদ ইসলামের সবকিছুরই মূল। আমাদের লেখক, কবিরা যদি তাওহীদ বোঝে তাহলে তাদের ইসলাম সম্পর্কে আর কিছু বলতে হবে না। তাদের লেখা অটোমেটিক ইসলামিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : এদেশের মানুষের সাংস্কৃতির মূল উপাদান হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এটি কেন?

উত্তর : এর কারণ বিভিন্ন। মিডিয়ায় যারা কাজ করছেন তারা আমাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। তারা যে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এগিয়েছেন সে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে বড় করে দেখানো হয়নি। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, ব্যাপ্তি বা ব্যাপকতাকে দেখানো হয়নি। তারা ইসলামকে সাধারণ একটি ধর্মই জেনে এসেছে। তাই শুধু নয়, তারা একটি নেগেটিভ আইডিয়া নিয়েই এগিয়েছে। এটি একটি বড় কারণ, যে কারণে ইসলামকে তারা পজেটিভভাবে নিতে পারতেন, তা নিতে পারছেন না। দ্বিতীয়ত, আমাদের বিগত ৫০ বছরের রাজনীতিতে সেকিউলারিজমের অনুসরণ করা হয়েছে। পাকিস্তান আমলে ইসলামিক রিপাবলিক ছিল। কিন্তু সে আলোকে আইন, শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি হয়নি। তার ফলে যেসব লোক তৈরি হয়েছে তারা ইসলামী মনা হয়ে গড়ে ওঠেনি।

www.pathagar.com

মিডিয়ার বেশিরভাগ লোকই যদি ইসলামিক মাইন্ডের হয় তাহলে মিডিয়ার বিষয়ও ইসলামের আলোকে হয়ে যাবে। এটি করার উপায় হচ্ছে যারা ইসলামী মুভমেন্ট করেন, যারা ইসলাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন তাদের দায়িত্বই হচ্ছে বেশি বেশি লোক তৈরি করা। এটি সকল ক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য। এছাড়া এর কোনো সত্যিকার সমাধান নেই। যারা এখন আছেন তাদের ভেতর পরিবর্তন করা কঠিন। বর্তমান অবস্থায় ১০/১৫ ভাগ পরিবর্তন হতে পারে মাত্র। এটি চেষ্টার মাধ্যমে করা সম্ভব। তবে এ সমস্ত বয়স্ক লোককে ইসলামিক করা সহজ কথা নয়। তারা বিশ্বাসে হয়তো মুসলিম থাকবে, অনেকে নামাজও পড়বে কিন্তু যাকে আমরা ইসলামাইজেশন বলি- ইসলামকে আত্নস্থ করা, সেটি তাদের জন্য খুব কঠিন ব্যাপার। সেটি এ বয়সে আর সম্ভব হয় না। এসব গভীর বিষয় ইসলামিক মুভমেন্টকে বুঝতে হবে। আমাদেরকে নতুন লোক তৈরি করতে হবে। শুধু রাজনৈতিক কর্মী তৈরি করলেই হবে না। অসংখ্য সাংস্কৃতিক কর্মী, প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মী, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কর্মী, শিক্ষক, খেলাধুলার লোক তৈরি করতে হবে। ভালো ছবি বানাতে ফিল্মের জন্য লোক তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই আমাদের লোক তৈরি করতে হবে। আর লোক তৈরি না করে আমাদের মুক্তি নেই। প্রসঙ্গত বলতে হয়, আমাদের দেশে সেকিউলারিজম পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে শুরু হয়ে আশির দশক পর্যন্ত বাড়তে থাকে। কিন্তু এরপর থেকে সে সংখ্যা কমে আসে। বর্তমানে ইসলামের কাজের অবস্থা ভালো। কাজেই আমরা যদি সেভাবে কাজ করতে পারি বাকিটুকুও করা সম্ভব।

প্রশ্ন : চলচ্চিত্র একটি প্রভাবশালী মিডিয়া। চলচ্চিত্র বিনোদনের একটি বড় মাধ্যমও। কিন্তু এটি আজ অশ্লীলতায় পূর্ণ। এর থেকে উত্তরণের উপায় কি?

উত্তর : এর থেকে উত্তরণ খুব কঠিন। তবে আমার মনে হয় আমাদের একটি অলটারনেটিভ দিতে হবে। আমি মনে করি ইসলামিস্টদের চলচ্চিত্র বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করতে হবে এবং একে বৈধ ও প্রয়োজনীয় মিডিয়া হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। চলচ্চিত্রকে শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষিকাজে ব্যবহার করতে হবে এবং সর্বোপরি বিনোদনের কাজে ব্যবহার করতে হবে। হিজাব কোনো সমস্যা নয়। ইরানীরা যেভাবে ছবি তৈরি করছে সেভাবে ছবি তৈরি করা সম্ভব। কো-একটিংএ সমস্যা নেই। কারণ এ কো-একটিং একা একা হচ্ছে না। যদিও ছবিতে আমরা দেখছি একটি ছেলে একটি মেয়ে কথা বলছে, আসলে তারা স্যুটিং এর সময় বহু মানুষের সামনে কথা বলছে। কারণ সেখানে ক্যামেরাম্যান, প্রযোজক, পরিচালক, সম্পাদক রয়েছেন, দর্শক রয়েছেন। ইসলাম যেটিকে খুলুয়া বলে, অর্থাৎ নিভৃতিতে একা থাকা - সেখানে স্যুটিং এর কাজ একা কিংবা গাইরে মাহরেমের মধ্যে হচ্ছে না। আবার গান অশ্লীল না হলে তাও থাকবে। অশ্লীলতা যুক্ত না হলে বাদ্যও কোনো সমস্যা নয়। এমত আমার নয়। ইরানীরা এটি অনুসরণ করছে। ড. কারযাভীও এমত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন - ফিল্ম, অভিনয়, গান, বাদ্য সমস্যা নয় যদি তা অশ্লীল না হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিষেধাজ্ঞাকে অশ্লীলতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরতে হবে।

অলটারনেটিভ দেয়ার জন্য আরো অনেক কাজ আছে। আমাদের অবশ্যই টিভি চ্যানেল লাগবে যেখানে আমরা এসব ছবি দেখাবো। যদি ইসলামী সরকার হয় তাহলে তারা বাজে চ্যানেল বন্ধ করে দেবে। এসব ক্ষেত্রে আমি কোনো সমস্যা দেখি না। আসলে সমস্যা আমাদের মনে। আমরা ইসলামের অবজেক্টিভ ঠিক বুঝতে পারছি না। ইসলামকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সব মিডিয়া, মিনসকে ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, তুমি তোমার সর্বাত্মক সত্তা দিয়ে এবং সমস্ত মাল দিয়ে জিহাদ কর।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি তাহলে কি এ সেক্টরে ইসলামিস্টদের বিনিয়োগ করতে বলবেন?
উত্তর : অবশ্যই, অবশ্যই। তাদেরকে বেশি বেশি বিনিয়োগ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন : আমাদের সংস্কৃতিতে অনেক সময় কোনো কিছুকে চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতিকে তার স্বাভাবিক নিয়মে চলতে দেয়া উচিত, না মাঝে মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত?
উত্তর : নিয়ন্ত্রণ খুব কম হবে। সাধারণভাবে ভাষা, সংস্কৃতি এগুলো নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হওয়া উচিত। এটি নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর। যদি একটি সুস্থ সমাজ হয় এবং সবকিছু সুস্থ থাকে তাহলে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু যদি দেখা যায় একটি অসুস্থ জিনিস বের হচ্ছে তাহলে সেখানে জাতির পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত যাতে ফ্রিডমের নামে সবকিছু না ঢুকে পড়ে। সবকিছু আজেবাজে না হয়ে যায়। সেখানে নিয়ন্ত্রণ থাকাকেই আমি সঙ্গত মনে করি। মানুষ যেন যা তা করতে না পারে। নোংরামি, নগ্নতা, কুশ্রী জিনিস দেখাতে না পারে।
প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি সুন্দর হওয়ার কথা। সংস্কৃতির অন্য অর্থ হচ্ছে সুন্দরের চর্চা, সৌন্দর্যের চর্চা। সেখানে অসুন্দরকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করতে পারি। তার জন্য একটি সীমারেখা অবশ্যই টানতে হবে। আইনের মাধ্যমে সে সীমারেখা বদলাতে জাতিকে কাজ করতে হবে। সংস্কৃতির অপব্যবহারের সম্ভাবনা আছে বলে কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার জাতির থাকতে হবে। শুধু সংস্কৃতি কেন, কোনো কিছুই একেবারে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না। ব্যবসাকে লাগামহীন না করে তারও উপর কতগুলো নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়েছে - কোনটা করা যাবে, কোনটা করা যাবে না। আমাদের কোনোভাবে অশ্লীলতা, অসুন্দর, জাতি বিদ্বেষ, ধর্ম বিদ্বেষ ছড়ানো উচিত নয়। কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে আঘাত করা উচিত নয়। খেলাধুলার মতো এখানেও জাতির জন্য একটি রেফারি বা আম্পায়ার কমিটি থাকতে হবে, যারা এটি দেখাশুনা করবেন। এ কমিটি বাড়াবাড়ি না করে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে কাজ করবেন।

অর্থনীতি

উন্নয়নের জন্য আমাদের জিডিপি কমপক্ষে ৭ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে

প্রশ্ন : বাংলাদেশের ব্যাকিং খাতের ত্রুটিগুলো কি কি? কিভাবে সেসব ত্রুটি কাটিয়ে ওঠা যায়?
উত্তর : বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল কু-ঋণ। সেটি আদায় হচ্ছিল না। এর পরিমাণ ৩০%-৪০% এ পৌঁছে গিয়েছিল। ১৯৯১-৯২ সালে সরকারের একটি সংস্কার প্রোগ্রাম করা হয়। আমি শুরু থেকে প্রায় ৫ বছর এর নেতৃত্ব দেই। এ প্রোগ্রামের ফলে ব্যাংকিং সেক্টরে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। ব্যাংকের মূলধনের ভিত্তি কি হবে তা ঠিক করা হয়। ঋণ শ্রেণীকরণের ভিত্তি পরিবর্তন করে তা আরো শক্ত করা হয়। যার ফলে আগে যেখানে দেরিতে কু-ঋণ ধরা পড়ত, সেখানে আরো দ্রুত কু-ঋণ সনাক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়। এর সাথে আরো বেশ কিছু কাজ করা হলো। সে ভিত্তিতে ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে যার ফল এখন আমরা পাচ্ছি। আমার মনে হয় বাংলাদেশের ব্যাংকিং সিস্টেম আগের তুলনায় অনেক ভালো।
উন্নতির শেষ নেই। দুর্নীতি আছে সেটিও অস্বীকার করা যাবে না। সিবিএ আছে। তাদের একটি অপপ্রভাবও আছে। অফিসারদের মধ্যে দুর্নীতি আছে। রাজনৈতিক প্রভাব আছে। এসব সত্ত্বেও ব্যাংকগুলো কতগুলো শর্ত পূরণ না করলে ঋণ দিচ্ছে না। এটিকে Lending

www.pathagar.com

Risk Analysis (LRA) বা Credit Risk Analysis. (CRA) বলা হয়। এতে প্রত্যেকটি ঋণ প্রস্তাবকে খুব গভীরভাবে কতগুলো মূলনীতির আলোকে পরীক্ষা করা হয়। এতে তদ্বিরকারকদের LRA বা CRA রিপোর্ট অনুযায়ী ঋণ দেয়া সম্ভব নয় বলে জানানো সহজ হয় বলে প্রভাবটা কমে আসছে।

সরকারী ব্যাংকের অবস্থা খারাপ। এসবের লোকসানী শাখা বন্ধ করে দেবার কথা বলা হচ্ছে। জনবল কমানোর কথা বলা হচ্ছে। বিদেশীরা এসব শর্ত দিচ্ছে এবং সরকার এগুলো মেনে নিয়েছে। তারপরও সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অবস্থা একদিকে খারাপ আবার অন্যদিকে তারা জাতীয় পারপাস সার্ভ করছে। অনেক ক্ষেত্রে সরকার তাদেরকে বাধ্য করেছে ঋণ দিতে, যা প্রাইভেট সেক্টর দিত না। যেমন টেক্সটাইল শিল্পকে বাঁচাতে সরকার ঋণ দিতে বলে। জুট মিলে ঋণ দিতে বলে। সরকার অন্য ব্যাংকগুলোকে হুকুম দিতে পারে না। কিন্তু নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংককে নির্দেশ দিতে পারে। শিল্প না বাঁচালে দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই সরকার সরকারী কমার্শিয়াল ব্যাংকের কাছে টাকা চায়। সেখানে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন শিল্প-কারখানা বাঁচাতে গিয়ে ঋণ দিতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর দূর্বলতার মূল কারণ হচ্ছে সরকারী ডাইরেকশন। দুর্নীতি তো আছেই।

তবে সরকারী কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো এত সমস্যাগ্রস্থ নয় যতটা বাইরে বলা হয়। যদি সরকারী হস্তক্ষেপ না থাকত তাহলে এতটা সমস্যাও হতো না। এখন এটি বলা কঠিন যে, এসব প্রাইভেটাইজ করা হবে কিনা? করতে পারে। কিন্তু তার একটি পলিটিক্যাল মূল্য আছে। তা দিতে সরকার রাজি নয়। সাধারণ ধারণার অভাবে গোটা জাতি চাইবে না সবগুলো ব্যাংকই প্রাইভেট ব্যাংকে পরিণত হোক। আসলে পলিটিক্যাল প্রাইস কোনো সরকার দিতে পারে না। এটি দেয়ার মতো কোনো পার্টি নেই। বর্তমানে যে ৩০/৪০ হাজার লোক সরকারী ব্যাংকগুলোতে আছে প্রাইভেট হলে তাদেরকে নতুন কর্তৃপক্ষ তখন নাও রাখতে পারে। সেটিও একটি জটিল প্রক্রিয়া। সেখানে অবসরের প্রশ্নে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্যও প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা এ লোকগুলোকে ছেড়ে দেয়া। সেটি তো একেবারেই সরকারের জন্য ডিফিকাল্ট সিদ্ধান্ত। আমাদের দেশে তাতে বিরাট প্রশ্ন দেখা দেবে। আমরা দেখেছি আমেরিকার এয়ারলাইন্সগুলো হাজার হাজার লোক ছাঁটাই করেছে কিন্তু কেউ প্রটেস্ট করেনি। এ সিস্টেম তারা গড়ে তুলেছে। সত্যিই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার ইচ্ছাকেই ওরা মেনে নিয়েছে। তাদের সিস্টেম প্রাতিষ্ঠানিক রূপে দাঁড়িয়েছে।

যাই হোক ব্যাংকিং সেক্টরের দুর্বলতা আছে। কিন্তু আমি বলব, সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং এর অবস্থা ভালো। এখানে যোগ্য ম্যানপাওয়ার আছে। দেশে কু-ঋণের সমস্যা ক্রমেই কমছে। পলিটিক্যাল প্রভাব, দুর্নীতি, সিবিএ সমস্যা হঠাৎ করেই বন্ধ হবে না। আজ থেকে ৪০ বছর আগে যখন উন্নয়নের শুরু হয় তখন এদেশে উন্নত কোনো প্রাইভেট সেক্টর ছিল না। শিল্প সম্পর্কে জানা কোনো শিল্পপতি ছিল না। সে সময় সরকার পাওয়ার, ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড সৃষ্টির মাধ্যমে কাজ শুরু করে। কিন্তু এখন সরকারী সেক্টরের তেমন ভূমিকা আছে বলে মনে হয় না। এখন এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (বিএডিসি), সুগারমিল এসব শিল্প সরকারের কাছে রাখার আর কোনো যৌক্তিকতা নেই।

প্রশ্ন : অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন আমাদের দেশের বেসরকারীকরণ শিল্পনীতি হওয়া উচিত?

উত্তর : বর্তমান সময়ের ডিমান্ড তাই। এসব বিষয় সময়ের সাথে সম্পর্কিত। একটি সময় ছিল যখন সরকারীকরণের দরকার ছিল। এখন আবার বেসরকারীকরণ দরকার। আবার

www.pathagar.com

একটি সময় এমন আসতে পারে যে সরকারকে কিছু ইন্ডাস্ট্রিজ নিয়ে নিতে হতে পারে, যদি তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়।

প্রশ্ন : মুদ্রাস্ফিতিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

উত্তর : মুদ্রাস্ফিতিকে তো কোনো ভালো জিনিস বলা যায় না। মূল্য স্থির থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। এটি যদি থাকে তাহলে নানাধরনের সামাজিক সংঘাত থেকে বাঁচা যায়। যেমন- সরকারী, বেসরকারী বেতনভুক্ত কর্মচারী, যাদের আয় সীমিত - যদি মূল্য বেড়ে যায় তাহলে এ লোকজন সাথে সাথে এফেক্টেড হয়। পণ্যের দাম বেড়ে যায়। রিক্সাওয়ালা তার শ্রমের দাম বাড়াতে পারে। যদিও বাস মালিকরা সংঘাতের মধ্যে পড়ার ভয়ে অনেক সময় ভাড়া বাড়াতে পারে না। কিন্তু এমন হতে পারে, মূল্য বাড়ার ফলে উল্টো কতগুলো পণ্যের ডিমান্ড কমে যাবে। কারণ দাম বাড়ালেও ক্রয় ক্ষমতা না বাড়ায় মানুষ প্রয়োজন কমিয়ে দেয়। যেমন, তরকারী কম হলেও চলে। কাজেই সেখানে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনকারী সমস্যায় পড়ে। সুতরাং মূল কথা হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি কোনো ভালো জিনিস নয়।

ইকোনোমিক্সের থিওরিতে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কিনসের কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৩০ সালে আমেরিকার মহামন্দার সময় তিনি এর থেকে উত্তরণের একটিই রাস্তা বের করলেন যে, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য সরকারকে টাকা খরচ করতে হবে। ডিমান্ডকে চাঙ্গা করলে প্রোডাকশন চাঙ্গা হবে। ডিমান্ড চাঙ্গা করার জন্য লোকদের হাতে টাকা পৌঁছাতে হবে। আর টাকা পৌঁছানোর জন্য সরকারকে বললেন নানা ধরনের কাজ করার জন্য।

মুদ্রাস্ফীতির ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে ইসলাম প্রাইস লেভেল স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করতে বলে। সূরা মুতাফ্ফিফীন এ আছে, তোমরা মাপে কম দিও না। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় টাকা প্রসঙ্গ এসে যায়। টাকার চারটি কাজের মধ্যে একটি হলো এর একটি ক্রয় ক্ষমতা আছে। ১৫০ টাকায় যেখানে দুই সের গরুর গোস্ত কেনা যেত সেখানে মুদ্রাস্ফিতির ফলে দেড় সের কেনা সম্ভব হয়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির ফলে মাপে কম দেয়া হয়। কিন্তু এটি ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ নয়। আমরা ইচ্ছা করে মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবো না। আমরা মাপে কমবেশি দেব না। মূল্যস্থিতি বজায় রাখব। কিন্তু সমাজের সার্বিক চাহিদা যদি কিছু অর্থের দাবী করে, যেটি কেইনস বলেছেন তাহলে সেটিও করতে হবে। সামাজিক স্বার্থ রক্ষা করার ইসলামের যে লক্ষ্য, বাসনা বা জনকল্যাণ তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মুদ্রাস্ফীতির মূল কথা হবে অপ্রয়োজনে মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো যাবে না। কাজেই মূল্যস্তর স্থির রাখার চেষ্টা করে যেতে হবে। এরপরও মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে। কারণ আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতি আমাদের মুদ্রাস্ফীতিতে প্রভাব ফেলবে। আমাদের লক্ষ্য হবে যারা মূল্য বাড়াতে পারে না তাদেরকে সাহায্য করা। এজন্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন প্রতি বছর রিভিউ করা উচিত। যে পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি হবে তা বাড়িয়ে দেয়া উচিত। এটি করা সম্ভব। এটি করতে বারবার পে স্কেল করতে হয় না। ইসলামী রাষ্ট্রে এগুলো করা জরুরী হবে। তবে তা অবশ্যই নির্ভর করবে যারা ক্ষমতায় আসবেন তাদের প্রজ্ঞা আর বড় হৃদয়ের উপর। আমি আশা করি তারা বুদ্ধিমান, জ্ঞানী লোকই হবেন।

প্রশ্ন : আমাদের এনিউয়্যাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এডিপি) সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমাদের উন্নয়ন প্রোগ্রাম দুটি মাধ্যমে হয়। একটি সরকারী ব্যয়ে, আরেকটি প্রাইভেট মাধ্যমে। সরকারী ব্যয় যদি ২০ হাজার কোটি টাকা হয় সেখানে প্রাইভেট সেক্টরে ব্যয় দাঁড়ায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। এখন আমাদের সে ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান নেই। সেটি

www.pathagar.com

থ্রি ইয়ার্স প্ল্যান হয়েছে। উন্নয়নের জন্য আমাদের জিডিপি গ্রোথ বর্তমান অবস্থা থেকে কমপক্ষে ৭%-এ যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে ১০ বছরে আমাদের ইনকাম দ্বিগুণ এবং ১৫/২০ বছরে প্রায় চারগুণ হওয়া সম্ভব। বর্তমানে এটি ৫% আছে। দ্বিতীয়ত এটি আমাদের নিজস্ব রিসোর্সের মাধ্যমে করার চেষ্টা করতে হবে। তার জন্য ট্যাক্সেশন বাড়াতে হবে এবং তা পুরোপুরি আদায় করতে হবে। আমাদের জাতিকে মানতে হবে যে আমাদের জিডিপি এবং ট্যাক্স মাত্র ১০% যা সুইডেনে ৫০%। তারা গোটা জিডিপির ৫০% ট্যাক্স নিয়ে নেয়। আমাদের এ ১০% কে বাড়িয়ে অন্তত ১৫%-এ নিতে হবে। তাহলে আমরা ট্যাক্সের মাধ্যমে এ উন্নয়ন বাজেট বড় করতে পারব। অন্যদিকে আমাদের রেভিনিউ খরচ কমাতে হবে। সরকারী কর্মচারী কমানোর দিকটিও বিশেষ বিবেচনায় রাখতে হবে। এডিপির আরেকটি দিক হচ্ছে বৈদেশিক ঋণ। বৈদেশিক ঋণ সহজ শর্তে পেলে নেয়া ভালো। এখন যেমন খুব বেশি অযৌক্তিক শর্তে দেয়, তা না নেয়া ভালো। ঋণ নিতেই হবে তার কোনো কথা নেই। সেজন্য সহজ শর্তে না পেলে না নেয়া ভালো। কারণ ঋণ দাসত্ব সৃষ্টি করে। এটি এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

চতুর্থত, আমাদের দেশে দারিদ্র্য যেহেতু বড় ইস্যু এজন্য এডিপিতে পরিষ্কার কর্মসূচি থাকা উচিত। এটি ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে না। এজন্য টার্গেট করে দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয় করার কথা আমি বলেছি। এতে প্রতি এডিপির মাধ্যমে অন্য সব স্বাভাবিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সমস্যার দ্রুত ও স্থায়ী সমাধান সম্ভব। যেমন রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা ছিন্নমূল অসহায়দের পুনর্বাসন কিংবা ঢাকা শহরে রিক্সা সমস্যা। কোথায় বাজেট বাড়বে বা কমবে তা সরকার নির্ধারণ করবে। তবে সায়েন্স এন্ড টেকনোলজিতে আমাদের বাজেট বাড়ানো উচিত। কারণ আমাদের মুসলিম বিশ্বের অগ্রগতি প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করবে শিক্ষার উপরে, সায়েন্স টেকনোলজি ডেভেলপ করার উপরে। রেভিনিউ বাজেট ও ডেভেলপমেন্ট বাজেট বাড়াতে হবে। এগুলোর উন্নতির উপর নির্ভর করবে অর্থনীতির উন্নয়ন। ডিফেন্সের উন্নয়ন, দেশের উন্নয়ন। এগুলো অত্যন্ত লিংকড বিষয়। একটির উন্নয়নের সাথে অন্যটির উন্নয়ন জড়িত।

প্রশ্ন : ভ্যাটকে (VAT) কিভাবে আরো আধুনিক করা যায়?

উত্তর : আসলে ভ্যাট একটি খুবই আধুনিক ট্যাক্স সিস্টেম। প্রথমে এটি খুচরা পর্যায়ে না নিয়ে ম্যানুফেকচারিং পর্যায়ে নেয়া হলো। ৮/১০ বছরের প্রস্তুতি নিয়ে খুচরা পর্যায়ে যাওয়ার কথাই ভাবা হয়েছিল। খুচরা পর্যায়ে যেতে পারলে পুরো ট্যাক্সের বেনিফিট পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম থেকে VAT এর যে সৌন্দর্য তা নষ্ট করা হয়েছে। ভ্যাট ব্যবস্থার আসল দিক সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গেছে। তার ফলে এটি একটি সেল (বিক্রয়) ট্রাক্সের রূপ ধারণ করেছে। তাই বর্তমানে যাই থাকুক না কেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে মূল VAT সিস্টেমে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তাহলে আমরা অনেক বেশি ট্যাক্স পাব।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আহমদ হোসেন মানিক ও ওমর বিশ্বাস
প্রকাশকাল : প্রয়াস, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৪

www.pathagar.com

মানসিকতাই আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে বড় সমস্যা

প্রশ্ন : আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত কি কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং এই সমস্ত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারণা দেবেন কি?

উত্তর : এফএসআরপি এর আওতায় এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ :

(ক) আগাম ও ঋণের উপর সুদের হার নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা এবং সুদের হারকে নমনীয় করা, যাতে করে সম্পদের বন্টন উন্নত হয়।

(খ) সরাসরি, ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে পরোক্ষ আর্থিক হাতিয়ার (Indirect Monetary Instrument) এর মাধ্যমে ঋণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা।

(গ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের নিয়মনীতিতে স্বাধীনতা দেয়া।

(ঘ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংক সুপারভিশন আরো শক্তিশালী করা।

(ঙ) ব্যাংকসমূহের জন্য সঠিক হিসাবনীতি প্রবর্তন।

(চ) ঋণ শ্রেণীবিন্যাসকরণ, প্রভিশনিং ও স্থগিত সুদ প্রবর্তনকরণ।

(ছ) ব্যাংকের মূলধন উন্নতকরণ।

(জ) ঋণ আদায় সংক্রান্ত আইনগত কাঠামো শক্তিশালী করা।

(ঝ) প্রচলিত ব্যাংক কোম্পানি আইন/নিয়ম যুগোপযোগী ও শক্তিশালী করা।

(ঞ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিআইবিএম'কে আরো শক্তিশালী করা। উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণও এ কর্মসূচির অন্তর্গত। ব্যাংকসমূহে কম্পিউটারায়ন, M/S প্রবর্তন, পারফরম্যান্স প্লানিং, নতুন লেজার প্রবর্তন, Lending Risk Analysis করণ ও বাংলাদেশ ব্যাংকে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো প্রতিষ্ঠাকরণ।

বিগত তিন বছরে সুদের হার নির্ধারণ নীতিমালার উল্লেখযোগ্য সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় সকল খাতে সুদসীমা সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষি এবং রফতানি ব্যতীত অন্যান্য সকল খাতে ঋণদানে সুদের হার নির্ধারণে সার্বিক ক্ষমতা তফসীলি ব্যাংকগুলোর উপর নীতিগতভাবে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সুদের হার পর্যালোচনা এবং বাণিজ্যিক বা আর্থিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে তা রদবদল করার জন্য তফসীলি ব্যাংকসমূহ নীতিনির্ধারণ কমিটি গঠন করেছে। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাংকের সুদের হারে তারতম্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

ঋণ গ্রহীতাদের ন্যায় আমানতকারীদের ক্ষেত্রেও সুদের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতি ও সঞ্চয়কারীদের ধনাত্মক প্রকৃতি সুদ প্রাপ্তি বিবেচনায় রেখে আমানতের উপর সুদের হার নির্ধারিত হয়ে আসছে। এর আলোকে সর্বনিম্ন সুদহার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করে বিগত মার্চ ১৯৯৪ সালে সঞ্চয়ী ও মেয়াদী আমানতের উপর সুদের হার যথাক্রমে ৪.৫% ও ৫%-এ নির্ধারণ করা হয়। সঞ্চয় ও মেয়াদী আমানতের উপর সুদের হার হ্রাসের ফলে ব্যাংকসমূহের আমানত সংগ্রহের জন্য যে ব্যয় হ্রাস পায় তার সম্পূর্ণটাই ব্যাংকগুলোর আগামের সুদের হার হ্রাসে প্রতিফলিত হয়। বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাংকের সুদের হার প্রচারের ফলে ব্যাংকসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়।

অর্থ সরবরাহ ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক পরোক্ষ মুদ্রানীতি যথা ব্যাংক রেট, ব্যাংক আমানতের উপর নগদ রক্ষিতব্য জমা (Cash Reserve Requirement), আইনানুগ রক্ষিতব্য তরল সম্পদ (Statutory Liquidity Requirement), খোলা বাজার কার্যক্রম (Open Market Operation) ইত্যাদি গ্রহণ করেছে। খোলাবাজার কার্যক্রম আরো কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার জন্য ৯১ দিন মেয়াদী বাংলাদেশে ব্যাংক বিল চালু করা হয়েছে এবং তা মাসিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ১৯৯০ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক নিয়মিতভাবে নিলামের মাধ্যমে ইস্যু করে আসছে। মুদ্রা, ঋণ পরিস্থিতি এবং ব্যাংকিং সেক্টরের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে সঠিক নীতি গ্রহণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর মহোদয়ের সভাপতিত্বে মনিটরি পলিসি কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে অন্তত একবার করে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে আসছে।

আর্থিকখাত সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও মূলধন বাজারের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে সরকারি ট্রেজারি বিল/বণ্ড/সিকিউরিটি ইস্যুসহ অন্যান্য ব্যবস্থার ধারাবাহিক পর্যালোচনার প্রয়োজনে সরকার সরকারি ঋণ গ্রহণ কর্মসূচি এবং অভ্যন্তরীণ দায় ব্যবস্থা নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছেন। অর্থ বিভাগের সচিব এ কমিটির প্রধান।

আর্থিকখাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ব্যাংকগুলোর ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক অধিকতর নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে এবং অধিকতর কার্যকরভাবে ওপেন মার্কেট অপারেশন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারছে।

ব্যাকগুলোর পরিদর্শনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে আরো বেশি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যাতে তারা বিশেষ নিরীক্ষা/পরিদর্শনসহ জরিমানা আদায় করতে পারে। কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে দেয় একক ঋণ ও কোনো ব্যাংকের পরিচালককে প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া আরো অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

পরিদর্শন ব্যবস্থাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে ক্রম চলমান রিপোর্ট ভিত্তিক পরিদর্শন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন বিভাগকে শক্তিশালী করে পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে যাতে করে তারা ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের গুণগতমান ও মূলধনের পর্যাপ্ততা সঠিকভাবে যাচাই করতে পারেন। এফএসআরপি-এর আওতায় একজন আন্তর্জাতিক পরামর্শকের মাধ্যমে উন্নততর রিপোর্ট ভিত্তিক (Off-site) ও সরেজমিন (On-site) ব্যাংক পরিদর্শন পদ্ধতি গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। ইতোমধ্যে তিনি একটি বিশেষ রিপোর্ট পেশ করেছেন, যা বাস্তবায়নের জন্য সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজ তদারকির জন্য একটি বিশেষ সেল বাংলাদেশ ব্যাংকে গঠন করা হয়েছে এবং পরিদর্শন কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ব্যাংকে 'ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে, যা ঋণের ক্ষেত্রে শ্রেণী বিন্যাসিত তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর পারফরম্যান্স প্লানিং সিস্টেম (PPS), ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS), নতুন ঋণ খতিয়ান, ঋণপ্রদান ঝুঁকি বিশ্লেষণ পদ্ধতি Lending Risk Analysis ইত্যাদি চালু করা হয়েছে, যাতে করে ব্যাংকগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নত হয়। একই লক্ষ্য সামনে রেখে নুতন ফরম, পদ্ধতি, ম্যানুয়াল ইত্যাদি চালু করা হয়েছে। এ সকল বিষয়ে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে।

১৯৮৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর থেকে নতুন ঋণ শ্রেণীবিন্যাস ও প্রভিশনিং প্রথা চালু হয়েছে এবং প্রতি বছর ব্যাংকগুলো নিজেরাই নিজেদের অবস্থান বুঝতে পারছে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছে। এফএসআরপি-এর কার্যক্রম শুরু হওয়ার পরে যে সকল নতুন ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর বিপরীতে ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়ে আসছে।

স্থগিত সুদের পৃথক হিসাব সংরক্ষণের প্রথা প্রবর্তন করে ব্যাংকগুলোতে প্রকৃত লাভ নির্ণয়ের পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। এতে ব্যাংকসমূহের ঋণ যেন কুঋণে পরিণত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখছে এবং ঋণের উপর অর্জিত সুদ আদায়ের চেষ্টা করছে। ঋণদান ক্ষেত্রে কঠোর শৃঙ্খলা আনা ছাড়াও ঋণ খেলাপীদের নতুন ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে অধিকতর কঠোর নিয়ম কানুন বলবৎ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক লেনদেন সমস্যা দেখা দিলে যাতে করে দ্রুততরভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সেজন্য সরকার অনেকগুলো অর্থঋণ আদালত স্থাপন করেছে। এ সমস্ত কোর্টের ঋণ আদায়ের উপর এখতিয়ার আছে এবং একজন ঋণ গ্রহীতাকে ডিক্রিপ্রাপ্ত ঋণের ৫০% পর্যন্ত পরিশোধ করার হুকুম দেবার ক্ষমতা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আইন এবং কোট প্রসিডিউর আরো সহজতর ও কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিভিন্ন বাণিজ্যিক আইন যথা - কোম্পানি আইন, নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুম্যান্ট এ্যাক্ট ইত্যাদিতেও সংস্কার আনা হচ্ছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন যথা Bankruptcy আইনে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। একই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২-এর চ্যাপ্টার ৫কে ফাইন্যানসিয়াল ইন্সটিটিউশন এ্যাক্ট ১৯৯৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে যার ফলে সকল প্রকার আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরাসরি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের আওতায় চলে এসেছে।

প্রশ্ন : কোন সময় থেকে এ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বাংলাদেশে এ কর্মসূচি শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপট কি?

উত্তর : National Commission on Money, Banking & Credit-এর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাংক (World Bank) আর্থিকখাতের উপর আন্তঃগভীর পর্যালোচনা পূর্বক এ সুপারিশ করে। এ সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার মূলত ১৯৮৯-৯০ সাল থেকে বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার/উদারনীতি গ্রহণ করে আসছে।

স্বাধীনতার পর হতে বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকার আইন-কানুন ও নির্দেশনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছিল। এ সময় ঋণ বন্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক অনিয়ম বিদ্যমান ছিল। উল্লিখিত কারণে ব্যাংক ঋণ ফেরত না দেয়ার সংস্কৃতি (Default Culture) উৎসাহিত হয়েছে। এতে করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো খুবই চাপের মুখে পড়ে এবং দুষ্প্রাপ্য সম্পদের অপব্যবহারের ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। এমতাবস্থায় ব্যাংকসমূহের সমস্যাবলী নির্ধারণ ও তার প্রতিকারের

www.pathagar.com

জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তৎকালীন সরকার 'National Commission on Money, Banking and Credit' গঠন করেন। বিশ্বব্যাংক উক্ত কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচির প্রস্তাব দেন ও সরকার তা গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন : আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচির অন্যতম অংশ বর্তমান সুদনীতি। এ আলোকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের বর্তমান সুদের হার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে আপনার মূল্যায়ন কি? প্রসঙ্গত, আমরা যেটি দেখছি সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা নেই, এমনকি কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'প্রাইম রেট'' ব্যবহারের যে সুযোগ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে দিয়েছে তাও তারা ব্যবহার করছে না বা করতে পারছে না। তাহলে সুদের হার মুক্তায়নের সুফল কোথায়?

উত্তর : আর্থিক খাত সংস্কার শুরু হওয়ার পর থেকে সুদ সংস্কার নীতিমালায় যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা হয়েছে এবং যখন যে ধরনের সমন্বয় করা প্রয়োজন তা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে, ব্যাংকসমূহের রক্ষিতব্য তরল সম্পদ বর্তমানে ন্যূনতম পর্যায়ে আছে। ব্যাংক রেট যথেষ্ট কমানো হয়েছে এবং ডিসকাউন্ট সুবিধা সকল ব্যাংকের জন্য সহজলভ্য করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অতিমাত্রায় কুঋণজনিত বোঝায় নিপতিত হওয়ায় শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে তহবিল সংরক্ষণ এবং স্থগিত সুদ হিসাব প্রচলন করার ফলে ব্যাংকগুলোর আগামের উপর সুদের হার নির্ধারণে জোরালো প্রভাব ফেলে। সরকার ব্যাংকগুলোর কুঋণজনিত বোঝা লাঘব ও ঋণ আদায় প্রক্রিয়া জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সরকার NCBগুলোর পুঁজি গঠন এবং শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের বিপরীতে তহবিল সংরক্ষণের ঘাটতি পুরণের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সরবরাহ করেন।

পর্যায়ক্রমে সুদের হার নির্ধারণের ক্ষমতা ব্যাংকসমূহের উপর বর্তানো হয়েছে। এখন তারা ঋণ ও আমানতের উপর সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট যুক্তিসংগত পর্যায়ে আছে। তাদের বাণিজ্যিক ও আর্থিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে তারা অগ্রসর হচ্ছে। ধীরে ধীরে সুদের হার আরো কমবে বলে আশা করা যায়। ব্যাংকগুলোও ধীরে ধীরে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হতে যাচ্ছে। ব্যাংকগুলো নিজেরা নিয়মিত বসছে, সুদের হার পর্যালোচনা করছে এবং পুনঃনির্ধারণ করছে।

সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা নেই, এ কথা বললে ভুল হবে। তবে আশানুরূপ প্রতিযোগিতা আসতে আরো কিছু সময় লাগবে। এর কারণ আমাদের দেশে ব্যাংকগুলোর মধ্যে এখনো Oligopolistic মনোভাব রয়েছে, বিপুল পরিমাণ মন্দ ঋণ রয়েছে।

'প্রাইম রেট' আমাদের NCB গুলোতে এখনো প্রয়োগ হচ্ছে না। তবে আমাদের দেশে বিদেশী ব্যাংকগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'প্রাইম রেট' ব্যবহার করছে। আমাদের দেশে Credit Rating এখনো গড়ে ওঠেনি। তাই কোনো ক্লায়েন্ট যে কোন ক্যাটাগরির, তা যথাযথভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে বিদেশী ব্যাংকগুলোর নিজস্ব Rating System আছে, তাই তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'প্রাইম রেট' ব্যবহার করছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঋণ ক্লাসিফিকেশন ও তার জন্য প্রভিশন রাখা সংক্রান্ত নীতিমালা কতটুকু বাস্তবসম্মত?

উত্তর : ১৯৮৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর হতে নতুন পদ্ধতিতে ঋণ ক্লাসিফিকেশন শুরু হয়। নতুন পদ্ধতি শুরু হবার পূর্বে ঋণের যথাযথ প্রভিশন রাখা হতো না। ফলে ব্যাংকের লাভ, মুলধন

www.pathagar.com

ইত্যাদির প্রকৃত অবস্থা জানা যেত না। একটি ব্যাংকের মূলধন ও তার ঋণের গুণগত মান কেমন তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকার অর্থে আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোর মূলধন প্রদত্ত ঋণের গুণগতমানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নতুন ঋণের শ্রেণীকরণ পদ্ধতি প্রবর্তন করায় ব্যাংকগুলো নিজেদের অবস্থান নিজেরাই বুঝতে পারছে এবং করণীয় কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। ব্যাংকের নূন্যতম পরিমাণ জানা যাচ্ছে। মন্দ ঋণের সুদের ওপর 'স্থগিত সুদ হিসাব' পদ্ধতি চালু করায় ব্যাংকের প্রকৃত লাভ জানা যাচ্ছে। ব্যাংকগুলো ধীরে ধীরে শৃঙ্খলায় ফিরে আসছে। নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন হওয়ার পর প্রদত্ত ঋণের আদায় অবস্থা ভালো। আমার মতে, ঋণ ক্লাসিফিকেশন ও প্রভিশন রাখা সংক্রান্ত নীতিমালা আমাদের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাস্তবসম্মত। তাহলেও ব্যাংকগুলোকে যখন স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া হবে তখন সুপারভিশন, ক্লাসিফিকেশন ও প্রভিশনিং অত্যন্ত জোরদার করতে হবে। আমাদের দেশের ঋণ শ্রেণীকরণ এখানো আন্তর্জাতিক মানের অনেক পিছনে রয়েছে যা একটি সুস্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য সঠিক নয়। আমাদেরকে ব্যাংক ব্যবস্থার সুস্থতার স্বার্থে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং নীতিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। তা না করা হলে হঠাৎ করে ব্যাংক ব্যবস্থায় বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

প্রশ্ন : ব্যাংক কোম্পানি আইন '৯১ ও অর্থ ঋণ আদালত আলোচ্য কর্মসূচির অন্যতম দিক। বস্তুত এ আইন আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারছে?

উত্তর : আর্থিকখাত সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়ার পূর্বে এখানে আইন ও বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা অপ্রতুল ছিল। বাণিজ্যিক লেনদেন সংক্রান্ত মামলা দ্রুত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। বর্তমানে ঋণদান ক্ষেত্রে কঠোর শৃঙ্খলা আনা ছাড়াও ঋণ খেলাপীদের নতুন ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে অধিকতর কঠোর নিয়মকানুন বলবৎ করা হয়েছে।

ব্যাংক কোম্পানি আইন ৯১-এর আওতায় ব্যাংকগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধিকতর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ডাইরেক্টরদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংককে বিশেষ পরিদর্শন ও অডিটর নিয়োগের অধিকার দেয়া হয়েছে। তাই এ অর্ডিন্যান্স কার্যকর হওয়ার পর ব্যাংকগুলোতে অধিকতর শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে।

বাণিজ্যিক লেনদেন দেখা দিলে যাতে করে দ্রুতভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সেজন্য সরকার অনেকগুলো অর্থঋণ আদালত স্থাপন করেছেন। এ সমস্ত কোর্টের ঋণ আদায়ের ওপর এখতিয়ার আছে এবং একজন ঋণ গ্রহীতাকে ডিক্রিপ্রাপ্ত ঋণের প্রসিডিওর আরো সহজতর ও কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। অর্থ ঋণ আদালত কাজ শুরু করার পর হতে ঋণ আদায় পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। পূর্বের তুলনায় দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে। তবে ডিক্রিপ্রাপ্ত ঋণ কীভাবে উদ্ধার করা যায় তা এখনো সমাধান করা যায়নি। দেখা যাচ্ছে যে ব্যাংকগুলো ডিক্রি পেয়েও তা কার্যকরী হচ্ছে না। এক্ষেত্রে আইনের আরো সংস্কার হচ্ছে।

বিভিন্ন বাণিজ্যিক আইন যথা কোম্পানি আইন Negotiable Instrument Act ইত্যাদিতেও সংস্কার আনা হচ্ছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন যেমন, Bankruptcy Law-এ পরিবর্তন আনা হচ্ছে। একই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২-এর Chapter-5 কে Financial Institution Act ১৯৯৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে, যার ফলে সকল প্রকার নন-ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শনের আওতায় চলে এসেছে।

www.pathagar.com

আশা করা যায় আইনগত সংস্কারের ফলে অচিরেই আর্থিকখাতে অধিকতর শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

প্রশ্ন : 'এফএসআরপি' কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ কয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকে কার্যরত। এ প্রজেক্টের কাজের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও এ পর্যন্ত এচিভমেন্ট সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাই?

উত্তর : বাংলাদেশ ব্যাংক ও আরো ৪টি NCB যথা সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক লিঃ-এ এফএসআরপি-এর টীম কাজ করছে।

দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে সেজন্য তাদের ঋণদান, বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপের মধ্যে আছে নীতি নির্ধারণী ক্ষমতা বৃদ্ধি, কম্পিউটারায়ন, অনুসৃত আর্থিক নীতির কার্যকর প্রয়োগ এবং ব্যাংকসমূহের তদারকী ব্যবস্থা জোরদারকরণ প্রভৃতি। NCB গুলোতে পারফরম্যান্স প্লানিং সিস্টেম, MIS, New Loan Ledger, Credit Risk Analysis ইত্যাদি চালু করা হয়েছে যাতে ব্যাংকগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নত হয়। এ লক্ষ্য সামনে রেখে নতুন ফরম, পদ্ধতি, Manual ইত্যাদি চালু করা হয়েছে। এ সকল বিষয়ে ব্যাংক কর্মকর্তাগণকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। যে সকল শাখা লোকসান দিচ্ছে তাদেরকে বন্ধ অথবা পূণর্গঠিত করা হচ্ছে। এসকল পদক্ষেপ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যাংকগুলো লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। এতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনপূর্বক এতিহ্যবাহী ব্যাংকিং (Traditional) হতে যুগোপযোগী নূতন ধরনের ব্যাংকিং নীতির জগতে প্রবেশ করছে। ব্যাংকগুলো নতুন নতুন ঋণদান ক্ষেত্র চিহ্নিত করছে এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বিদেশে কর্মরত লোকজন এবং নতুন নতুন শিল্প উদ্যোক্তাগণকে ঋণ প্রদান করছে। বর্তমান অর্থ বৎসরের (১৯৯৩-৯৪) জন্য ব্যাংকগুলো ১৭০০ কোটি টাকার এক ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো তাদের মধ্যে একেটি Consortium গঠন করেছে। ফলে গত বছরের তুলনায় চলতি অর্থ বছরের প্রথম ৮ মাসে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪ পর্যন্ত দেশের সার্বিক বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এ সময়ে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের জন্য গত অর্থ বছরের সর্বমোট ৭১১ কোটি টাকার ঋণের স্থলে মোট ৬২৮ কোটি টাকার প্রকল্প ঋণ মঞ্জুর করেছে। উল্লেখ্য যে, চলতি অর্থ বছরের ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৯৪ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪১০টি শিল্প ইউনিটের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হয়। যার মধ্যে কিছু কিছু বৃহৎ শিল্প যথা Composite Textile Mills, সিমেন্ট কারখানা, চামড়া শিল্পও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকসমূহ ঝুঁকি নিতে অনাগ্রাহী এবং নিরুৎসাহিত - এ দোষ এখন আর তাদেরকে দেয়া যায় না। এখন তারা জামানত ভিত্তিক Coletarail based ব্যাংকব্যবস্থার পাশাপাশি অংশীদারিত্ব ভিত্তিক (Participatory) ব্যাংকিং-এর দিকে ঝুঁকেছে এবং গ্রাহকদের আরো অধিকতর সেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আয়ের ভিত্তি আরো সম্প্রসারিত করছে।

প্রশ্ন : বর্তমান সময় পর্যন্ত আর্থিকখাত সংস্কার কর্মসূচির সাফল্য, ব্যর্থতা ও বাস্তবায়নজনিত সমস্যা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করুন?

উত্তর : আমরা বর্তমান সময় পর্যন্ত আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচির চার বৎসর অতিক্রান্ত করেছি। কর্মসূচি এখনো বাস্তবায়নাধীন পর্যায়ে আছে। ইতোমধ্যে আমরা বহুক্ষেত্রে সাফল্য

www.pathagar.com

অর্জন করেছি। আর্থিকখাতে শৃঙ্খলা ফিরে আসছে। আগাম ও ঋণের ওপর সুদের হার নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোকে নিজস্ব লক্ষ্য সামনে রেখে সুদের হার নির্ধারণ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সুপারভিশন আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহের জন্য সঠিক হিসাবনীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রচলিত ব্যাংক কোম্পানি আইন বা নিয়মাবলী যুগোপযোগী করা হয়েছে। অর্থ ঋণ আদালত চালু করা হয়েছে। ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ব্যাংকিং-এ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। আশা করি, অচিরেই আমরা আর্থিকখাতকে আরো সুসংহত ও সত্যিকারের সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

এফএসআরপি একটি সফল কার্যক্রম। এখন পর্যন্ত এতে ব্যর্থতার কোনো প্রশ্ন দেখা দেয়নি। এটি একটি ব্যাপক কর্মসূচি। এখনো বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। তবে বাস্তবায়নে কিছু সমস্যা থাকা স্বাভাবিক। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে মানসিকতার। বিশ্বে এ প্রযুক্তি ও সংগঠনের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সেগুলোর অনেক কিছুই আমরা ভালো করে জানি না। এগুলো গ্রহণ করায় এক শ্রেণীর ব্যাংক কর্মকর্তার আপত্তি রয়েছে। কিন্তু প্রযুক্তি ও সংগঠনের ক্ষেত্রে যা বিভিন্ন দেশে ভালো প্রমাণিত হয়েছে তা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। ব্যাংক ব্যবস্থাকে আধুনিক করে গড়ে তুলতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : বায়রন বিশ্বাস ও রেজাউল করিম
প্রকাশকাল : মার্চ ১৯৯৪, ব্যাংকার

www.pathagar.com

কবি গোলাম মোস্তফা প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশের গুটিকয়েক শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন ছিলেন

প্রশ্ন : কবি গোলাম মোস্তফার সঙ্গে আপনি কীভাবে যুক্ত হলেন?

উত্তর : ১৯৫৮ সালে আমার মরহুম আব্বা মোস্তফা সাহেবের বাড়ির সামনের দিকে বাসা নেন, আমাদের বাসা থেকে 'মোস্তফা মঞ্জিল' বা কবি সাহেবের বাড়ি ছিল মাত্র পঁচিশ গজ দূরে। কিছুদিনের মধ্যে আমিই নিজের উদ্যোগে কবি সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হই এবং তার একদম নিকট ব্যক্তিতে পরিণত হই। আমি প্রায় চার বছর কবি সাহেবের ব্যক্তিগত সচিবের মতো তার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তিনি তার সকল বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং সকল দুঃখ-বেদনা আমাকে বলতেন। যদিও আমি বয়সে অনেক ছোট ছিলাম।

প্রশ্ন : 'মোস্তফা মঞ্জিল' ছিল সে সময়ের প্রতিভাবানদের জমজমাট আড্ডা কেন্দ্র। এ ব্যাপারে আপনার স্মরণীয় ঘটনা আমাদের জানাবেন কি?

উত্তর : 'মোস্তফা মঞ্জিল' সে সময়ে ঢাকার এককোণায় ছিল কেননা ঢাকা তখন এতো বিস্তার লাভ করেনি। 'মোস্তফা মঞ্জিলে' ছিল অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশ। বাড়ির সামনে বাগান ছিল; চারপাশে ভীড় ছিল না। এ পরিবেশেই সে সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বসবাস করতেন। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সেখানে কবি-সাহিত্যিকরা আসতেন এবং তার কাছ থেকে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা গ্রহণ করতেন। তবে স্বীকার করতেই হবে যে যারা বামপন্থী ছিলেন তারা কবি সাহেবকে পছন্দ করতো না।

প্রশ্ন : কবি গোলাম মোস্তফার মধ্যে সরাসরি কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল কি?

উত্তর : তিনি সরাসরি কোনো রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তবে তিনি ইসলামকে এবং পাকিস্তানকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং যে সকল দল ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ছিল এবং পাকিস্তানকে সুদৃঢ় করতে চাইতো তিনি তাদের পক্ষে ছিলেন।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে ইকবাল চর্চায় কবির ভূমিকা কতটুকু?

উত্তর : তিনি ইকবালের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন এবং তার সাধনায় যাদের প্রভাব রয়েছে তাদের মধ্যে আল্লামা ইকবাল অন্যতম। তিনি ইকবালের কবিতা অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন এবং বেশ কিছু সার্থক অনুবাদ করেছেন। যার মধ্যে 'বাঙ্গে দারা'র মুনাজাত কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : কবি গোলাম মোস্তফা নিবিড় নিষ্ঠায় যেমন "বিশ্বনবী" রচনা করেছেন তেমনি 'হারমোনিয়াম' বাজিয়ে গান গেয়েছেন, উঁচু স্তরের পিয়ানোবাদক ছিলেন। আদতে সংগীত কিংবা সংস্কৃতিতে কবির দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল?

উত্তর : তার দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি ইসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। তিনি গান বা সংগীতের ব্যাপারে ইমাম গাজ্জালী ও রুমী যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন তাকে গ্রহণ করেছিলেন, আজকের যুগে আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী তার বিখ্যাত 'ইসলামের হালাল ও হারামের বিধান' গ্রন্থে একই মতামত দিয়েছেন। কবি গোলাম মোস্তফা যে গান ও সংগীতের সাধনা করতেন তাকে তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ মনে করতেন।

প্রশ্ন : জীবনের শেষ দিকে কবিকে 'আধুনিক কবিদের দল' যে তীব্র সমালোচনা শুরু করেছিল - এ ব্যাপারে কবির প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

উত্তর : তিনি সকল সমালোচনাই ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করতেন, কারণ তিনি জানতেন যে বা যারা তার সমালোচনা করছে তাদের অধিকাংশই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সমালোচনা করছে। তাদের সমালোচনা ছিল মূলত ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে; কবি গোলাম মোস্তফা উপলক্ষ ছিল মাত্র। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ঐসব সমালোচনা কোনো উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনা ছিল না।

প্রশ্ন : কবির সন্তানেরা কবির জীবনাদর্শ সংরক্ষণ, অনুশীলন ও বিস্তারে কতটুকু সফল?

উত্তর : আরো অনেক কিছু করা উচিত ছিলো কেননা তিনি প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশের গুটি কয়েক শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন ছিলেন।

প্রশ্ন : আপনি তো কবির জীবনের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন, তাই আপনি আমাদেরকে কবির জীবনের অভিনবত্বের দিকগুলো জানাবেন কি?

উত্তর : কবি সাহেব অত্যন্ত সহজ সরল লোক ছিলেন। অনেক সময় তাকে আমি শিশুর মতো আগলে রেখেছি। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি- একবার একজন সাহিত্যিক একটি বই লিখেন। তিনি বইটি কবি সাহেবের কাছে নিয়ে আসলেন এবং একটি ভূমিকা লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন।

কবি সাহেব বইটি ভালোভাবে না পড়েই একটি ভূমিকা লিখে ফেলেন। কেননা অনুরোধকারী সাহিত্যিক তার পরিচিত ছিলেন। আমি বইটি পড়ে দেখতে চাইলাম যাতে কবি সাহেবের নাম কোনো আপত্তিকর পুস্তকের সঙ্গে সম্পৃক্ত না হয়। বইটি পড়ে আমি দেখলাম যে তাতে ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়া হয়েছে যেসব মত উগ্র শিয়া'রা পোষণ করে থাকেন। কবি সাহেবকে আমি বললাম, বইটি সংশোধন না করা পর্যন্ত আপনি এ ধরনের বইয়ের ভূমিকা লিখে দিতে পারেন না।

কিন্তু কবি সাহেব ছিলেন অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। তাই তিনি উক্ত লেখককে না করতে পারছিলেন না। অন্যদিকে লেখকও তার বই সংশোধন করতে রাজী নন। তখন আমি নিজেই বললাম, এর ভূমিকা দেয়া হবে না যতক্ষণ না আপনি এ বইয়ের কোনো সংশোধন না করবেন। উক্ত লেখক অবশ্য আমার উপর সাংঘাতিক ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

আরেকটি ঘটনা - আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের পরে কবি সাহেব তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। আইয়ুব খান যে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন এটি তিনি বুঝতে সক্ষম হননি। অন্যদিকে আইয়ুব খানের চিন্তাধারার দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। আইয়ুব খানের এসব চিন্তাধারাকে তিনি ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ করে সমর্থন করতে চাইতেন।

www.pathagar.com

অথচ আইয়ুব খানের লক্ষ্য ছিল সত্যিকার নয় একটি খোড়া গণতন্ত্র যা মূলত ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। তৎকালীন পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ আইয়ুব খানের ধ্যানধারণাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করতেন না। কিন্তু কবি সাহেব তার সরল বিশ্বাসে আইয়ুব খানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং তার বই 'আমার চিন্তাধারা'য় শাসনতন্ত্র সম্পর্কে যে লেখাটি রয়েছে তাতে তার সে সময়কার মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে।

আমি কবি সাহেবের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক তর্ক করেছি, তিনি তার লেখা আমার অনুরোধে অনেক কাটছাঁট করেন কিন্তু পুরোপুরি পরিবর্তন করতে রাজী হননি। অবশ্য যা তিনি লিখেছিলেন তা তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন এবং তিনি তা কোনো স্বার্থে করেননি। কবি সাহেবের অসংখ্য স্মৃতি আমার সঙ্গে জড়িত যেগুলো সম্ভব হলে আগামীতে কোনো লেখায় উল্লেখ করবো।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শাহীন হাসনাত
প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৪০৫, প্রেক্ষণ

www.pathagar.com

সেবা ও প্রশাসনকে জনগণের নিকটবর্তী করতে হবে

প্রশ্ন : গণমুখী প্রশাসন বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : গণমুখী প্রশাসন বলে কিছু নেই। এটি একটি রাজনৈতিক শ্লোগান, সাধারণভাবে ব্যবহৃত জনপ্রিয় ধারণা যার একটি ভালো দিক আছে। গণমুখী প্রশাসন বলতে তিনটি বিষয়কে বোঝায়। যথা: প্রশাসনকে জনগণের খাদেম হতে হবে; প্রশাসকদেরকে অবশ্যই জনপ্রতিনিধিদের কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হবে; এবং সেবা ও প্রশাসনকে জনগণের নিকটবর্তী করতে হবে।

প্রশ্ন : আমাদের প্রশাসনের গলদ কোথায়?

উত্তর : আমাদের প্রশাসন ত্রুটিপূর্ণ এবং তা পুরোপুরি ব্যর্থ। কাঠামোগত দিক থেকে এর কোনো গলদ নেই। বরং বলতে গেলে একে কাঠামোসর্বস্ব প্রশাসন বলা যায়, যার উদ্দেশ্য ও ফলাফল শূন্য। এর ত্রুটি কয়েকটি। যেমন:

প্রথমত, পদ্ধতি (Procedure) অত্যন্ত জটিল। এ পদ্ধতিগত জটিলতার জন্যই হয়রানি, দীর্ঘসূত্রিতা, লালফিতার দৌরাত্ম্য প্রভৃতি অভিযোগের কারণ ঘটে। প্রসিডিওরের এসব অহেতুক জটিলতা দূর করতে হলে পুরো পদ্ধতিরই আমূল সংস্কার করতে হবে। যেমন জেল কোড ও কাষ্টমস ক্লিয়ারেন্স পদ্ধতির কথা বলা যেতে পারে। কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স পদ্ধতি এমন জটিল আর দীর্ঘ প্রক্রিয়াধীন যে এর আর কোন সংস্কার চলে না। এ প্রসিডিওর পুরো বাদ দিয়ে নতুন করে করার কথা ভাবা উচিত।

দ্বিতীয়ত, একই বিষয়ে একাধিক আইন ও রুলস হওয়ায় অযথা জটিলতার সৃষ্টি হয়। আইন ও রুলস সংশোধন, স্পষ্ট ও সংখ্যায় কমিয়ে আনা দরকার।

তৃতীয়ত, সেবার মনোভাব নেই। আত্মকেন্দ্রিক চিন্তায় আচ্ছন্ন সকল কর্মচারী। আমলাদের জাতীয় চরিত্র এর কারণ। অভাব না থাকলেও, দেখা গেছে, সেবার মনোভাব সম্পন্ন হয় না। জনগণের বা তার প্রতিনিধির প্রতি দায়িত্বশীল নয়। জনগণকে অযথা হয়রানি করার একটি মানসিকতা এদের রয়েছে। যখন একজন কর্মচারী অভাবের কারণে ক্লায়েন্টকে হয়রানি করে দু'পয়সা আয় করার চেষ্টা করে, তার একটি ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু যার অভাব নেই সে যখন এসব করে তখন এর কি ব্যাখ্যা আছে? একমাত্র নৈতিক শিক্ষা ছাড়া এ ধরনের মনোভাবের পরিবর্তন সম্ভব নয়। নৈতিক শিক্ষা মানে ধর্মীয় শিক্ষা বোঝায়। আমি বলছি শিক্ষার মৌলিক সংস্কার হওয়া দরকার। বর্তমানে শিক্ষা সংস্কারে হাত দিলে বিশ বছর পর এর ফল পাওয়া যাবে, প্রশাসনে পরিবর্তন আসবে। আর সে সাথে আছে দুর্নীতি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : সততা ও গণমুখী প্রশাসন কি পারস্পরিক নির্ভরশীল?

উত্তর : অনেকটা সততা গণমুখী প্রশাসনের একটি উপাদান মাত্র। গণমুখী প্রশাসন আরো ব্যাপক। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তা বলা হয়েছে। দুর্নীতির জন্য যতটুকু হয়রানি ও অসাধুতার আশ্রয় নেয়া হয়, সততা অতটুকু পরিমাণ খারাপ দূর করতে পারে।

প্রশ্ন : 'আমলাতন্ত্র' শব্দটিকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : শাব্দিক অর্থে 'আমলাতন্ত্র' বা 'ব্যুরোক্র্যাসি' শব্দটি প্রশাসনিক পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমাদের কার্যকলাপের ফলে বর্তমানে আমলাতন্ত্র বলতে জনগণের ঘৃণামিশ্রিত অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। আমলাতন্ত্র গালির মতো কদর্থে ব্যবহৃত হয়। এর কারণ হচ্ছে সাধারণত আমলারা নিজেদের দাম্ভিক ভাবে, নিজেদেরকে জনগণের খাদেম মনে করে না; এবং জনপ্রতিনিধিকে সম্মান করে না। এরা জনগণ ও অধঃস্তনের সাথে মিশতে চায় না, কথাই বলতে চায় না। তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রের এ উন্নাসিকতা দূর করা সম্ভব। যথা: (১) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মজবুত হলে, (২) ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারের ফলে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটলে এবং (৩) আমলাদের এ্যাকাউন্টেবিলিটি সত্যি-সত্যি বাড়লে।

প্রশ্ন : বলা হয়ে থাকে, গণতান্ত্রিক প্রশাসনের অন্যতম ত্রুটি হচ্ছে- অধঃস্তনরা এতে প্রশ্রয় পেয়ে যায় এবং কর্তব্যে গাফিলতি করে। কথাটি কি ঠিক? গণতান্ত্রিক প্রশাসনের সুবিধা সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন?

উত্তর : এর ভালো দিকটিই বেশি। যথা: (১) প্রসিডিওরের দীর্ঘসূত্রিতা কমিয়ে প্রশাসনকে সহজতর করা যায়; (২) প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায়। এতে জনগণের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায় এবং এর ফলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়। তাতে করে জনগণ অযথা হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পায়। এতে নিচের স্তরের দুর্নীতি সম্পর্কেও অবহতি হওয়া যায় এবং সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়; (৩) প্রধান কর্মকর্তা নিজে একক সিদ্ধান্ত নিলে অনেক সময় সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয় এবং সিদ্ধান্ত ভুলও হতে পারে। সহকর্মী ও অধঃস্তনদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। সিদ্ধান্ত অধিকতর সঠিক হয়, অধঃস্তনরা কাজে উৎসাহ পায় এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা যায়। ফলে নিচের দিকে দুর্নীতির সম্ভাবনা কমে যায়।

প্রশ্ন : 'চেইন অব কমাণ্ডে'র ধারণাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

উত্তর : চেইন অব কমাণ্ড থাকা ভালো। অবশ্যই অধঃস্তনের সঙ্গে পরাপমর্শ করা চেইন অব কমাণ্ডের বিরোধী নয়। এজন্য প্রত্যেক অফিসে 'পারফরমেন্স', 'ডিফিক্যালটিজ' এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনার জন্য মাসিক সভার চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম

www.pathagar.com

পুলিশ প্রশাসনকে ইউরোপ-আমেরিকার পুলিশ প্রশাসনের আদলে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানো ও পুনর্গঠন প্রয়োজন

প্রশ্ন : রুবেল হত্যার বিচারের জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপকে কি আপনি যথার্থ মনে করেন?

উত্তর : আমি মনে করি রুবেল হত্যা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে, সরকারের সকল মহল এবং বিরোধী দলের সকল মহলকে চিন্তিত করে তুলেছে। সরকার এর বিচারের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে সে উদ্যোগ যথেষ্ট কি না সে ব্যাপারে দ্বিমত থাকতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি, সরকার এ ব্যাপারে সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং আমার ধারণা তারা এর বিচার চায়, শাস্তি চায়। আমি মনে করি, এর শাস্তি হবে।

প্রশ্ন : সম্প্রতি পুলিশ এসোসিয়েশন আইজি'র নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। পুলিশ কি রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে পারে?

উত্তর : আমার দুটো কথা। প্রথমটি হলো, পত্রিকায় যে রাজনৈতিক বক্তব্যগুলো দেখা গেছে তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো, কোন এসোসিয়েশনের পক্ষে এ ধরনের বক্তব্য দেয়া ঠিক নয়, একেবারেই ঠিক নয়। একে সমর্থন দেয়াও ঠিক নয় এবং কেউ দেবে না বলেই আমি মনে করি। তবে পুলিশের বিরুদ্ধে যদি কোনো বক্তব্য এসে থাকে তবে তাদের অধিকার রয়েছে সে সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য প্রদানের।

প্রশ্ন : প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে পুলিশ সমিতি রুবেল হত্যাকাণ্ডকে তুচ্ছ ঘটনা বলে উল্লেখ করেছে। আসলেই কি রুবেল হত্যা তুচ্ছ ঘটনা?

উত্তর : পত্রিকার শিরোনাম যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো এ ধরনের বক্তব্য রাখা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অত্যন্ত দুঃখজনক ও অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। এটি একেবারেই তুচ্ছ নয়, মহাঘটনা। একটি মাত্র ঘটনা দ্বারা বিষয়টি বুঝলে হবে না। বিগত ২৫ বছর ধরে পুলিশ প্রশাসন যেভাবে চলেছে তাতে তাদের কাস্টডিতে এ পর্যন্ত কয়েকশ' লোক মারা গেছে। বলা হচ্ছে, গত দু'বছরে তাদের হাতে ৮৫ জন প্রাণ হারিয়েছে। সুতরাং রুবেল হত্যা একটি ঘটনা মাত্র। তবে এ ঘটনা দ্বারা গোটা জাতির বোঝা উচিত যে, পুলিশ প্রশাসনে কি হচ্ছে। রুবেল হত্যা ঘটনার প্রেক্ষাপটে আমাদের পুলিশ প্রশাসনকে ইউরোপ-আমেরিকার পুলিশ প্রশাসনের আদলে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানো ও পুনর্গঠন প্রয়োজন। অনেকে হয়তো বলবেন, আমাদের পরিস্থিতি তাদের মতো নয় কিন্তু পুলিশের হাতে যদি এত লোক মারা যেতে থাকে, তাহলে কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা বর্তমান অবস্থা বহাল রাখতে পারি না। একে পরিবর্তন করতেই হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : সরকারি কর্মকর্তা যদি রাজনৈতিক বক্তব্য দেয়, তাহলে চাকরিবিধি অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা?

উত্তর : পারা যায় এবং নেয়া উচিতও। কিন্তু সরকার বিভিন্ন কারণে নিতে পারে না। তবে আমি আশা করবো, তারা আর এ ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য দেবে না, দিলে সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন : গত দু'বছরে সমাজ থেকে অপরাধ দমনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সামনে পুলিশ সমিতির এ বক্তব্যকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

উত্তর : আমি আগেই বলেছি এ ধরনের বক্তব্য না দেয়াই ভালো। কারণ এতে দলীয় রাজনীতির পরিচয়ই বহন করে। পুলিশ সমিতি কেন, কোনো সমিতিই এ ধরনের বক্তব্য দিতে পারে না।

প্রশ্ন : মানুষের জানমালের নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে আমাদের সরকার কতটুকু সফল বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : গত ২৫ বছরে আমাদের সরকারসমূহ এ ব্যাপারে সফল হয়েছে তা বলা যাবে না।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন, আমাদের পুলিশ বাহিনী রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : আমি মনে করি, প্রত্যেক সরকারই পুলিশকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছে। তবে পুলিশ তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। আমার ধারণা পুলিশ যদি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হতে না চায় এবং সেজন্য যদি কোনো চাপ আসে, পুলিশের শীর্ষস্থানীয় কর্তকর্তারা যদি সে চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে পদত্যাগ করেন তাহলে এ অবস্থার অবসান ঘটবে। সরকার আর তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে চাইবেন না। কিন্তু আমি জানি না তারা কেন তা করছেন না। এটি করলে তো তাদের কোনো ক্ষতি নেই। তবে হয়তো তাদের কোনো দুর্বলতা আছে, না হয় যে কোনোভাবে তারা ক্ষমতায় থাকতে চায়। তাই পদত্যাগ করছে না।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শিকদার আবদুর রব
প্রকাশকাল : ১৯৯৮, সাপ্তাহিক বিক্রম

www.pathagar.com

মাদরাসা শিক্ষায় দেশ চালাবার জন্য যেসব বিষয় শিক্ষা করা দরকার তা নেই

প্রশ্ন : প্রচলিত দ্বিমুখী/বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : বর্তমানে যেসব শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ নয়। মাদরাসা শিক্ষায় বিশেষ করে কওমী ব্যবস্থায় দেশ চালানোর জন্য যেসব বিষয় শিক্ষা করা দরকার যেমন- অর্থনীতি, গণপ্রশাসন, ম্যানেজমেন্ট - তা নেই। অন্যদিকে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল শিক্ষায় কুরআন, ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বিধিবিধান শিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা নেই। এসব আমাদের করতে হবে। তবে অমুসলিমদের জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই করতে হবে।

প্রশ্ন : 'মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির একটি বৃহৎ অংশকে পশ্চাৎপদ করে রাখা হয়েছে, বঞ্চিত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ- (ক) প্রচলিত কাঠামোর মাদরাসা শিক্ষা সমাপ্তির পর মসজিদের ইমাম বা মাদরাসার শিক্ষক হওয়া ছাড়া কর্মসংস্থানের কার্যত কোনো পথ খোলা নেই। (খ) উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পথও বন্ধ'- মন্তব্য করুন।

উত্তর : এ বক্তব্য মূলত সঠিক। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলাম যুগের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিস্থিতির পরিবর্তন করার জন্য সকল ইসলামী ব্যক্তিত্বের চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন : ইসলাম ও মাদরাসা শিক্ষা কি এক ও অভিন্ন? ইসলামী শিক্ষা আসলে কি?

উত্তর : ইসলামী শিক্ষা বলতে আমি বুঝি এমন শিক্ষা যা একজন মুসলিম ব্যক্তিকে উপযুক্তভাবে ইসলাম জানতে সুযোগ করে দেবে এবং প্রশাসন ও অর্থনীতি চালাবারও যোগ্য করবে। অবশ্য এ শিক্ষা ব্যবস্থার উপরের স্তরে ইসলামী ফিকাহ, কুরআন, হাদিস, বিভিন্ন বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানে বিশেষ Specialisation (উচ্চতর জ্ঞান) এর সুযোগ থাকতে হবে।

প্রশ্ন : একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? তা কীভাবে চালু করা যায়? এক্ষেত্রে আলেম সমাজ কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন?

উত্তর : ইসলামী রাষ্ট্রে বা সমাজে চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি শিক্ষা ব্যবস্থাই হবে। সরকারের সহযোগিতা ছাড়া তা সম্ভব হবে না। বিশেষ করে মাদরাসা ব্যবস্থার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কর্তব্য আধুনিক শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা। অন্যান্য ক্ষেত্রে না হলেও এক্ষেত্রে সউদি আরব এগিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বিজ্ঞান ভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ইসলামের কোনো দ্বন্দ্ব আছে কি না? সেক্ষেত্রে আলাদাভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বজায় রাখার যৌক্তিকতা কি?

উত্তর : কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

প্রশ্ন : পবিত্র আল-কুরআন মতে সৃষ্টির সূচনা থেকেই ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন; তাহলে ইসলামের ইতিহাস বলতে শুধু মুহাম্মদ (স) থেকে শুরু করে আরবি নামধারী রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস বুঝানো হয় কেন?

উত্তর : শুরু থেকেই এভাবে নামকরণ করা হয়েছে। যেহেতু মুসলমানরা ইসলামেরই প্রতিনিধি সুতরাং তাদের ইতিহাসও ইসলামের ইতিহাসেরই অংশ বিবেচনা করায় কোনো অন্যায় নেই। পূর্বের আলেমরাও এ বিষয়টিকে 'তারিখে ইসলাম' বলেছেন। এ ব্যাপারে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করে কোন ফল হবে না।

প্রশ্ন : সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি বলতে কি বুঝা যায়?

উত্তর : ইসলাম মোতাবেক যে বিশ্বাস ও সার্বিক আচরণ তাই ইসলামী সংস্কৃতি। তাওহীদ বিরোধী কোনো উপাদান ইসলামী সংস্কৃতির অংশ নয়।

প্রশ্ন : মাতৃভাষা ও ইসলামী পরিভাষা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তর : মাতৃভাষা গুরুত্বপূর্ণ। তাকে উপযুক্ত স্থান দিতে হবে। ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করা ও এগিয়ে নেয়া সকল মুসলিমের কর্তব্য।

প্রশ্ন : আলেম সমাজ কি সত্যিকার অর্থে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হচ্ছেন?

উত্তর : অনেকেই ভালো করে পারছেন না বলে প্রতীয়মান হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত হলে এ সমস্যা থাকবে না। কিন্তু পরিস্থিতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিগত কয়েক শত বছরের অগ্রগতির সঙ্গে তাদের সম্যক পরিচিতি না থাকার কারণেই এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন : আলেমগণ এক মঞ্চে উঠে ইসলামের দাওয়াত দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন কেন? আপনার দৃষ্টিতে ঐক্যের ক্ষেত্রে বাধা কি?

উত্তর : ছোট ছোট ফিকহী ও বিশ্বাসগত বিষয়কে গুরুত্ব দেয়াই এর কারণ। ক্ষুদ্র বিষয়সমূহে মতপার্থক্য মেনে নিতে হবে। মূল আকীদা ঠিক থাকলে তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করায় কোনো বাধা থাকা উচিত নয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সম্পাদক, বর্তমান সংলাপ
প্রকাশকাল : ৭ অক্টোবর ১৯৯৯

www.pathagar.com

শিল্প, কৃষি ও সার্ভিস সেক্টরের ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব

প্রশ্ন : দেশে কেন বিত্তহীন বা ভূমিহীনদের সংখ্যা বাড়ছে?

উত্তর : এ সম্পর্কে আমার কাছে সংখ্যাতত্ত্ব (Statistics) নেই। অনেকের মতে Hardcore poverty গত ৭/৮ বছরে কিছুটা হলেও কমেছে।

প্রশ্ন : সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক অথবা বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণই কি বিত্তহীনদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য যথেষ্ট সহায়ক বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : না, আমি তা মনে করি না। বরং ক্ষুদ্র ঋণ দ্বারা দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব - এ চিন্তা ধারায় এখন অনেক অর্থনীতিবিদ সন্দেহ পোষণ করেন।

প্রশ্ন : বিত্তহীনদের মধ্যে ন্যূনতম সচ্ছলতা আনয়নে কি কি বাধা রয়েছে?

উত্তর : উন্নয়নের Strategy পুরোপুরিভাবে পর্যালোচনা করতে হবে। ব্যাপক শিল্প, কৃষি ও সার্ভিস সেক্টরের উন্নয়ন ছাড়া দারিদ্র্য দূর হবে না।

প্রশ্ন : বিত্তহীনদের শ্রেণী বিভাগ করলে তাদের মধ্যে এক বিরাট কর্মঠ বাহিনী রয়েছে। তাদেরকে কোন উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করা যায়?

উত্তর : ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের ঋণ প্রদান সহজ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে কোলেটারাল ছাড়াই এটি করতে হবে। তবে আমি আগেই বলেছি, এ ব্যবস্থা দারিদ্র্য দূরীকরণে যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন : বিত্তহীন কৃষি শ্রমিকরা প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের শিকার অর্থাৎ কৃষি উৎপাদনের কাজে ব্যস্ত থাকার পর বেশ কয়েক মাস বেকার থাকতে হয়। এ সময়ে তাদের আত্মকর্মসংস্থানে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?

উত্তর : এ ব্যাপারে সার্ভিস (সেবা) খাতের ব্যাপক বিকাশ ঘটাতে হবে।

প্রশ্ন : বিত্তহীন পরিবারের অনেক সদস্যই কষ্টকর জীবন নিয়ে পড়াশুনা করে থাকে। এ পড়াশুনা চালিয়ে যাবার মাঝে তাদেরকে পড়াশুনায় শেষ পর্যন্ত কিভাবে সহযোগিতা করা যায়?

উত্তর : সকল এনজিওকে এ ব্যাপারে মেধাবী ছাত্রদের সাহায্য করার জন্য প্রকল্প নেয়া উচিত। কেবল সরকার সব করতে পারে না।

প্রশ্ন : বিত্তহীন অশিক্ষিত শিশুদের দীর্ঘ মেয়াদে অংশিদারিত্বমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা ও চাকরি বা আত্মকর্মসংস্থান কিভাবে সম্ভব?

উত্তর : আমি আগেই বলেছি তাদের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত। বিত্তহীন পরিবারের শিশুরা লেখাপড়া শিখলে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়ন হলে সকলেই কাজ পাবে বলে আশা করা যায়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বিত্তহীনদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা নয়, বরং অংশীদারিত্বমূলক একটি উপযুক্ত মডেল দরকার। ব্যাপকভিত্তিক একটি উপযুক্ত মডেলের মাধ্যমে কিভাবে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা সম্ভব?

উত্তর : ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তবে এনজিওরা ক্ষুদ্র ঋণ যেভাবে পরিচালনা করে তা ঠিক নয়। ইসলামী ব্যাংকগুলোকে লাভ কম নিতে হবে। তবে ক্ষুদ্র ঋণ দ্বারা উন্নয়ন বা দারিদ্র্য দূরীকরণ হবে না। এজন্য যুক্তরাষ্ট্র জাপান যে পথে উন্নয়ন করেছে আমাদেরকেও সে পথে অগ্রসর হতে হবে। অর্থাৎ শিল্প, কৃষি ও সেবা খাতের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

প্রশ্ন : সরকারের প্রচলিত বাজেটে দারিদ্র বিমোচনের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকে, এছাড়াও বিত্তহীনদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কোন কোন উপায়ে তহবিল সংগ্রহ করা যায়?

উত্তর : যাকাত ও ওশরকে কাজে লাগানো যায়। এজন্য বর্তমান পর্যায়ে বেসরকারি খাতে প্রত্যেক গ্রামে / ইউনিয়নে বা উপজেলায় উদ্যোগ নেয়া অতি জরুরী।

প্রশ্ন : বেসরকারি ব্যাংক বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংকগুলো কিভাবে স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে?

উত্তর : ইসলামী ব্যাংকের RDS Programme খুবই ভাল। এর ব্যাপক উন্নয়ন ও বিস্তার ঘটাতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুহাম্মদ নূরুল হুদা
প্রকাশকাল : ১ এপ্রিল ২০০০, দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

ছাত্র রাজনীতি দশ বছরের জন্য নিয়ন্ত্রণ করা দরকার

প্রশ্ন : আপনি কমবেশি তিনটি শাসনকাল পেয়েছেন- বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। এ তিনটি শাসনকালের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আসলে প্রশ্নটি খুবই ব্যাপক। এ বিষয়ে ৫০/৬০টি বই রচিত হতে পারে। হয়তো হয়েছেও। অল্প কথায় এর জবাব দেয়া সত্যিকার অর্থেই সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলবো- বৃটিশ শাসন যা দেখেছি, একে দেখা বলা যাবে না। ১৯৪৭ সালে আমার বয়স ৭/৮ বছর। এ বয়সে একটি শাসনকে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তবু আমি পড়াশুনার মাধ্যমে যতটুকু জেনেছি তাতে বলা যায় তখন বৃটিশ সরকারের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য একটি উপনিবেশিক প্রশাসন ছিল । মানবাধিকারকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হতো না। এদেশের মানুষের উন্নতি, কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো না। প্রশাসনে ব্যাপক দুর্নীতি ছিল, জুলুম ছিল। রাজস্ব অফিসাররা খুবই দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল। পুলিশও খুবই দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল।

পাকিস্তান পিরিয়ড সম্পর্কে আমার ধারণা, পাকিস্তানের যে এলিটরা ছিল তারা নিজেদের সুপিরিয়র মনে করতো। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও মনে করতাম। আমার মনে পড়ে আমি সিভিল সার্ভিসের সদস্য হবার পর আমার মধ্যে গর্ব প্রবেশ করল। নিজেকে আলাদা ভাবতে লাগলাম। সবখানে না হোক কোনো কোনো জায়গায় আচরণে তার প্রকাশ হতো। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে এ অবস্থা আমার দু'এক বছরের বেশি ছিল না। ইসলামের উপর ব্যাপক লেখাপড়ার কারণে আমার ভিতরে পরিবর্তন আসে। আমি জনগণের সাথে মিশে গেলাম। কিন্তু এটি সত্য, সুপিরিয়র সার্ভিসের মধ্যে এটি প্রকাশ পেত। তবে এটিও সত্য তারা বেশিরভাগই যোগ্য ছিলেন, তারা দেশের প্রতি ডেডিকেটেড ছিলেন। তাদের মধ্যে কোনো উপনিবেশিক মনোভাব ছিল না। তারা দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন না। বাংলাদেশ পিরিয়ডে যদি আসি তাহলে বলা যায়, সব একই অবস্থায় রয়ে গেছে। তবে যোগ্যতা কমে গেছে। প্রশাসনে আগের চেয়ে দুর্নীতি অনেক বেশি।

প্রশ্ন : দুর্নীতি বাড়ার কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে পারবো না। একটি হতে পারে পলিটিক্যাল এলিট যারা তারা আগের তুলনায় অনেক দুর্নীতিগ্রস্ত। যেমন আমি যদি ইস্ট পাকিস্তানের দিকে যাই তাহলে দেখা যাবে যারা চিফ মিনিস্টার ছিলেন তারা আজকের তুলনায় কম দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন।

আসলে এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আমি বেশিদূর এগুতে চাই না। কেননা এটি অনেক গবেষণার ব্যাপার।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : যে দেশের ৮০% লোক আজও দারিদ্র্য-সীমার নিচে বাস করে সে দেশে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা কতটুকু উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আমি এখানে একটি নীতি কথা বলতে পারি এবং সেটি আমার মতোই বলবো। কেননা আমারও মত প্রকাশের অধিকার আছে। প্রথমত আমি বলবো, যে কোনো ধরনের অপচয়ের আমি বিরোধী। আমি শুধু কোনো বিশেষ ধরনের অপচয়ের বিরোধী এমন কথা বলবো না। কেউ স্তম্ভের বিরোধী কিন্তু অন্য অপচয়ের পক্ষে, আমি বলবো সেটি একই অপরাধ। আমাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা সার্বিকভাবেই অপচয় এবং দুর্নীতি দূর করা দরকার। আর ইসলামের দৃষ্টিতে যদি বলি এবং আমার বলাই উচিত, তা হচ্ছে এসব স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি ইসলামে বৈধ নয়। এ বিষয়ে অবশ্য আলেমদের মতামত নেয়া যেতে পারে। যা বৈধ নয় ৯০% মুসলিমের দেশে তা করার দরকার কী?

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বর্তমান ছাত্র রাজনীতিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন। কেউ কেউ বলেছেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার কথা। এক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর : সত্যি কথা বলতে কি, আমি দ্বিধান্বিত। অর্থাৎ কোনো মতে পৌঁছতে পারছি না। এটি ঠিক, আমাদের একটি সংবিধান আছে। সেখানে কিছু অধিকারের কথা বলা আছে। সে অধিকারের বিপরীতে কিছু করা ঠিক নয়। আইনের মাধ্যমে সমস্ত অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আমার মনে পড়ে, ৫/৬ বছর আগে একটি অনুষ্ঠানে আমি দাবি করে ছিলাম ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হোক। একটি পত্রিকায় দু'টি লাইন উঠেছিল। তখন আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। কেননা তখনকার পরিস্থিতি এখনকার মতো অনুকূলে ছিল না। এখন মনে হয় সবাই যেন চায় ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিতে, তখন কিন্তু কেউই চাইতো না। তারপরও আমি বলবো ছাত্র রাজনীতিটাকে ডিফাইন করতে হবে। আমরা কি বলতে চাচ্ছি, ছাত্রদের কি কোনো সংগঠন করার অধিকার থাকবে না? আমি মনে করি থাকবে। তারা কি ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে, দেশের সমস্যা নিয়ে কোনো মিটিং করতে পারবে না। আমি মনে করি পারবে। কিন্তু আমরা দেখছি এখন ছাত্র রাজনীতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খারাপ দিকে ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং অস্থায়ীভাবে অর্থাৎ ৫, ১০ কিংবা ১৫ বছরের জন্য এটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আরেকটি করা যেতে পারে ছাত্র সংসদের নির্বাচনগুলো বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে। ছাত্র সংসদ করতে হবে মেধাবী ছাত্রদের সিলেকশনের মাধ্যমে। ছাত্র রাজনীতির এবিউজের কারণে কি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা ঠিক? যেহেতু এবিউজ বেশি হচ্ছে, রক্তপাত হচ্ছে সেহেতু আমাদের চিন্তাভাবনা করতে হবে। আমরা বলছি বাংলা ভাষার জন্য ৪ জন লোক মারা গেছে বলে এত আন্দোলন করেছি। কিন্তু আমরা যে গত ১০/১৫ বছরে তিন চারশতের বেশি ছাত্র মেরে ফেলেছি, এটি নিয়ে কি কারো মাথা ব্যথা নেই। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু ছাত্র সংগঠন থাকবে না - এটি আমি ঠিক মনে করি না। ইসলামের স্বার্থেও ঠিক মনে করি না। যদি পুরোপুরিভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া হয় তবে তরুণ যুব সমাজের কাছে ইসলামী দাওয়াত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদিও ইসলামী চিন্তাবিদদের একটি অংশ মনে করেন ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমার মনে হয় হবে। তবে এটি বলা যেতে পারে, ছাত্র সংগঠনগুলো যদি রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি না করে তবে ছাত্র রাজনীতিও সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খাবে না। যাহোক, এটি আরো গবেষণার ব্যাপার। আমি এর বেশি বলতে চাই না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : একটি সময় বলা হতো মেধাবী ছাত্ররা ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্রশিবিরে যোগদান করতো। কিন্তু এ দু'টি ছাত্র সংগঠনেও এখন মেধাবী ছাত্রদের সমাবেশ ঘটছে বলে মনে হয় না। এর কারণ কি?

উত্তর : সঠিক কারণ ঠিক বলতে পারবো না। তবে দু'টি কারণ আমার বিবেচনায় এসেছে। একটি হলো বাম রাজনীতির পতন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মেধাবী ছাত্রদের কোনো আকর্ষণ বাম রাজনীতির প্রতি থাকার কথা নয়। আর ইসলামী ছাত্রশিবিরের কথা বলতে পারি, তারা এতটাই মার খেয়েছে এবং খাচ্ছে যে, কোনো ভালো ফ্যামিলি তার ছেলেকে এখানে আসতে দিতে রাজি নয়। আমার জানা মতে, এখন ছাত্রশিবিরে তারাই আসছে যাদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডে জামায়াতে ইসলামী রয়েছে। তারা তাদের ভাই-বোন-আত্মীয়-স্বজনদের এদিকে আসতে উৎসাহিত করছে। কিন্তু যেসব পরিবারে আগে থেকে দাওয়াত নেই অথচ ওই পরিবারে মেধাবী ছাত্র আছে, সেই পরিবারগুলো উৎসাহিত হচ্ছে না। আজকাল ছোট পরিবার হয়। তাই অনেকে সাহসী হচ্ছে না।

প্রশ্ন : আপনি একটু আগে বললেন, ছাত্র সংগঠন যাতে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর লেজুড়বৃত্তি না করে। কিন্তু আমাদের যে ট্র্যাডিশন, এটি কীভাবে সম্ভব?

উত্তর : রাজনৈতিক দল থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করা যাবে কিনা আমি জানি না। যতটা কম সম্পর্ক রাখা যাবে ততই ভালো। ছাত্র সংগঠনগুলোর নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেদেরই নেয়া ভালো? আসলে এটি চিন্তার বিষয়। এটি নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য দরকার।

প্রশ্ন : বর্তমান স্যাটেলাইটের যুগে ইসলামের প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে আপনার চিন্তাধারা কি?

উত্তর : মুরাদ হফম্যান বলেছেন, মিডিয়া যুদ্ধে মুসলমানরা হেরে গেছে। হেরে যাওয়া যুদ্ধে আবার জিতা যায় কিনা আমি জানি না। তবে হ্যাঁ, সুখের বিষয় বেশ কয়েকটি স্যাটেলাইট চ্যানেল এখন ইসলামের খেদমত করছে, আল জাজিরা টেলিভিশনের কথা আপনি শুনেছেন। এ ধরনের কিছু টিভি যদি পশ্চিমে হয়ে যায় তাহলে বড় কাজ হবে।

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনায় কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি?

উত্তর : এ প্রশ্নটি করা ঠিক কিনা জানি না। আমি এভাবে বলবো, পৃথিবীতে এমন কোনো রাষ্ট্র, সরকার, সংগঠন নেই যার কোনো সমস্যা হয় না। আমি নিশ্চয়ই বলবো ইসলামী ব্যাংক পরিচালনায় প্রশাসনিক সামান্য ছোটখাট সমস্যা আছে। আপনার প্রশ্ন যদি এটি হয়, আইনগত কোনো সমস্যা আছে কিনা - তাহলে আমি বলবো বর্তমানে আইনগত কোনো সমস্যা নেই। যদিও এ দাবি আছে যে, একটি পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং এ্যাক্ট হওয়া দরকার। ইসলামী ব্যাংক কনসালটেটিভ ফোরাম নামে যে প্রতিষ্ঠানটি আছে তাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংককে এ বিষয়ে লেখাও হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এটি পরীক্ষা করছে। তারপরও আমি বলবো, আমি যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর ছিলাম তখন এমন কিছু ধারা যোগ করে দেয়া হয়েছে যার ফলে ইসলামী ব্যাংকিং এর আইনগত অসুবিধা সব দূর করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান ব্যাংকিং যেটি আছে তাদের সাত/আটটি সেকশনে এমন সব পরিবর্তন করা হয়েছে যার ফলে ইসলামী ব্যাংকিং-এর আইনগত কোনো অসুবিধা আর নেই। হয়তো সব ব্যাংকার এটি ভালোভাবে জানে না। মালয়েশিয়ায় সেপারেট ইসলামী ব্যাংকিং এ্যাক্ট আছে। আমাদের এখানেও সেটি করা যেতে পারে। না করলেও যে খুব একটা ক্ষতি হচ্ছে আমি অন্তত তা মনে করি না। তবে সরকারের ভেতরে লোক থাকতে পারে যারা ইসলামী ব্যাংকিং পছন্দ করেন না। কিন্তু আইনে আমি কোনো অসুবিধা দেখছি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বিগত বছরে ইসলামী ব্যাংক বিরাট ব্যবসায়ী সাফল্য অর্জন করেছে। এর পেছনে কি কি বিশেষ উপাদান কাজ করেছে বলবেন কি?

উত্তর : তাদের যোগ্যতা ও সততার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের একটি স্বাতন্ত্র্য হলো তাদের ম্যানপাওয়ার সিলেকশন বেটার হয়েছে বলে আমার ধারণা। ম্যানপাওয়ার নেয়ার ব্যাপারে তারা যে সাবধানতা অবলম্বন করে তা বোধহয় কল্যাণকর হয়েছে। আর ইসলামী ব্যাংকে দুর্নীতি অলমোস্ট আননোন। দু'একটি রেয়ার দুর্নীতি ঘটতেই পারে।

প্রশ্ন : আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর : এদের টোটাল ডিপোজিট বোধহয় পাঁচ-ছয় পারসেন্ট। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তারা এর চেয়ে বেশি আর কি ভূমিকা রাখতে পারে? এটি সহজেই অনুমেয়। অর্থনীতির যে গতিধারা তা নির্ভর করে কতগুলো পলিসির উপর। আমার মনে হয় ইসলামী ব্যাংকগুলো সব মিলিয়ে ভালো কাজ করছে এবং তারা সোস্যাল সার্ভিসে চলে গেছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সমাজ উন্নয়নে খুব বড় ভূমিকা রাখছে। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে তারা প্রতি বছর দশ থেকে বিশ কোটি টাকা ব্যয় করছে। ব্যাংকিংয়ের ইতিহাসে এগুলো ছিল না। এর দেখাদেখি অন্যান্য ব্যাংকও তা শুরু করেছে। অতএব এ দিক থেকে ইসলামী ব্যাংককে পাইওনিয়ার বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন : অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেছেন, বিগত সরকার আনাড়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ভিত ধ্বংস করে দিয়েছে। এ বক্তব্য কতটুকু বাস্তবসম্মত এবং কতটুকু রাজনৈতিক?

উত্তর : এগুলো রাজনৈতিক বক্তব্য। সাইফুর রহমান সাহেব আমার শ্রদ্ধাভাজন। আমি কিবরিয়া সাহেবকেও সম্মান করি। আমি এও জানি সবার পারফরমেন্স সমান হয় না। সবার যোগ্যতা সমান হয় না। তারপরও বলবো কেউই দেশকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন না, রক্ষা করারই চেষ্টা করেন। অতএব যে বক্তব্য সাইফুর রহমান সাহেব বললেন, বেসিক্যালি এটি পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট। এটি কোনো অর্থনৈতিক কথা নয়। আওয়ামী লীগ আমলে যদি অর্থনৈতিক খারাপ দিক থাকে, তাদের ভালো দিকও ছিল। জিডিপি গ্রোথ পাঁচ-ছয় পারসেন্ট ছিল, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ছিল। আমি তো মনে করি আমি যদি কারো নিন্দা করতে চাই তাহলে আমি শুরু করবো এর ভালো দিকটা দিয়ে। আমাদের রাজনৈতিক কালচার এত খারাপ হয়ে গেছে যে, আমাদের মধ্যে সহনশীলতা আর নেই।

প্রশ্ন : অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেছেন, বিগত সরকার পান-বিড়ির দোকানের মতো নতুন ব্যাংক স্থাপন করেছে। এ নতুন ব্যাংক স্থাপনে অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বলে কি আপনি মনে করেন?

উত্তর : এ বক্তব্যও ঠিক নয়। আওয়ামী লীগ দশ/এগারোটি ব্যাংক অনুমোদন দিয়েছে। বিএনপি আমলেও তো ছয়টি ব্যাংকের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। কিছু বিদেশী ব্যাংক এসেছে। এটি সত্যি দু' সরকারের আমলেই রাজনৈতিক লবির প্রেসারে কিছু ব্যাংক হয়েছে। আমি মনে করি এতগুলো ব্যাংক না দিলেও চলতো। তাই বলে এগুলোকে পান-বিড়ির দোকানের সাথে তুলনা করতে হবে - এটি ঠিক নয়।

প্রশ্ন : আইএমএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ অনুসারে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পণ্যের উপর নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করেছে সরকার। ইতোমধ্যে তেল, গ্যাস, বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে।

www.pathagar.com

এতে জনদুর্ভোগ বাড়বে। প্রশ্ন হচ্ছে সরকার কি আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারতো না?

উত্তর : এ ব্যাপারে আমি একটি লেখা লিখেছিলাম। নীতিগতভাবে বলতে হচ্ছে আইএমএফ-এর সবকিছু ভালো এটি আমি বলবো না। আইএমএফ টিম আসে, দশ/পনের দিন থাকে। তাদের স্টাডিটা খুবই সীমিত। এর মধ্যে তারা একটি প্রেসক্রিপশন বের করে। এ প্রেসক্রিপশন সবসময় ভালো হবে তা আমি বলবো না। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রেসক্রিপশন আমরা পেয়ে আসছি গত ত্রিশ বছর ধরে, সে প্রেসক্রিপশনের ভিত্তিতে আমরা অন্তত তিনশ'/চারশ' মেডিসিন খেয়েছি। তাতে কি সব সমস্যার সমাধান হয়েছে? হয়নি। বরং তাদের কারণে অনেক দেশে ব্যাপক প্রবলেম সৃষ্টি হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া তাদের প্রেসক্রিপশন খেয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল। এ মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছে পেরুর কি অবস্থা। এটি সত্য আইএমএফ বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংককে আমরা অবহেলা করতে পারবো না। কিন্তু এও ভুলে গেলে চলবে না, এরাও স্বাধীন নয়। এরাও একটি বড় শক্তির তাবেদারী করে এবং সে শক্তির এজেন্ডা অনুসরণ করে। তাদের দ্রব্যের মার্কেটিং কীভাবে হতে পারে, তাদের স্বার্থ কীভাবে রক্ষা হতে পারে, এটি দেখে নব্বই ভাগ আর দশ ভাগ দেখে আমাদের কি লাভ হতে পারে। ঐ নব্বই ভাগ অর্জন করার জন্য আমাদের কিছু উন্নয়ন ঘটাতে হয়। তাদের মাল বিক্রি করতে গেলে আমাদের কিছু আয় বাড়াতে হবে। বেস্ট হচ্ছে গ্র্যাজিউয়্যালি আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসা। ঋণ নেয়া মানে হচ্ছে নতুন দাসত্ব। এই বেরিয়ে আসার জন্য যা যা করা দরকার তা করতে হবে। এটি এক বছরের ব্যাপার নয়। যত বছর লাগে সে চিন্তা আমাদের করতে হবে। মাত্র দেড়/দু' বছর আগের কথা, সাইফুর রহমান সাহেব একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, তারা আমাদের এক বিলিয়ন ডলারের মতো দেয়। আমাদের ইমপোর্ট, এক্সপোর্ট রেমিটেন্স নয় বিলিয়ন হয়। তারা যে এক বিলিয়ন দেয় তার মধ্যে কিছুটা পাইপ লাইনে পড়ে থাকে। ফুললি ডিসবার্স হয় না। এটি হলো দশ ভাগ। তাহলে আমরা যদি একটু হিসাবি হই, সচেতন হই, তাহলে অবশ্যই বের হয়ে আসতে পারি। কিন্তু পারি না কেন? পারি না রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একটি অংশ সচেতন নয়, বুরোক্র্যাটস্ সেনসিটিভ নয়। এসব ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না।

আর এই যে দাম বাড়ানোর ব্যাপার, সত্যিকার অর্থে যদি লস হয়, তাহলে লস রিকাভার করা উচিত। আমাদের কারেক্ট প্রাইসটা নেয়া উচিত। যদি না নিয়ে থাকি তাহলে আস্তে আস্তে নিতে হবে। কিন্তু দু'একটি সেক্টরে আমাদের ভর্তুকি দিতে হবে। যেমন, সারের ক্ষেত্রে। কৃষি হচ্ছে আমাদের জিডিপির ৩৮ ভাগ। কৃষিকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। তারা বলে আন্তর্জাতিক ইকোনোমিক প্রাইস নিতে হবে। এটি কেমন কথা। আমাদের দেশের কি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ইনকাম আছে?

প্রশ্ন : সরকারের একটি ওয়াদা ছিল স্বচ্ছ প্রশাসন। অথচ জ্বালানি মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে কোনোরকম পরামর্শ বা বিতর্কের উদ্যোগ সরকার নেয়নি। এমনকি মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। সরকার তার দেয়া প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসছে বলে কি আপনি মনে করেন?

উত্তর : স্বচ্ছ প্রশাসন মানে কি? এটি কি স্বচ্ছতা নয় যে, তারা মূল্যটা জনগণের মধ্যে ঘোষণা করেছে। তারপরেও একটি কথা থেকে যাচ্ছে, এর ভিত্তি কি? আমাদের পার্লামেন্টের মেম্বাররা কেন প্রশ্ন করছেন না যে, এ প্রাইসটার ভিত্তি কি? প্রশ্ন না করার জন্য জনপ্রতিনিধিরা দায়ী। সব সিদ্ধান্ত কি পার্লামেন্টের ডিবেটের বিষয়? পার্লামেন্টের মূল কাজ

www.pathagar.com

হলো আইন তৈরি করা। ফরেন পলিসি নিয়ে আলোচনা করা। যে কোনো পলিসি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু চিনির দাম কি হবে, চায়ের দাম কি হবে, চামড়ার দাম কি হবে, এটিও কি সংসদের সিদ্ধান্তের বিষয়? হ্যাঁ, হতে পারে যদি প্রশ্ন আকারে আসে। আই বিলিভ ইন ট্রান্সপারেন্সি। আবার ট্রান্সপারেন্সি'র নামে আমরা কি চাচ্ছি এটিও পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমরা কি চাচ্ছি, ট্রান্সপারেন্সি'র নামে সরকারের অধীনে যা কিছু আছে সবকিছু নিয়ে 'পার্লামেন্টে ডিবেট' হতে হবে এবং পার্লামেন্টের অনুমোদন লাগবে। এটি কি কোনো দেশে হয়? যদি না হয় আমি তার পক্ষে নই।

প্রশ্ন : আমাদের মাথাভারী প্রশাসন সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর : আমার মত হচ্ছে মাথাভারী প্রশাসন কমিয়ে আনতে হবে। আমি আমেরিকার কোনো ভক্ত নই। তবুও আমেরিকার কথা বলছি। সেখানে আমাদের যত মন্ত্রণালয় আছে তাদের ততগুলো নেই। তাদের সবকিছু প্রাইভেট সেক্টরে। তারা কীভাবে কো-অর্ডিনেট করছে এটি দেখার বিষয়। তাদের আট/দশটিটি মন্ত্রণালয় আছে। আমাদের দেশে ডিফেন্সসহ নয়/দশ লাখ কর্মচারী। আমি মনে করি গ্র্যাজিউয়্যালি সরকারি কর্মচারী পঞ্চাশ/ষাট ভাগ কমিয়ে ফেলতে হবে। অবশ্য সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করতে হবে, আর এটি দেশের নিরাপত্তার জন্যই করতে হবে। এটি ভাবার কোনো কারণ নেই যে, অনেক লোক বেকার হয়ে যাবে। ইকোনোমি রিস্ট্রাকচার হয়ে যাবে। গ্র্যাজিউয়্যালি লোকেরা অন্যদিকে চলে যাবে। এটি দুনিয়ার নিয়ম। এক সময় ঢাকা শহরে ঘোড়ার গাড়ি ছিল প্রচুর। এখন নেই, তাই বলে কি সবাই বেকার বসে আছে। ঢাকা শহরের রিকশা যদি উঠিয়ে দেয়া হয় তাহলে কি লোকেরা বসে থাকবে? তারা ক্রমান্বয়ে অন্যান্য পেশা বেছে নেবে। অবশ্য এসবই এক দিনে হয় না। সময় লাগে।

প্রশ্ন : বিএনপি জোট বিরোধী দলে থাকতে আওয়ামী সরকারের টাকার অবমূল্যায়নকে সমালোচনা করেছিল। কিন্তু তারা ক্ষমতারোহণের পরে নব্বই পয়সা টাকার অবমূল্যায়ন করলো। এর ব্যাখ্যা কি?

উত্তর : প্রথম কথা হচ্ছে আমরা আসলে খুব বেশি রাজনীতিপ্রিয় মানুষ। আওয়ামী লীগ শাসনামলে মুদ্রা অবমূল্যায়নে বিএনপির যে সমালোচনাগুলো ছিল এগুলো ছিল পলিটিক্যাল। আবার বিএনপি আমলে আওয়ামী লীগের যে সমালোচনা এটিও পলিটিক্যাল। বাস্তব কথা হচ্ছে আমাদের টাকার পারচেজ পাওয়ার যদি কমে যায় তাহলে তো মুদ্রার অবমূল্যায়ন করতেই হবে। এটির উত্তর অনেক বিস্তৃত। আমি এত গভীরে যাচ্ছিনে। আমি শুধু এটুকু বলবো, আমাদের টাকার মূল্য রিলেটিভ টু ফরেন ইনফ্লেশন 'রিভিউ' রাখতে হবে। রিভিউ করে অর্থনৈতিকভাবে যদি জাস্টিফাই হয় অবমূল্যায়ন করতে হবে। কারো কারো মত হচ্ছে একবার বিশ-ত্রিশ পারসেন্ট অবমূল্যায়ন করে ফেলা। কিন্তু তা মারাত্মক হতে পারে। আরেকটি মত হচ্ছে এটিই করতে হবে তবে একবারে নয় আস্তে আস্তে। এ পলিসি ফলো করা হয়েছে গত বিশ বছর ধরে। যদিও আমি এক সময় একবারে খুব বেশি অবমূল্যায়নের পক্ষে ছিলাম। যাহোক, আমার মনে হয় রাজনৈতিক বক্তব্য দ্বারা জনগণের প্রতারিত হওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন : মুদ্রার অবমূল্যায়ন হলেই পত্র-পত্রিকাগুলো হৈ চৈ করে কেন?

উত্তর : পত্রিকাগুলো যদি আমার উপর রাগ না করে, অর্থনৈতিক সাংবাদিকগণ যদি আমার উপর রাগ না করেন, দেশের জনগণ যদি আমার উপর রাগ না করেন তাহলে আমি বলবো পত্রিকার একটি অংশ তারা ঠিক অর্থনীতি বোঝেন না। আমি আগেই বলেছি আমরা রাজনীতি প্রিয় মানুষ, রাজনীতিটাকে আমরা খুব বেশি প্রশ্রয় দেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : নারীর বিপথগামিতার পেছনে আর্থিক দীনতা কতটুকু দায়ী?

উত্তর : অনেক কারণের মধ্যে এটিও একটি কারণ। একমাত্র কারণ নয়।

প্রশ্ন : খুব ঘটা করে বলা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের কথা। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে আপনি কি বোঝেন?

উত্তর : এটি ঠিকই আছে। আমি এটি এভাবে বলবো, বিশ্বে কিছু টার্মস আসে কাউকে বদনাম করার জন্য। যেমন ইসলামের ক্ষেত্রে ফেনাটিক, ফান্ডামেন্টালিস্ট কিংবা ইসলামকে বলে দেয়া পলিটিক্যাল ইসলাম। নারীর ক্ষমতায়ন ইস্যুটির কথা বলি। প্রকৃতপক্ষেই একদল চিন্তাবিদ আমেরিকাতে মনে করেছেন নারী বঞ্চিত হচ্ছে, তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসা দরকার। আবার এর পেছনে কিছু লোকের অসৎ চিন্তাও থাকতে পারে যে, নারীর ক্ষমতায়ন করলে নারীকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া যাবে। কার মনের ভেতরে কি আছে আল্লাহই ভালো জানেন। কিন্তু আমি মনে করি নারীর ক্ষমতায়ন হলে মুসলিম দুনিয়ার কল্যাণই হবে। নারী ইসলাম থেকে সরে যাবে না। যদি আমরা তাদের প্রপারলি ইসলাম জানাতে পারি, কুরআনকে যদি তাদের কাছে পৌছাতে পারি তাহলে নারীকে কেউ ইসলাম থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না। আমি বলি শুধু নারী কেন যে পিছিয়ে আছে সবার ক্ষমতায়ন দরকার, সবাইকে এগিয়ে নিতে হবে। নারীরা পিছিয়ে আছে - শুধু পিছিয়ে নয়, অনেক পিছিয়ে আছে। সুতরাং তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী চেষ্টা করা একটি ন্যায়সংগত আন্দোলন। বলা হচ্ছে নারী অধিকার মানব অধিকারের একটি অংশ। এটিতে আমি সম্পূর্ণ একমত। এটিকে আমি খারাপ অর্থে নেব কেন? তাদের মনে কি শয়তানী আছে সেটি আমি নেব কেন? আমি ভালো দিকটিই নেব। মুসলমানদের ব্যর্থতা হচ্ছে এখানে গত এক হাজার বছর ধরে নারীদের পেছনে ফেলে রাখা হয়েছে। এটি আমার কথা নয়। হাসান আল বান্নার জামাতা ড. সাঈদ রামাদান ১৯৬০ সালে মুসলিম উম্মাহর পশ্চাৎপদতার জন্য যে তিনটি সমস্যার কথা উল্লেখ করেন তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে মুসলিম নারীর অনগ্রসরতা। ড. সাঈদ রামাদান ইখওয়ানের একজন প্রথম সারির নেতা এবং প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ। ইসলামী চিন্তাবিদদেরকে আমি বলি উম্মতকে এগিয়ে নিতে হলে নারীদের অবশ্যই এগিয়ে নিতে হবে। কেননা রাসূলের (সা) উম্মতদের অর্ধেক নারী। তাদেরকে আমরা কি করে অবহেলা করি। তাদেরকে ফুললি এডুকেটেড করতে হবে। তাদেরকে সুযোগ দিতে হবে। নারীকে পিছিয়ে রেখে ইসলামের একটি ডাইন্যামিক সমাজ গঠন করতে পারবো না। নারীরা যদি সত্যি বিদ্রোহ করে বসে তাহলে ইসলামের সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : ভাসমান নারীরা রাজধানীসহ দেশের বড় নগরীতে ঘুরে বেড়ায়। এদের মধ্যে অনেক কিশোরীও আছে। এদের পিতা-মাতা কে জানে না এবং এরা বিকৃত রুচির পুরুষদের লালসার শিকার হয়। আবার পেটের তাগিদেও এরা নিকৃষ্ট পেশা বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। এদের ব্যাপারে কি কিছু ভাবছেন?

উত্তর : এটি হচ্ছে ওয়েস্টার্ন একটি খারাপ চিন্তার ফল, যেমন- পতিতাবৃত্তি থাকবে, এটি একটি পুরনো পেশা, এটি মানবাধিকার। আমি মনে করি এগুলো সবই ভুল এবং এ বিষয়টি নিয়ে আমি খুবই ব্যথিত। আমি বলতে চাই, নারী অধিকার যদি মানবাধিকার হয়ে থাকে তবে সে ধর্ষিতা হবে না এবং সে এভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে না। বাধ্য হয়ে লালসার শিকার হবে না, তার বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থা থাকবে। তার নিরাপত্তা থাকবে। তার ঘর থাকবে। তার অভিভাবক থাকবে। যার কোনো অভিভাবক নেই, সরকার তার অভিভাবক, এটিই ইসলামের আইন। আমার দুঃখ এ বিষয়গুলো আমাদের কোনো সরকারই উপলব্ধি করেনি।

www.pathagar.com

গভীর মানবিক সমস্যাগুলো উপলব্ধি করেনি। অথচ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধী দলের নেত্রীও নারী। অন্তত ঢাকা শহরের এই যে ভাসমান বিশ/ত্রিশ হাজার নারী, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে আমার আপীল তিন/চারটি ক্যাম্প করে তাদেরকে সেখানে স্থানান্তর করা হোক। তারপর তাদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করা হোক। আগেই পরিকল্পনা করতে পারবেন না। ব্যুরোক্র্যাটরা মানবেন না। তাদের বাধ্য করতে হবে। বেশিরভাগ ব্যুরোক্র্যাট চিন্তার ক্ষেত্রে পশ্চিমের অধীন। অতএব তাকে সোজা কথা বলতে হবে। আগে ভাগে পরিকল্পনা করে, এটি করবো সেটি করবো, আসলে কিছুই হয় না। গত একশ বছরে হয়নি। এ ব্যাপারে বেগম খালেদা জিয়ার উচিত ছিল একটি শক্ত নেতৃত্ব। আমাদের সরকারের বাজেট ত্রিশ হাজার কোটি থেকে চল্লিশ হাজার কোটি টাকার। কতভাবেই আমাদের বাজেটের টাকা খরচ করছি। অথচ এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আমরা করতে পারি না। বেশিরভাগ ব্যুরোক্র্যাটই এ ব্যাপারে সঠিক রাস্তা দেখাবে না। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ও বিষয়টি অবিলম্বে দেখতে পারে।

প্রশ্ন : দুর্জয় নামে ভাসমান নারীদের একটি সংগঠন আছে। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এনজিওদের সহায়তা আছে। উদ্দেশ্য ভাসমান নারীদের সংগঠিত করা। দ্বিতীয়ত, সামাজিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তৃতীয়ত, আদিম পেশার মাধ্যমে এদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করা। পাশাপাশি এনজিওরা ভাসমান নারীদের নিরোগ রাখার জন্য এইডস্ প্রতিরোধক বিতরণ করে। এনজিওদের এ উদ্যোগ কি মহৎ নয়?

উত্তর : এনজিওদের যা ভালো তা ভালোই বলবো, মন্দকে তো আর ভালো বলতে পারি না। একটু আগে ব্যুরোক্র্যাট-এর কথা বলেছি। এনজিওদের যে টপ লিডারশিপ তার বেশিরভাগ ওয়েস্টার্ন দাস। তাদের কাছ থেকে আপনি কি আশা করতে পারেন? পতিতাবৃত্তির সমূলে উৎপাটন করতে হলে আপনাকে ইসলামের কাছেই যেতে হবে। আমি মনে করি এনজিওদের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক নয়। এনজিওরা তাদের স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে এটি ভালো, সংগঠিত করছে এটি ভালো। কিন্তু এ পেশার মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করতে চাচ্ছে, এটি ঠিক নয়। মুসলিম সোসাইটি এটি কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারে না। আল্লাহতায়ালা যেটিকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন সেটিকে আমরা মানুষ এবং মুসলিম হিসেবে কীভাবে সমাধান মনে করবো। এ পেশার মাধ্যমে নারীর সম্মান রক্ষা করা যায় না। এটি অসম্মানের বিষয়। আমরা কি করে আমাদের মা-বোনদের এরকম ভাবতে পারি। এটি মানবতার জন্য এক ট্র্যাজেডি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুহাম্মদ নূরুল হুদা
প্রকাশকাল : ১৫-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পাক্ষিক দেশ অর্থনীতি

www.pathagar.com

এ দেশে ইসলাম কায়েম না হওয়ার পেছনে মূল সমস্যা হচ্ছে সকল পর্যায়ে লিডারশিপ তৈরি না হওয়া

প্রশ্ন : আপনি বাংলাদেশ সরকারের সচিব ছিলেন, রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। পেশাগত এসব কর্মকাণ্ডে আপনার ধ্যানধারণার প্রতিফলন কতটুকু ঘটাতে পেরেছিলেন?

উত্তর : আপনার মূল প্রশ্ন হলো এ ধরনের কর্মকাণ্ডে আমি ইসলামের কাজ করতে পেরেছি কি না? আমি বলবো পেরেছি। চাকরি জীবনে আমি সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম না বা রাজনীতি নিয়ে কথা বলিনি। আমার অফিসে যারা আসতেন তাদের কাছে আমি রাজনৈতিক কোনো আলাপ করিনি। আমি তাদের প্রধানত ইসলামের দিকে ডেকেছি। আমি তাদের বলেছি, এ দেশকে যদি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান, কুরআন সুন্নাহর আইন দেখতে চান, তাহলে আমাদেরকে পড়তে হবে। আমি সবাইকে পড়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছি। আমি তাদের কুরআনুল করীমকে পড়তে বলেছি, হাদিস পড়তে বলেছি। অগ্রসর (Advance) লিটারেচার পড়তে বলেছি। ইসলামী এডভান্স লিটারেচার মানে গত একশত বছরে যারা উচ্চমানের ইসলামী সাহিত্য রচনা করেছেন তাদের সাহিত্য পড়তে বলেছি। আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে - একশ' বছরের কথা কেন বললাম। আগের যুগের লেখকরা যে খুব বড় কথা বলেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে তাদের যুগের প্রতিফলন ঘটেছে। উদাহরণগুলো সেই যুগের, যে বিষয়গুলো তাদের বইতে ব্যবহার করেছেন সেটিও সেই যুগের। ফলে গত একশ' বছরে যারা এডভান্স বই লিখেছেন ইসলামের উপর তা আমি তাদের পড়তে বলেছি।

প্রশ্ন : কার কার বই আপনি দিয়েছেন?

উত্তর : নির্দিষ্ট কারো বই দেইনি। এ যুগের যারা শ্রেষ্ঠ স্কলার, যেমন- মাওলানা মওদূদী, সাইয়েদ কুতুব, ড. তাহা জাবিল আল আলওয়ানী, ড. জামাল বাদাবি, মোহাম্মদ আল গাজ্জালী, ইউসুফ আল কারযাভী, আমিন আহসান ইসলাহী, আবুল হাসান আল নাদভী- এ ধরনের যারা বড় লেখক তাদের বই আমি দিতে চেষ্টা করেছি। আমি নিজে কিছু বই লিখেছি সেগুলো প্রেজেন্ট করেছি। তারপর আমি অনেক লিফলেট তৈরি করেছি, যেগুলো ছিল অরাজনৈতিক ধরনের, সেগুলো বিতরণ করেছি। সুতরাং আমি আমার জীবনে অফিসিয়াল কাজের কোনো ক্ষতি না করে, ইসলামের কাজ করতে কোন প্রতিবন্ধকতা ফিল করিনি। সাবধান হয়েছি, সাবধানে থেকেছি, খেয়াল রেখেছি, যাতে আইন ভঙ্গ না করি। সেটি খেয়াল

www.pathagar.com

করে, অফিসের কাজ ফাঁকি না দিয়ে, ফাইল ওয়ার্ক বাদ না দিয়ে, আরেকটি বিশেষ কাজ আমি করেছি তা হচ্ছে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলকে ফেবার করিনি। আমি একটি পার্টিকে ভালোবাসি, তাই বলে তাদের পক্ষ নেইনি। আবার একটি পার্টিকে ভালোবাসি না, তাই বলে তাদের প্রতি অবিচার করিনি। ফলে আমার জীবনে এটি কোনো বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি।

প্রশ্ন : প্রশ্নগুলো এজন্য করলাম যে, স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে যেসব সরকার ছিল তার সব কটি সেকিউল্যার। সেকিউল্যার প্রশাসনে কাজ করতে আপনার অসুবিধা হয়নি?

উত্তর : আসলে সেকিউল্যারিজমের ব্যাপারটিও বুঝার বিষয়। একটি সেকিউল্যারিজম হয় মূলত তাত্ত্বিক সেকিউল্যারিজম, সেটি হচ্ছে পাবলিক লাইফ বা সামাজিক জীবনের সঙ্গে ধর্ম বা ইসলামের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু আমাদের দেশে যে সেকিউলারিজমের কথা বলা হচ্ছে সেটি সে রকম নয়। এখানে ধর্ম বা ইসলামেরও একটি ভূমিকা আছে। আমাদের দেশে যে সেকিউল্যারিজম চলছে সেটি আধাআধি সেকিউল্যারিজম পুরো সেকিউল্যারিজম নয়। সরকারের কাছে ইসলামের অংশ কিছু না কিছু রয়েছে। এটিই আমার বিশ্বাস। ফলে আমি মনে করি, বাংলাদেশে যে সেকিউল্যারিজম রয়েছে সেটি নামে সেকিউল্যারিজম। এটি এ পর্যায়ের নয় যেটি তত্ত্বগতভাবে বই পুস্তকে রয়েছে। সুতরাং আমরা ইসলামের কাজে তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা পাইনি।

প্রশ্ন : আপনি তো এখন অবসর জীবনযাপন করছেন। তো সময়গুলো কীভাবে অতিবাহিত করছেন?

উত্তর : আমাদের দেশে অবসর বলতে বোঝায় চাকরি থেকে অবসর। কিন্তু চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর আমি ভাবি কোনো রেগুলার চাকরি নেব না এবং আমার সময়টা ইসলামের জন্য ব্যয় করবো। সমাজ ও মানবতার কাজে ব্যয় করবো। আমি গড়ে চার-পাঁচ ঘন্টা পড়ি। এটি অত্যন্ত জরুরী জিনিস যেটি আমাদের লোকেরা করে না। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে দেয়া ভালো যে, আমরা সময় পাচ্ছি না, কিন্তু একটি লোক যদি গভীরভাবে পরিকল্পনা করে তবে সে তার সময়কে ভাগ করে নিতে পারে। যেমন, আমি বলি কারোরই উচিত নয় দশ ঘন্টার উপর চাকরি বা ব্যবসা বা জবে সময় দেয়া। চাকরিই হোক কিংবা ব্যবসাই হোক, দশ ঘণ্টার মধ্যে লিমিট করা উচিত। দ্বিতীয়ত ছয় ঘণ্টার উপর ঘুমানো উচিত নয়। তাহলে হলো ষোল ঘণ্টা। এছাড়াও কিছু বিবিধ কাজ আছে। সে কাজগুলো চার ঘণ্টা ধরি। তাহলে হলো বিশ ঘণ্টা। এরপরেও থাকে চার ঘণ্টা। এ চার ঘণ্টা সময় অবশ্যই আমরা ইসলামের পড়াশুনার জন্য ব্যয় করতে পারি। আমি নিজে যেটি করি সেটি হলো চার/পাঁচ ঘণ্টা পড়াশুনা করি। তারপর আমি দুটো ক্লাস চালাই। একটি ছেলেদের একটি মেয়েদের, যেখানে এডভান্সড ইসলামী কর্মী তৈরি করার চেষ্টা করছি।

প্রশ্ন : আপনি যে ক্লাসগুলো চালান, এগুলো আয়োজন করে কারা?

উত্তর : ১৯৮৯-৯০ এ আমার বাসাতেই ক্লাস করি। পরবর্তী সময়ে এটি সংগঠন আকারে রূপ ধারণ করে। মেয়েদের সংগঠনের নাম হয় উইটনেস বা আল্লাহর পথে সাক্ষী। ছেলেদেরটা 'পাইওনিয়ার', কুরআনের পরিভাষায় 'আসসাবেকুম' আল্লাহর পথে অগ্রবর্তী বা অগ্রগামী। আস্তে আস্তে তাদের কন্সটিটিউশন হয়। তাদের সেন্ট্র্যাল কমিটি হয়। তারা চলছে এবং কাজ করছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক এ যুগে ইসলামের যে মূল ইনটেলেকচুয়্যাল ইস্যুগুলো আছে এগুলো বুঝা এবং যেখানে ব্যাখ্যা করা দরকার ব্যাখ্যা করা, জবাব দেয়া, প্রয়োজনে বই করা, আর্টিকেল তৈরির প্রয়োজন হলে আর্টিকেল তৈরি

www.pathagar.com

করা। আমার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকে আমেরিকা, ইউরোপে চলে গেছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া চলে গেছে। তারা একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। পাইওনিয়ার ইন্টারন্যাশনাল নামে তাদের একটি ওয়েব সাইট আছে।

মূলত এটি ইন্টারনেট ভিত্তিক ইসলামী ইনটেলেকচুয়্যাল মুভমেন্ট আকারে বিরাট সংগঠনে রূপ লাভ করেছে। প্রসঙ্গত বলে নেই এটি একটি মধ্যবর্তী গ্রুপ। এক্সট্রিমিস্ট নয়। কুরআনের যে আয়াতে [বাকারা-১৪৩] আল্লাহতায়ালা বলেছেন- ওয়াকাজালিকা জায়ালনাকুম উম্মাতাওঁ ওয়াছাতাল লিতাকুনূ শুহাদা-য়া আলান নাসি... সে আয়াতের ভিত্তিতেই তারা মধ্যবর্তী হয়েছে। তারা সেই স্ট্রীম ইসলামী মুভমেন্ট যেগুলো দুনিয়াতে রয়েছে তাদের সাথে মিলেই কাজ করছে। যেমন- ইখওয়ানুল মুসলিমুন, জামায়াতে ইসলামী, আরবাকানের পার্টি, তুরাবীর পার্টি, আনোয়ার ইব্রাহিমের পার্টি, নাহায়তুল উলামা মোহাম্মদীয়া বলতে যে মেইন স্ট্রীম বুঝি তাদের সাথে মিলে কাজ করছে। এটি তো গেল একটি দিক। প্রশ্ন ছিল আমি কীভাবে সময় কাটাই? সেখানেই আমি ফিরে আসি। চার/পাঁচ ঘণ্টা পড়ি, এ দুটোতে ক্লাস করতে হয়। তারপর ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরোর আমি সভাপতি, সেখানে আমাকে সময় দিতে হয়। তারপর আমি ইবনে সিনা ট্রাস্টে আছি, সেখানে সময় দিতে হয়। আমি মানারাত ট্রাস্টে আছি, সেখানে সময় দিতে হয়। চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর যে ক্যাম্পাস ঢাকায় হয়েছে আমি তার প্রধান। প্রশাসনটি আমাকে দেখতে হয়। সেখানেও আমাকে কয়েক ঘন্টা সময় দিতে হয়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর আমি একজন ডাইরেক্টর, সেখানে আমাকে সময় দিতে হয়। এছাড়া আরো অসংখ্য সংগঠনের সাথে আমি জড়িত। এছাড়া বাংলাদেশে যেসব ইসলামী মুভমেন্ট রয়েছে তাদের নেতৃবৃন্দ আমার বন্ধু-বান্ধব। তাদের অনেকের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়। তাদের অনেক সময় পরামর্শ দিতে হয়। কখনো কখনো নেন, আবার কখনো কখনো আমি নিজে দিয়ে আসি। এছাড়া বিভিন্ন সেমিনার সিম্পোজিয়ামের দাওয়াত পাই, তাতে আমি শরিক হই। বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকে আমি শরিক হই। আমি কিছু লিখি, এখানেও সময় দিতে হয়।

প্রশ্ন : এরা কি কোনো সিলেবাস অনুসরণ করে?

উত্তর : আমি তাদের প্রথম পড়িয়েছিলাম ড. জামাল আল-বাদাবি'র কিছু লেকচার। ড. আল্লামা জামাল আল-বাদাবি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতা। তিনি এক হাজার লেকচার তৈরি করেছিলেন। আমি তখন এক-দুইশত লেকচার ওখান থেকে নেই। নুরুল আনোয়ারকে ভিত্তি করে আমি উসূল আল ফিকাহ শিখাই। পরবর্তীকালে ইংরেজিতে ড. হাসেম কামালীর উসুলের উপর আরো ভালো বই পেয়ে যাই। তিনি একজন আলেম। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ড. কামালীর বইয়ের ভিত্তিতে আমি উসূল পড়াই। আরবিতে উসূলের যত কাজ হয়েছে ড. হাশিম কামালী তা একত্রে নিয়ে এসেছেন। আমি এটিকে সামারাইজ করে চল্লিশ পৃষ্ঠায় নিয়ে এসেছি। যে কেউ চাইলে ইন্টারনেটের ওয়েব সাইট থেকে এটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

যা হোক প্রথমে আমি তাদের উসূল পড়াই। তারপর আমি ইসলামী ল' পড়ালাম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামী আইনের উপর একটি বিরাট কাজ করেছে "বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন" নামে। সঙ্গে সঙ্গে ল'-এর উপর আরো কিছু ইংরেজি বই পেয়ে যাই। এসবের উপর ভিত্তি করে আইনগুলো পড়িয়েছিলাম। তারপর আমি ইসলামী অর্থনীতির উপর সিরিজ লেকচার দিতে থাকলাম। এরপর আমি আকীদার উপর পড়ালাম। বিশেষ করে মোহাম্মদ আল গাজ্জালীর 'আকিদাতুল ইসলাম' বইটিকে ভিত্তি করে আকীদা পড়িয়েছিলাম। পুরানো

www.pathagar.com

আকীদার বইগুলোর তুলনায় এ বই অনেক উন্নতমানের। পুরানো ঝগড়াঝাটি যেগুলো ঐ যুগের মুত্তাজিলা, আশারিয়া এবং আহলে সুন্নাহর মধ্যে ছিল তা তিনি সম্পূর্ণ পরিহার করে কোনোরকম এক তরফা দৃষ্টিকোণ গ্রহণ না করে একটি সুন্দর বই লিখেছেন। আমি তো মনে করি মাদরাসাতে এখন যদি আকীদার উপর কোনো বই প্রেসক্রাইব করতে হয় তাহলে মোহাম্মদ আল গাজ্জালীর আকিদাতুল ইসলামকে আনা দরকার। তিনি গত বছর ইন্তেকাল করেছেন। আমি তাদেরকে কোর্সের মধ্যে নিয়ে গেলাম এবং তাদের বললাম, তোমাদের মূল ফোকাস হবে 'র‍্যাপিড ইনটেলেকচুয়্যাল আপ গ্রেডেসান'। ঈমান, আখলাক, তাকওয়া, ইসলামের মৌলিকত্ব বিষয় তো লাগবেই। সবচাইতে বড় কথা হলো র‍্যাপিড ইনটেলেকচুয়্যাল আপ গ্রেডেসান করতে হবে। যেহেতু এটি ইন্টারনেটের যুগ। তাই সারা গ্লোবে ইসলামের যে ইস্যুগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে সেগুলো পৌছাতে হবে। তাদের যেসব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর কথা বললাম তার একটি হলো উসূল আল ফিকাহর জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ ইউসুফ আল কারযাভী বলেছেন, যত বিভ্রান্তি তার মূল কারণ হচ্ছে উসূল আল ফিকাহর মাধ্যমে ইসলাম না শিখা। কারণ কুরআন হাদিসের কোনো ব্যাখ্যা যথার্থভাবে করা সম্ভব নয় উসূল আল ফিকাহর জ্ঞান ছাড়া। তেমনিভাবে নারী পুরুষের Gender এর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে আমি প্রথমে স্বীকার করে নিই যে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। খুব গোড়া দৃষ্টিভঙ্গি আছে, খুব উদার দৃষ্টিভঙ্গি আছে, মধ্যপন্থি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এখানে আমরা একটি মধ্যপন্থি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছি। যার মূল প্রবক্তা হচ্ছেন এ যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ আলেম। যেমন- ইউসুফ আল কারযাভী, মোহাম্মদ আল গাজ্জালী, আবদুল হালিম আবু শুক্কাহ, ড. হাসান তুরাবী, ড. জামাল আল-বাদাবি - এ সমস্ত আলেমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেন, আমরা সে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলাম। আপনাকে তো একটি গ্রহণ করতেই হবে। তাই আমরা মধ্যপন্থাটি গ্রহণ করলাম এবং আমরা যে জ্ঞান অর্জন করলাম তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাইলাম।

গণতন্ত্র সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি আছে সেটি আমরা দূর করার চেষ্টা করছি। এটি অনেকেই জানে না গণতন্ত্র এবং ইসলামের সম্পর্ক অনেক নিকটে। গণতন্ত্রের অনেক কথাই ইসলামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। গণতন্ত্রে যে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে, নির্বাচিত সরকারের কথা বলা হয়েছে, জনগণের সরকারের কথা বলা হয়েছে, মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে, স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সবই ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ। ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো তখন প্রশ্ন উঠল, আমাদের সংবিধানে আমরা গণতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করবো কি না। আলেমেদীন সকলে একমত হলেন যে, গণতন্ত্র শব্দ ব্যবহার হবে। সংবিধানে Where in the principle of democracy equality freedom and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed শর্ত লাগিয়ে দিলেন। কারণ প্রত্যেক শব্দেই তো আপত্তি করা যায়। ফ্রিডম শব্দে আপত্তি করা যায়, ইসলামী ফ্রিডম আর অন্য ফ্রিডম ভিন্ন। ইকুয়ালিটিতে আপত্তি করা যায়। কারণ ইসলামী ইকুয়ালিটি আর অন্য ইকুয়ালিটি এক নয়। অর্থাৎ যে কোনো শব্দেই আপত্তি করা যায়। কিন্তু আমাদের সেই গ্রেট আলেমরা ১৯৪৮ সালেই সমস্যার সমাধান করে দেন। কিন্তু এ কথা অনেকেরই মনে নেই, তারা শুধু একটি কথাই পেয়েছে, জনগণের সার্বভৌমত্ব। যারা গণতন্ত্র বিরোধী তারা কি সামরিকতন্ত্র চাচ্ছেন? তারা কি বাদশাহী চাচ্ছেন? নাকি তারা নির্বাচন চাচ্ছেন? আজকের গণতন্ত্র অর্থই হচ্ছে মূলত নির্বাচিত সরকার। এ কথাটি বুঝতে হবে এখানে আমি একটি উসুলের কথা বলতে চাই। উসূলে একটি আলোচনার শব্দের

www.pathagar.com

ক্লাসিফিকেশন - সেখানে হাকিকি এবং মাজাজি শব্দ বলা হয়। হাকিকি মানে Literal এবং মাজাজি মানে হচ্ছে রূপক। যদি রূপক অর্থ হাকিকির উর্ধ্বে চলে যায় যেখানে মাজাজি অর্থ প্রাধান্য পেয়ে যায়, সেখানে মাজাজি অর্থ এখন নিতে হবে। ডিভর্স শব্দের মূল অর্থ একটি, কিন্তু সে অর্থে তালাক শব্দ ব্যবহৃত হয় না। তালাক শব্দের মূল অর্থ হয়ে গেছে ডিভর্স এবং এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে নির্বাচন, পলিটিক্যাল পার্টি, ফ্রিডম, ইকুয়ালিটি, ইলেকশন প্রসেস এবং রুলস অব ল এসব জিনিস। এমন অনেক রাজনৈতিক স্কলাররা আছেন যারা বলেন 'জনগণের সার্বভৌমত্বের কোনো থিওরিরই প্রয়োজন নেই। যদি থেকেও থাকে তাহলেও তৎকালীন পাকিস্তানী আলেমরা এর সমাধান করে দিয়ে গেছেন এ কথা বলে যে, এই ইসলামী দেশে সেই গণতন্ত্র হবে যেটি হবে ইসলামী গণতন্ত্র। এখানে জনগণের সার্বভৌমত্ব থাকবে না। এখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব থাকবে। এখানে গণতন্ত্র থাকবে তবে তা থাকবে আল্লাহর আইনের অধীনে। গণতন্ত্র নিয়ে এ ভুল বোঝাবুঝি চলছে, এ সমস্যা দূর করার দায়িত্ব নিতে হবে অগ্রসর আলেমদের। ড. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী "Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase" নামে একটি বই লিখেছেন। ইচ্ছে করলে যে কেউ ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তিনি গণতন্ত্রের প্রতি সিরিয়াস সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, মুসলিম দেশে যখন গণতন্ত্র হবে তখন তা ইসলামের ভিত্তিতেই হবে। গণতন্ত্রের অন্য অর্থকে প্রাধান্য দেয়ার অর্থ হচ্ছে শত্রুর চক্রান্তে পা দেয়া। আমি আপনাকে পরিষ্কার বলছি, ইসলামের শত্রুরা তাই চায়।

প্রশ্ন : গণতন্ত্রে তো একজন অসৎ লোকও নির্বাচিত হয়ে আসতে পারে।

উত্তর : সেটি তো খিলাফতেও হতে পারে। খিলাফতের নামে কি হয়েছে? উমাইয়া বাদশারা কি করেছে? আব্বাসীয় বাদশারা কি হয়েছে? সেটি তো খিলাফতের নামেই হয়েছে এবং সে যুগের আলেমরা তো অনেক কিছু মেনেও নিয়েছিলেন। তারা হয়তো মনে করেছেন এছাড়া আর উপায় নেই। সুতরাং আপনি যদি মিস ইউজের কথা বলেন তাহলে তো আমি বলবো সর্ব অবস্থায় অপব্যবহার হতে পারে। এমন একটি বিষয় বলেন যেখানে অপব্যবহার হচ্ছে না। মিস ইউজের উপর আপনি ভিত্তি করতে পারেন না। আমরা ইসলামের কথা বলছি। ইসলাম এক যুগের নয়, এক দেশের নয়, এক এলাকার নয়, এক ব্যক্তির নয়। উসূলি কথা বলার সময় আপনি একটি জিনিসকে হাইলাইট করতে পারবেন না। গণতন্ত্রের এত বিপদ থাকা সত্ত্বেও এ দেশের মানুষ কি বলছে? বলছে গণতন্ত্রের কথা। আল্লামা ইকবাল গণতন্ত্র পছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন হ্যাঁ, ইসলামে গণতন্ত্র আছে, তবে সেটি রুহানী গণতন্ত্র।

প্রশ্ন : আমাদের দেশের ইসলামী দলগুলো বিপ্লবের কথা বলে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিপ্লব কীভাবে সম্ভব?

উত্তর : আমার জানা নেই তারা এসব কথা বলে কি না? আমার মনে হয় তারা বলেন না। বিপ্লব বলতে যদি সামরিক বিপ্লব মনে করে তবে সেটি আইনসম্মত নয় এবং তাদের কোনো সংবিধানে এ ধরণের কথা বলা নেই। তারা প্রাইভেট ড্রইং রুমে কি বলেন আমার জানা নেই। তাদের কোনো ডকুমেন্টে আমি দেখিনি যে, তারা বলেছেন যে, তারা সামরিক বিপ্লব করবেন। এটি একটি রাজনৈতিক পরিভাষা, যে কোনো পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা হয়। আর এ পরিবর্তন যদি গণতন্ত্রের পথে হয় এটিও বিপ্লবই। যদি কোনো ইসলামী পার্টি মনে করে অস্ত্রের জোরে কিছু করবে তাহলে আমি বলবো এটি সেই যুগ নয়, বাংলাদেশে এমন কিছু করা যাবে না। আমার এ ৬০ বছর বয়সে পরিষ্কার মত দিচ্ছি - কেউ যদি এটি করে তবে

www.pathagar.com

ধ্বংস হবে, এ রাস্তা পরিহার করতে হবে এবং বৃদ্ধি করতে হবে ইসলামের দাওয়াত, প্রচার-প্রকাশনা বাড়াতে হবে। নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে। আসল সমস্যা আমরা ভুলে গেছি। কেননা যোগ্য লোক তৈরি করাই আসল সমস্যা। সার্বিকভাবেই আমি বলছি এ দেশে যোগ্য লিডারশিপের অভাব রয়েছে। এ দেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা ৫০টি বই পড়েই মনে করে আমরা বড় বড় আলেম হয়ে গেছি। পাঁচ'শ, সাত'শ, এক হাজার বই না পড়লে কি সে নিজে কোনো বড় কাজ করতে পারবে?

এদেশে ইসলামী আন্দোলনগুলো তাদের বৃত্তের ভিতরকার আলেমদের বই ঘুরে ফিরে পড়বে, অন্য কে কি বললো সে দিকে তাদের জানার অনীহা রয়েছে। একটি দল তো আছে তারা শুধু একটি বই পড়বে। এমনকি তারা কুরআন পড়তেও খুব বেশি উৎসাহ বোধ করে না। তাফসীর পড়াকেও উৎসাহিত করে না। তাহলে আপনি বলেন, তারা ইসলামী বিপ্লব কীভাবে করবে? ১৯৪৭ সালের পর এদেশে ইসলামের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। অবশ্য সেটি খুব বেশি নয়। এখন এ দেশে ইসলাম কায়েম না হওয়ার পেছনে মূল সমস্যা হচ্ছে সকল পর্যায়ে লিডারশিপ তৈরি না হওয়া। যেমন ধরুন, প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের কথা। তিনি স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব কেন? পড়াশুনার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. আবদুর রব স্বীকৃত ব্যক্তি কেন? কারণ একটি বিষয়ে স্পেশালিস্ট তিনি। তাই তিনি স্বীকৃত। তাই বলছিলাম ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের, নেতাদের স্পেশালিস্ট হতে হবে। বেশি অধ্যয়ন করলে জ্ঞানের পুঁজি বৃদ্ধি পাবে। পুঁজি কম হলে কি ব্যবসা হয়? লেখাপড়া না করলে দাওয়াতে ব্যাপকতা বৃদ্ধি করা যাবে না।

প্রশ্ন : আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করছি যারা ইংরেজি বা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদের সাথে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের চিন্তা-চেতনায়, মন-মননে কিছুটা অমিল রয়েছে। এর কারণ কি?

উত্তর : এখানে আমি দুটো কথা বলবো। ইংরেজি শিক্ষিতদের ভুল আছে, উনাদেরও ভুল আছে। ইংরেজি শিক্ষিতদের ভুলটি হলো তারা আরবি শেখে না। যেমন আমি আলেমদের মতো আরবি জানি না। যদিও দু'বছর আরবি কোর্স করেছি, তাতে আমার অনেক সুবিধা হয়েছে। আমি অল্প বয়সে উর্দু শিখে নিয়েছি। ফলে সারা ভারতের আলেমদের চিন্তাধারা আমার জানতে সুবিধা হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের উচিত আরবি শেখার ব্যাপারে আরো যত্নবান হওয়া। আর মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের ভুলটি হলো তাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়। বিশেষ করে কওমী মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান সময়, যুগ ও ইসলামের চাহিদা পূরণ করছে বলে আমার মনে হয় না। এ বিষয়ে আমি দুটো কথা বলে বিষয়টি ক্লিয়ার করতে চাই। একটি কথা হচ্ছে আজকে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দেয় কেন? জামেয়া কামরাঙ্গীরচর কিংবা জামেয়া লালবাগ দেয় না কেন? তার একটি উত্তর, দুনিয়া চালাতে যে জ্ঞানের দরকার তা জামেয়া লালবাগ কিংবা জামেয়া কামরাঙ্গীরচরে নেই। দুনিয়া চালাতে কম্পিউটার সাইন্স, অর্থনীতি, বিবিএ, এমবিএ, লোক প্রশাসন লাগবে। অর্থাৎ দুনিয়া চালাতে যা প্রয়োজন তা মাদরাসায় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই দেশ চালাবার লিডারশিপ গড়ে উঠছে না। এ দোষ তো তাদেরই। তারা করে কি, একটি দাওরা ডিগ্রি দেয়। তারা কিছু আরবি শিখায়, কিছু হাদিস শিখায়। আমি একটি প্রবন্ধে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, আপনারা যদি রোল প্লে করতে চান, তাহলে আপনাদের নতুন আরো একটি ডিগ্রি খুলতে হবে। জামেয়া বা ইউনিভার্সিটি মানে হচ্ছে এখানে একটি ডিগ্রি দেয়া হয় না। এখানে অনেকগুলো বিষয় পড়নো হয়। আমেরিকার হার্ভাডে একশ বিষয় পড়ানো হয়।

www.pathagar.com

সেখানে কওমী মাদরাসায় অন্তত আপনারা অর্থনীতিটা ঢুকিয়ে দিন। দুনিয়ার সাথে সংগতি রেখে যদি বিষয়গুলোকে পুনর্বিন্যাস করা না হয় তাহলে লিডারশিপ উঠে আসবে না। আমাদের একটি বিষয়ে চিন্তা করতে হবে যে কোন বিষয়ে আপগ্রেড হচ্ছে। যেমন- অর্থনীতির বইটি যখন পড়ি তখন একশ' বছর আগের বইটি পড়ি? সুতরাং আল্লাহর কালাম ছাড়া, রাসূলের কথা ছাড়া যে কোনো বিষয়ের শেষ বইগুলো পড়তে হবে। আমাদের শেষ বইগুলো আনতে হবে। আগের তাফসীরগুলো কোর্সে আনা উচিত রেফারেন্স হিসেবে। কিন্তু পড়তে হবে কারেন্ট তাফসীর। তেমনি ফিকাহর ক্ষেত্রে, আজকের যে কাজগুলো হয়েছে সেগুলো আনতে হবে মেইন হিসেবে। আর আগেরগুলো নিয়ে যেতে হবে রেফারেন্স হিসেবে। কিন্তু এটি তারা করছেন না। ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও তাদের একটি অনীহা রয়েছে। এটি বাস্তব যে ইংরেজি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড লেংগুয়েজ। তাই এ ভাষা শিখলে সবচাইতে লাভ বেশি আমাদের। ওরা তো চায় আমরা ইংরেজি না শিখি। আমরা ইংরেজি শিখবো এজন্য যে, ইংরেজি শিখে আমরা তাদেরই পরাজিত করবো। কিন্তু আমরা ইংরেজি শিখছি না। শুধু ইংরেজি বলি কেন? বাংলাও ভালো করে শিখেন না। তারা ইন্টারনেট জানে না। কম্পিউটার সাইন্স বলতে তারা বোঝে টাইপ করা। সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে, তাদের অনেকে মনে করেন সবাই তাদের কাছে যাবে। ঠিক তারা রাসূলুল্লাহর (স) উল্টা পথ ধরেছেন। রাসূল (স) সবার কাছে যেতেন। রাসূল (স) মক্কাতে ঘুরতেন, তায়েফেও গিয়েছেন, আশেপাশের শহরগুলোতে গিয়েছেন, লোকদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। অথচ আমাদের অনেক আলেম তা করেন না।

যা বলছিলাম, আমাদের আলেমদের কোনোদিন দেখিনি তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচারদের এপ্রোচ করেছে।

প্রশ্ন : তাদের তো সে সুযোগ থাকতে হবে।

উত্তর : তারা যাচ্ছে না কেন? তাদের তো সুযোগ আদায় করে আনতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি তাদের বন্ধু-বান্ধব নেই?

প্রশ্ন : তারা তো বলছে অন্য কথা। একটি সময় সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে একরকম শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। বৃটিশরা আসার পরই শিক্ষা ব্যবস্থা দুটো হয়ে গেল। বৃটিশরা চাইলো ইসলাম শেষ হয়ে যাক। তখন অস্তিত্ব রক্ষার্থেই কওমী মাদরাসার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এ প্রজন্ম মাদরাসা শিক্ষাকে ঠিক মেনে নিচ্ছে না।

উত্তর : এটি ঠিক, এক সময় অবিভক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল এবং এটিই হতে হবে। আমি আবার বলছি এটিই হতে হবে। কিন্তু যতদিন না হচ্ছে- আমি যেটি বললাম সেভাবে ঐ শিক্ষাকে আপগ্রেড করতে হবে। আমি একটি বাড়ি করলাম। এটিকে কি প্লাস্টার করবো না? চুনকাম করযবন না? যতক্ষণ না শিক্ষা ব্যবস্থা এক হচ্ছে ততক্ষণ তো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থা এক হওয়া তো অনেক দূরের ব্যপার। আমার মনে হয় অনেক কঠিন। এটি নির্ভর করে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ওপর। ততদিন পর্যন্ত কি আমাদের সিস্টেমকে উন্নয়ন করতে হবে না? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের সিস্টেমকে আপগ্রেড করছে না?

প্রশ্ন : এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তো সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কওমী মাদরাসাগুলোকে তা করছে না।

উত্তর : আমাদের জানতে হবে সরকারের উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আলেমেদীনদের অনগ্রসরতার কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আমার মনে হয়, তারা আধুনিক সভ্যতার সমস্যাগুলো জানতে চেষ্টা করছেন না।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন তারা অহংকারী বলে এগিয়ে আসছেন না?

উত্তর : এ রকম অহংকার আছে কিনা আমি জানি না, হয়তো বা নেই। যদি থেকে থাকে তবে অন্যায়। কারণ ইসলামে অহংকারের কোনো জায়গা নেই। আমরা হাদিসও জানি, যার দিলে এক বিন্দু অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমার মনে হয় আধুনিক বিষয় নিয়ে তাদের লেখাপড়া একেবারেই কম। তারা যদি চিন্তাভাবনা করতেন তাহলে ভাবতেন যে আধুনিক দুনিয়া কি ভাবছে, সমস্যাগুলো কোথায়, আজকে আমাকে কি মোকাবিলা করতে হবে? আজকে তো আমি মোতাজিলা আশারিয়া মোকাবিলা করছি না, আজকে আমি মোকাবিলা করছি মার্ক্স, হেগেল, কান্ট অথচ তাদের মাথায় এগুলো আসছে না। সুতরাং আমার মনে হয় এটি একটি বড় কাজ হবে যদি আলেমেদীনরা এ দেশে মাদরাসা শিক্ষাকে আপগ্রেড করেন।

প্রশ্ন : শিক্ষা ব্যবস্থার কথাই যখন আসলো তখন একটি প্রশ্ন, একটি দেশে একসাথে অনেকগুলো শিক্ষা ব্যবস্থা চললে দেশের কল্যাণ কতটুকু হয়?

উত্তর : এ বিষয়ে আমার পুরো জ্ঞান নেই। কিন্তু আমার মনে হয় এটি একেবারে অসম্ভব নয়। দুই তিন ধারায় শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে পারে। যেমন হোমিওপ্যাথ শিক্ষা ব্যবস্থা, এলোপ্যাথিক মেডিকেল সিস্টেম যা ইউরোপের কোনো কোনো দেশে আলাদা আলাদা ভাবে পড়ানো হয়।

প্রশ্ন : ওটি ঠিক আছে। আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় দূরত্বটা কি বাড়িয়ে দিচ্ছে না? ইংরেজি শিক্ষিতরা মাদরাসার ছেলেদের বলছে কাঠমোল্লা। আবার মাদরাসার ছেলেরা ইংরেজি শিক্ষিতদের বলছে জাহান্নামের লাঠি। এ দূরত্বকে কি পরিহার করা যায় না?

উত্তর : আপনার কথা ঠিক। কিন্তু আমি বলছি শিক্ষা ব্যবস্থা দু'তিন রকম হতে পারে না এমনটি নয়। যদি প্রত্যেকটি সঠিক হয় তাহলে অসুবিধা নেই এবং এই দূরত্ব দূর করাও কঠিন, যেটি আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এটি দূর করতে সময় লাগবে। আমি এক হওয়ার পক্ষে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির আদলে তৈরি করার জন্য অনেক বড় আলেম দরকার। সে আলেম কোথায়? আমাদের দেশের আলেমরা কি গত ৫০ বছরে ৫টি অগ্রসর বই লিখেছেন? মাওলানা আকরাম খাঁর 'মোস্তফা চরিত' এর মতো কয়টি বই রচিত হয়েছে? ইউসুফ আল কারযাভীর 'ইসলামের যাকাতের বিধান' এর মতো কয়টি বই গত ৫০ বছরে এ দেশে রচিত হয়েছে? মোহাম্মদ আল-গাজ্জালীর 'আকিদাতুল ইসলাম' এর মতো কয়টি বই এদেশে রচিত হয়েছে? আমি তো মাওলানা আকরাম খাঁর 'মোস্তফা চরিত' ছাড়া কোনো বই দেখছি না। আমার উপর আলেম সমাজ রাগ করতে পারেন; কিন্তু আমি সত্যের খাতিরে বলছি, আমরা এ পর্যায়ের বই লিখতে পারিনি। কিন্তু কেন? এ পর্যায়ের বই আল-আজহার থেকে প্রতি বছর একাধিক বের হচ্ছে। আমাদের হচ্ছে না কেন? আল-আজহার থেকে ইউসুফ আল কারযাভী, মোহাম্মাদ আল গাজ্জালী, সাইয়েদ কুতুব, হাসানুল বান্না বের হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে বের হচ্ছে না কেন? আমাদের দেশে আল্লামা ইকবাল তৈরি হচ্ছে না কেন? মাওলানা মওদূদী তৈরি হচ্ছে না কেন? আমিন আহসান ইসলাহী তৈরি হচ্ছে না কেন? এ বিষয়টি তো তাদেরকে বুঝতে হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : সউদি আরবের শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখা যায় ইসলামী ঐতিহ্য এবং বুনিয়াদকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে কি এমনটি হতে পারে?

উত্তর : স্বীকার করতেই হবে সউদি আরব শিক্ষার ক্ষেত্রে এডুকেশন সিস্টেমটাকে ইসলামের খুব নিকটবর্তী নিয়ে এসেছে। এটি খুব বড় অর্জন। অবাক হবেন পাকিস্তানের স্কুল কারিকুলামে ইসলামের স্থান খুব ভালো। যদিও সেখানে নানান ধরণের সমস্যা আছে। কিন্তু স্কুল কারিকুলাম অনেকাংশে ইসলামাইজ হয়ে গেছে। মিসরের কারিকুলাম অনেকাংশে ইসলামী, মালয়েশিয়ায় একই অবস্থা। আমরা হতভাগ্য দরিদ্র্য দেশগুলোর মধ্যে একটি যেখানে আমরা সেটি করতে পারিনি। বাংলাদেশের সরকারগুলো ইসলামী ছিল না, এখনো নেই। অতএব দাবি করে আর লাভ কি? ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতি বেশি করেছে, এসব দিকের কোনো গভীর কাজ তারা করতে পারেনি।

প্রশ্ন : কোনো একটি পার্টিও কি করেনি?

উত্তর : আমার তো মনে হয় না যে খুব গভীর কাজ করেছে। কাজ করেছে, যেমন- আমি একটি পার্টির কথা জানি, যারা নাকি ৭-৮শ' স্কুল চালায়। এতে তাদের স্বাতন্ত্র্য কোনো বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি। এখানে তারা আল আজহারের স্কুল সিস্টেমকে অনুসরণ করতে পারতো। আল আজহারের এক হাজার স্কুল রয়েছে।

প্রশ্ন : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কোন পদ্ধতিতে করতে চান, কুরআন-সুন্নাহ নাকি ইসলামের কোনো নিদিষ্ট ইমামের মত অনুসারে?

উত্তর : এ ব্যাপারে আমি আবার বলবো, যেসব দেশ এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছে তারা শুধু আইনের উৎস হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। ১৯৪৭ সালে আমরাও যখন পাকিস্তানের অংশ তাতেও সংবিধানে বলা হয়েছে আইনের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। কোনো মাযহাবের কথা বলা হয়নি এবং পাকিস্তানে একটি শরীয়াহ এ্যাক্ট পাশ হয়েছে। সে এ্যাক্টে বলে দেয়া হয়েছে, আইনের মূল উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ। আর অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তারা ইমাম নামেই পরিচিত হউক কিংবা মোফাচ্ছের নামেই পরিচিত হউক তাদের মতামত তারা দেখতে পারে। কিন্তু তাদের মতামত মেনে চলতে বাধ্য নয়। আর আমি এটিই বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের আলেম সমাজের মধ্যে ঐক্যের অভাব। এর কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আমার মনে হয়, মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় তারা উদার মনের কোনো শিক্ষাই পায়নি। আমার বিশ্বাস, মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো উদার মনের মানুষ সৃষ্টি হয় না। বড় মন তৈরি না হলে এদের মধ্যে বিবাদ-বিরোধ তো বেশি হবেই। দেখছেন না সামান্য ছোটখাট বিষয় নিয়েও তারা মারামারি করছে। এসব কলহ বিবাদ শেষ হয়ে যাবে যদি তারা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, মৌলিক বিষয়ে মতবিরোধ ছাড়া ছোটখাট ইজতেহাদি বিষয়গুলো নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হবেন না। ইজতেহাদি বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন যুগের আলেমরা বিভিন্ন মত পোষণ করতেই পারেন, সেসব ক্ষেত্রে আমরা একে অপরকে ধরাধরি করবো না। যে বিষয় ইসলামে নিরঙ্কুশভাবে মৌলিক সে বিষয়ে মতবিরোধ আছে বলে আমার মনে হয় না।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝেও ঐক্যের অভাব রয়েছে, ঐক্যের কি কোনো সম্ভাবনা আছে?

উত্তর : আমি জানি না, তবে তাদের চেষ্টা করা উচিত। আমার মনে হয় যে পার্টিগুলো আলাদা হয়ে গেছে তাদের জোর করে একত্র করা উচিত নয়। কিন্তু তাদের পারস্পরিক

www.pathagar.com

বন্ধুত্ব বাড়ানো উচিত। সবচাইতে বড় কথা হলো মনের ব্যাপার। আপনারা যে মতবিরোধের কথা বলছেন, আমার মনে হয় মৌলিক বিষয় নিয়ে ইসলামী বিশ্বে খুব একটি মতবিরোধ নেই।

প্রশ্ন : আমরা জানি আপনি একজন সুলেখক। আপনার বই এর সংখ্যা কত?

উত্তর : বই খুব বেশি লিখেছি একথা আমি বলবো না। সব মিলিয়ে হয়তো ৫-৬টি বই হবে। আসলে আমি জাত লেখক নই। প্রয়োজন অনুসারে লিখি। যেমন আমি প্রয়োজন বোধ করলাম যে, উসূল আল ফিকাহর উপর কিছু লেখা দরকার। আমি ২৫ বছর পড়ে সারা উসূলকে সামারাইজ করে একটি বই তৈরি করলাম, যেটি আমেরিকা থেকে প্রকাশ পাবে। ইনশাআল্লাহ এক সময় হয়তো বাংলাও হবে।

এক সময় সোস্যালিজমের যখন খুব প্রভাব ছিল, তখন আমি মনে করলাম সরকারের কি ভূমিকা হবে অর্থনীতিতে - এ নিয়ে একটি বই লিখলাম। এভাবে আমি বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন বই লিখেছি। যেমন- মেয়েদের বিভিন্ন ইস্যু, মেয়েরা চাকরি করতে পারবে কি না? পতিতা সমস্যা, উত্তরাধিকার ইস্যু, সিভিল কোড, তালাক প্রাপ্ত নারীর খোরপোষ ইত্যাদি। আমি অবাক হলাম এ সমস্ত ইনটেলেকচুয়াল ইস্যুগুলো মোকাবিলা করার লোক বাংলাদেশে খুব কম এবং তারা কিছু লিখছে না। যখন লিখছে না তখন আমি এক একটি বিষয়ের উপর লিখতে শুরু করলাম। লিখে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করতাম এবং লিফলেট আকারে ছড়িয়ে দিতাম। পরে এগুলোকেই একত্র করে বই আকারে প্রকাশ করলাম।

একবার রেডিও থেকে আমাকে বললো, ইসলামী ল'-এর উপর লেকচার দেয়ার জন্য। আমি ধারাবাহিকভাবে লেকচার দিলাম। পরবর্তীতে এটি বই আকারে বের হলো। এ বইটি এখন ইন্টারনেটে আছে। এছাড়াও আরো কিছু বই প্রকাশ হয়েছে। বেশ কিছু প্রবন্ধ আছে - যেগুলো এখনো বই আকারে বের হয়নি।

আমি জাত লেখক নই, বরং আমি বলতে পারি আমি বই কম রেখে যাচ্ছি। কিন্তু আমার হাতে গড়া ছাত্র রেখে যাচ্ছি। আমার বই হচ্ছে আমার ছাত্ররা। প্রায় একশ' ছাত্র তৈরি করেছি। তাদের অনেকেই বড় লেখক হয়ে যাবে। আশা করি আমাকে অতিক্রম করে যাবে। আমি বলতে পারি আল্লাহ যদি তৌফিক দেন ইসলামের জন্য কিছু বুদ্ধিজীবী রেখে যাচ্ছি, যাদের হাতে হয়তো হাজার ইনটেলেকচুয়াল তৈরি হবে। আমি যে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন শুরু করেছি এটি পৃথিবীর যে বড় বড় ইসলামী আন্দোলনগুলো আছে তাদের মিত্র হিসেবে কাজ করবে। পাল্টা কোনো আন্দোলন নয়। এ নিয়ে যাতে কেউ আবার ভুল না বোঝে।

প্রশ্ন : পীরদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উত্তর : আমার কোনো পীর নেই। আমি পীরদেরকে ইসলামের মূল ঐতিহ্যের অংশ মনে করি না। রাসূল (স) আমাদের যে কুরআন-সুন্নাহ এবং পদ্ধতি দিয়ে গেছেন, আমি পীরদের এর কোনো অংশ মনে করি না। আমি এর বেশি কিছু বলতে চাই না। বিষয়টি বিতর্কিত। এ নিয়ে অনেক মতামত হয়েছে। পরবর্তীতে বহু লোক এটিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন, অনেক লোক গ্রহণ করেননি। সউদি আলেমরা এটিকে গ্রহণ করেন না বোধহয়। বোধহয় আহলে হাদিসরা এটিকে গ্রহণ করেন না। আমি নিজে পীরদের কাছে যাই না, যাওয়ার প্রয়োজন মনে করি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : পাশ্চাত্যের যারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় 'কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন' তারা বলেন, মুসলমানদের দেখে তারা ইসলাম গ্রহণ করেননি, ইসলামকে জেনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এটি কতটুকু সত্য?

উত্তর : এটি সবাই বলে কিনা আমার জানা নেই। বেশিরভাগ লোক ইসলাম গ্রহণ করছে কোনো না কোনো মুসলমানের সংস্পর্শে এসে। সে তার কাছে কুরআন পেয়েছে এবং কুরআনটি পড়েছে। সেগুলো দেখে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। হয়তো সে লোকটিকে দেখে করেনি।

প্রশ্ন : ধরুন একজন খৃষ্টান বা ইহুদী একজন মুসলমানের সাথে মিশলো, দেখলো লোকটি ভালো। সে ইসলাম গ্রহণ করলো। ওই নও মুসলিম যখন মুসলিম কমিউনিটির সাথে মিশলো তখন দেখল মুসলমানদের চরিত্র কুরআন ও হাদিসের সাথে মিলছে না। এ বিষয়টিকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : আপনি ঠিকই বলেছেন। এটি ঠিক যে মুসলিম সোসাইটি বর্তমানে সাংস্কৃতিক দিকে থেকে বা আখলাকের দৃষ্টিতে ইসলামকে রিপ্রেজেন্ট করছে না। এটি বলা তো ঠিক হবে না আমাদের কালচারে ইসলাম নেই। তবে এটি একটি প্রচার যে, মুসলমান দেখে ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ প্রপাগান্ডায় আমাদের কান দেয়া উচিত নয়। পাশ্চাত্যে মুসলমান হচ্ছে কোনো না কোনো মুসলমানের কাছে এসে। মুসলমান কুরআন পড়তে দেয়। সেই কুরআন পড়ার পর সে প্রভাবিত হয়। খৃষ্টান ধর্মে বলা হয় আল্লাহ 'তিন জন'। এটি অনেকের মাথায় ঢোকে না। তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমানদের ভালো মনে করেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। কেননা মুসলমানদের পরিবার প্রথা, পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব, আত্মীয়তার বন্ধন ভালো। এখানে যেনা, ব্যাভিচার কম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তারা অনুধাবন করে এবং তারা এটিকে অনেক বড় কল্যাণ মনে করে। আমরা হয়তো এটিকে গুরুত্ব দেই না।

প্রশ্ন : বর্তমানে স্যাটেলাইটের যুগে ইসলামের ভবিষ্যৎ কতটুকু?

উত্তর : খুব বেশি। ইসলামের প্রচার এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। যেটি হাজার বছরে করা যায়নি, সেটি এখন দশ বছরে করা যাচ্ছে। তবে কালচারের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। এ ক্ষেত্রে আমি বলবো ইরানকে অনুসরণ করা যেতে পারে। ইরান চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো করছে এগুলো আমাদের বিবেচনায় আনা উচিত। গান-বাজনা বিষয়ে ড. ইউসুফ আল কারযাভীর যে মত, যা নাকি হালাল-হারামের বিধানের মধ্যে দেয়া হয়েছে এই সীমার মধ্যে থেকে আমাদের চলা উচিত।

কালচারের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা যদি ইসলামের সৌন্দর্য মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারি তাহলে অনেক মানুষ এগিয়ে আসবে। কিন্তু আমরা সেটি পারছি না। এদিকে আমাদের সচেতন হতে হবে। আমাদের উচিত এ ধরণের স্যাটেলাইট চ্যানেল বের করে আনা। সমস্যা হলো মুসলমানরা এ বিষয় নিয়ে খুব বেশি একটি চিন্তা করেন না, বোঝেনও না। আমাদের দেশেও অনেক দানশীল মুসলমান আছে, ওরসের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে দেন। পীর সাহেবদের টাকা দিয়েছেন, বিয়েতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেন অথচ স্যাটেলাইটের বিষয়টির ব্যাপারে আগ্রহ দেখান না। এটি হয়েছে ইসলামের কনসেপ্ট তাদের মধ্যে না থাকার কারণে। এখন প্রশ্ন হলো, কেন কনসেপ্ট নেই? এজন্য দায়ী আলেমরা। তাদের দায়িত্ব ছিল মেইন। কারণ 'আল-উলামা ওয়ারেসুল আম্বিয়া' - আম্বিয়ার দায়িত্ব তো ওদেরও পালন করতে হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আপনি একজন অর্থনীতিবিদ। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বলবৎ নেই। ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে কি পরিপূর্ণ শরীয়াহ মেনে চলা সম্ভব?

উত্তর : একথা সত্য যে এ দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আইন নেই। কিন্তু এটিও সত্য যে আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখবো আমাদের যে পার্সোনাল ল' সেটি ৯০ ভাগ ইসলাম ভিত্তিক। হতে পারে পুরোপুরি নয়। বাকী যে কয়েক শ' আইন আছে তা যদি এনালাইসিস করি তাহলে দেখবো অধিকাংশ আইনে ইসলাম বিরোধী কিছু নেই। যেমন ট্রাফিক আইন, মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি। এগুলো বলা ঠিক হবে না যে বাকি আইনগুলো ইসলাম সম্মত নয়। কয়েকটি আইন আছে যেগুলোতে ইসলাম বিরোধী কিছু উপদান আছে। যে দেশে ইসলামী আইন রাষ্ট্রীয়ভাবে নেই সেখানে কি পূর্ণাঙ্গ শরীয়াহ মেনে ইসলামী ব্যাংক পরিচালনা সম্ভব - এটি একটি কঠিন প্রশ্ন। তবে আমি মনে করি একটি ইসলামী ব্যাংক বর্তমানে যে নিয়ম ও আইন আছে তার প্রায় একশ ভাগই মেনে চলতে পারে। ইসলামী ব্যাংকে কোন অনৈসলামী ধারা মানতে বাধ্য করা যায়নি। যদি সে ইসলাম না মেনে চলে থাকে তবে এটি তার নিজের দোষ। যেমন ইসলামী ব্যাংকিং এজন্য মূল পদ্ধতি হবে মুদারাবা, মুশারাকা বা ব্যবসা (আমরা মুদারাবা বলি বা যাই বলি) এসবগুলো করার আইনে কোনো বাধা নেই। বাধা যদি থেকেই থাকে, সেটি হলো ব্যাংকগুলোর ভেতরে। ইসলামী ব্যাংকটি যদি ঠিক মতো ব্যবসা না করে থাকে তাহলে এটি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। এ ত্রুটির জন্য তো রাষ্ট্র বা সরকার বা আইন দায়ী নয়।

প্রশ্ন : অনেকে মনে করেন ইসলামী ব্যাংক এবং সুদি ব্যাংকের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। শুধু কিছু শব্দের হেরফের মাত্র। এ অভিযোগ কতটুকু সত্য?

উত্তর : আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর দুটি কারণ, একটি হলো ইসলামী ব্যাংকিং এর দুশমন, যারা ইসলামী ব্যাংকিং পছন্দ করে না, জানতে চায় না, তারা এই কারসাজি করছে। না হলে প্রকৃতপক্ষে বিভ্রান্তির কোনো কারণ নেই। এছাড়া আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন। ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন ব্যবসা করছে। লোকে যদি এসব ব্যবসা না বোঝার চেষ্টা করে তাহলে এগুলো তাদেরও একটি ত্রুটি। আবার ইসলামী ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তাদের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে, তারা যেসব এলাকায় কাজ করছে, জনগণকে তারা সেগুলো বোঝাতে পারছে না। আর এটিও খুব অন্যায় হবে যে, ব্যবসা করার জন্য যেভাবে কেনাবেচা দরকার সেভাবে যদি তারা না করে তাহলেও বিভ্রান্তি হবে। সুতরাং তাদের সঠিকভাবে ব্যবসা করতে হবে। আমি যদি ইসলামের দুশমনদের কথা বলে থাকি তাহলে তার চেয়ে বেশি দোষ আমাদের। কেননা, এমন হতে পারে, আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি, গত চল্লিশ বছরে আমি খুতবায় শুনিনি ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর নীতিমালার কথা। আমাদের খতিব সাহেবগণ, ইমামগণ খুতবায় মুদারাবার উপর, ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর আলোচনা করেননি। তারা কোনোদিন তা বলেননি। এমনকি এই যে বড় বড় ওয়াজ মাহফিল, তাফসীর হয় সেখানেও শুনিনি ইসলামী ব্যাংকিং আর ব্যবসার কথা। অথচ এসব ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিরাট পরিচিতি দেয়া সম্ভব। কিন্তু এসব হয় না। এ বিভ্রান্তি দূর করার জন্য আমাদের আলেমদের ভূমিকা নিতে হবে। তাছাড়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে মাদরাসা শিক্ষায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে পড়ানো হয় না, আমার মনে হয় এটি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ফিকাহর অংশ হিসাবে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইনান্স এবং অর্থনীতি পড়ানো উচিত। কওমী মাদ্রাসায় ফিকাহর ২০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর এসব বিষয়ের উপর হতে পারে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাংলাদেশে খুব বেশি পরিচিত হয়নি। তবু স্বল্প সময়েই ইসলামী ব্যাংকগুলোর জমা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ কি?

উত্তর : আমার মনে হয় আপনার প্রশ্নের মধ্যেই একটি স্ববিরোধিতা আছে। যদি এটি ভালো করে পরিচিত না হতো, যদি জনগণ পছন্দ না করতো তাহলে ইসলামী ব্যাংকের জমা এত দ্রুত বাড়ত না। আর তা এটিই প্রমাণ করছে জনগণ ইসলামী ব্যাংকের সমর্থক। ইসলামী ব্যাংক যদি বেশি করে শাখা করতে পারতো তাহলে জমা আরো বেশি করতে পারতো। তাই আমি বলবো ইসলামী ব্যাংক অপরিচিত এ বক্তব্যকে আর সঠিক বলা যায় না। আমি একটি কথা পরিস্কার বলতে চাই, ইসলামী ব্যাংকিং-এর কারণে একটি বিরাট খেদমত হয়েছে। আমি যখন ছাত্র ছিলাম, আমার বন্ধু-বান্ধবরা বলতেন ইসলামে সুদ হারাম। তাই ইসলামী ব্যাংক হবে না, ব্যাংক না হলে ইসলামী অর্থনীতি হবে না, ইসলামী অর্থনীতি না হলে ইসলামী রাষ্ট্র হবে না, সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র অচল কিন্তু আল্লাহর কি মেহেরবানী ৬০ দশকের দিকে যে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন শুরু হয় ৮০ দশকে এসে তা গতি লাভ করে। পৃথিবীতে বর্তমানে ২শ' এর বেশি ইসলামী ব্যাংক অথবা অর্থকরি প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে। এর একটি লাভ হয়েছে। গত ১৫-২০ বছরে এ প্রশ্নের মোকাবিলা করিনি যে ইসলামে অর্থনীতি সম্ভব নয়। ইসলামী ব্যাংকিং-এর সফলতার কারণে এর প্রভাব হয়েছে এই, সকল ব্যক্তি মনে মনে ইসলামী অর্থনীতি সম্ভব বলে মেনে নিয়েছে। যে সকল নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংকিং মুনাফা না সমাজকল্যাণকে বেশি প্রাধান্য দেয়?

উত্তর : যে কোনো ব্যক্তি ব্যবসা করলে মুনাফা বেশি করার চেষ্টা করবে, এটি কি অন্যায়? যতটা সম্ভব তারপক্ষে, অত্যাচার না করে, জুলুম না করে, অন্যায় না করে, বৈধ পথে মুনাফা করা অন্যায় কিছু নয়। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ত্রুটি নেই এ কথা আমি বলবো না। তবে আমি জোর দিয়ে বলতে পারে ইসলামী ব্যাংক সমাজকল্যাণের উপর পুরোপুরি জোর দেয়। জনগণের কল্যাণই বড় কথা। তারা শিল্প, ব্যবসা, দেশের জনগণের উন্নতি চায় এবং তারা এটিও মনে করে যে এরই সাথে মুনাফা করা সম্ভব।

প্রশ্ন : শরীয়াহ কমিটির সিদ্ধান্তমালা কি উপদেশমূলক না বাধ্যতামূলক হওয়া উচিৎ?

উত্তর : এ প্রশ্নটি অপ্রয়োজনীয়। কারণ ব্যাংক সর্বাবস্থায় শরীয়াহ মেনে চলে। কিন্তু আইন বলে যে, ব্যাংকের সর্বাপেক্ষা সিদ্ধান্তকারী বডি হচ্ছে বোর্ড। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে শরীয়াহ কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বোর্ডের নিকট তাদের পরামর্শ হিসেবে গণ্য হবে এবং বোর্ড সাধারণত শরীয়াহ কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি কোনো ইসলামী ব্যাংক যদি নিজস্ব শরীয়াহ কমিটির সিদ্ধান্তের উপর পুরাপুরি সন্তুষ্ট না হতে পারে, তাহলে ব্যাংক চাইলে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ আলেমদের মতামত গ্রহণ করতে পারে। ইচ্ছে করলে বিশ্বের অন্যান্য ফিকাহ কমিটি, যেমন ওআইসি ফিকাহ একাডেমীর মতামত নিতে পারে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : গালীব হাসান
প্রকাশকাল : মে ২০০২, দারুস সালাম

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকিং যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে

প্রশ্ন : দেশের বর্তমান ব্যাংকিং পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ কি?

উত্তর : ১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর রিফর্ম প্রোগ্রাম নামে ১৯৯২ সাল থেকে ব্যাংকিং খাতে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় ব্যাংকিং সেক্টরে অনেক বড় বড় কাজ হয়েছে। প্রথমত, ঋণ শ্রেণীকরণের নতুন নীতিমালা তৈরি করা হয়। আগে যে ঋণের টাকা ৩ বছর না দিলে শ্রেণীকৃত গণ্য হতো, এখন সেটি এক বছরের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে। ফলে আজকে যদি বলা হয় ব্যাংকিং সেক্টরে ২৮ শতাংশ শ্রেণীকৃত ঋণ আছে, তা আগের পদ্ধতিতে হিসাব করলে ১৫ শতাংশ হয়ে যাবে। কারণ এখন এক বছরের মধ্যে শ্রেণীকরণ হয়ে যাচ্ছে, যা আগে ৩ বছরে হতো। আগের ব্যবস্থায় ব্যাংকের শরীরের পুরো অসুখ বোঝা যেতো না, যা এখন বোঝা যাচ্ছে। অসুখগুলো ধরা পড়ার পরও এখন শ্রেণীকৃত ঋণ কমে এসেছে। সুতরাং এটিকে ব্যাংকিং খাতের একটি বড় অগ্রগতি বলে ধরা যায়।

দ্বিতীয়ত, ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসির ব্যাপারে নতুন নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়। যার ফলে ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসির ব্যাপারে অনেক পুরনো নীতিমালায় পরিবর্তন এসেছে। এখন অ্যাসেট বেজড হতে হবে, ইনভেস্টমেন্ট বেজড হতে হবে এবং সেটি হতে হবে রিস্ক হিসাব করে; রিস্ককে ওয়েট করে। এর ফলে আমরা একটি অধিকতর উন্নত ক্যাপিটাল সিস্টেম চালু করতে পেরেছি। তৃতীয়ত, ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগের জন্যে একটি নতুন পদ্ধতি চালু করা হলো, যা হচ্ছে ক্রেডিট রিস্ক অ্যানালাইসিস বা সিআরএ। এর মাধ্যমে বিনিয়োগের গুণগত মান উন্নয়নের চেষ্টা করা হলো। ব্যাংকাররা চাইলেও আগের মতো খারাপ ঋণ দিতে পারবেন না। এছাড়া এখানে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো বা সিআইবি থেকে ইনফরমেশন পাওয়া যাচ্ছে। এর মাধ্যমে জানা যায়, কে কোন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে। আগে কে কোথা থেকে ঋণ নিয়েছেন তা জানার ব্যবস্থা ছিল না। এখন এক দিনের মধ্যে সিআইবি থেকে জানা যাচ্ছে কে কোথা থেকে কত টাকার ঋণ নিয়েছেন। ফলে ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে ব্যাংকগুলো জানতে পারছে। এসব খোঁজখবর নিয়ে এখন ব্যাংক সিদ্ধান্ত নিতে পারছে ঋণ দেবে কি দেবে না। এই রিফর্মগুলো করা হয় ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ এর মধ্যে। আমি সে সময় সেন্ট্রাল ব্যাংকে ছিলাম এবং ওই রিফর্ম বিভাগের প্রধান ছিলাম। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে যাতে খেলাপি ঋণ কমে আসে, দুর্নীতি বন্ধ হয় এবং স্বচ্ছতা সৃষ্টি হয় সে জন্যেই রিফর্ম প্রোগ্রাম হাতে নেয়া হয়। সার্বিকভাবে আমি ব্যাংকিং পরিস্থিতি খারাপ বলবো না। নতুন ব্যাংক এসেছে, প্রতিযোগিতা বেড়েছে। অবশ্য কিছু আন-এথিক্যাল প্রাকটিস যে আছে এটি

www.pathagar.com

ঠিক। তারপরও ব্যাংকিং সেক্টর এখন আগের থেকে অনেক বেশি এফিসিয়েন্ট, অনেক বেশি অটোমেটেড এবং সংশ্লিষ্টদের পেশাগত জ্ঞান বেড়েছে। সর্বোপরি ব্যাংসমূহের সার্ভিস এখন আগের তুলনায় ভালো হয়েছে।

প্রশ্ন : চলতি বছরের প্রথমার্ধে এবং পূববর্তী বছরে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ভালো মুনাফা করেছে। এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকও আছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের এ সাফল্য সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তর : ২০০১ সালের সাফল্য নির্দেশ করে যে, সামগ্রিকভাবে আমাদের ব্যবসা পরিস্থিতি ভালো ছিল। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যতটা খারাপ বলা হচ্ছে ততটা খারাপ ছিল না। বিনিয়োগ, আমদানি-রফতানি, অর্থায়ন এসব তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল। এ সময় ব্যাংকিং খাতে বড় ধরনের বিপর্যয় হয়নি। ২০০২ সালের প্রথমার্ধের ব্যাপারে আমি বলবো, আমেরিকার সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর তার প্রভাব পড়ে বিশ্বব্যাপী। আমাদের গার্মেন্টস সেক্টর প্রবলেম ফেস করছে। গার্মেন্টস খাতে বিপর্যয়ের কারণে সমগ্র ব্যাংকিং খাতে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সঙ্গত কারণে এর প্রতিক্রিয়া আয়ের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে। এসব বিবেচনায় বলা যায় ২০০২ সালে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিস্থিতি আগের বছরের তুলনায় ডিফিকাল্ট। এজন্য কিছু করতে হবে। সরকারের কিছু করণীয় আছে। প্রাইভেট সেক্টরের কিছু করণীয় আছে। কিন্তু এরপরও পরিস্থিতির উন্নতি নাও হতে পারে। কারণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের অর্থনীতিতে প্রভাব সৃষ্টি করছে। যদি মধ্যপ্রাচ্যে আর একটি যুদ্ধ বাধে, তাহলে পরিস্থিতির আরো অবনতি হবে।

প্রশ্ন : 'আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন আর ব্যবসাকে করেছেন হালাল' এ কথা সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, ইসলামী ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে। কারণ ইসলামী ব্যাংক এখন ব্যাংকিং কোম্পানি আইন অনুযায়ী চলছে। ব্যাংকিং কোম্পানি এ্যাক্টে এমন কোনো ধারা নেই যে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অসুবিধা হবে। ১৯৯৪-৯৫ সালে ব্যাংকিং এ্যাক্টে প্রয়োজনীয় অ্যামেন্ডমেন্ট করে দেয়া হয়েছে, যাতে ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে আর অসুবিধা না থাকে। আগের এ্যাক্টে ছিল কোনো ব্যাংক ব্যবসা করতে পারবে না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক মানেই তো ব্যবসা। অ্যামেন্ডমেন্টে বলে দেয়া হলো, ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই ধারা অর্থাৎ ব্যবসা না করতে পারার ধারা প্রযোজ্য হবে না। প্রযোজ্য হবে না মানে তারা ব্যবসা করতে পারবে। আমি যখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ছিলাম তখন ইসলামী ব্যাংকের প্রতিনিধিরা আমার সাথে দেখা করে। তাদের সব সমস্যা আমি শুনি। এর মধ্যে প্রধান ৪-৫টি সমস্যার অ্যামেন্ডমেন্ট তখন আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে করে দিয়েছি। সুতরাং আমরা ইসলামী নীতিমালার আলোকে ব্যবসা করতে পারছি। তবে আমি বলবো, আমরা সুদমুক্ত ব্যাংকিং করতে পারছি, কিন্তু ইসলামের যে আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য তা আমরা এখনো পুরোপুরি অর্জন করতে পারছি না। ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য দূর করা, সকলের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, সকলের চাহিদা পূরণ করা, এ কাজগুলো আমরা ভালোভাবে করতে পারছি না। তবে ইসলামী ব্যাংকিং আমরা করতে পারছি। আল্লাহতায়ালা সুদকে হারাম করলেন, ব্যবসাকে হালাল করলেন। আরবদের মধ্যে অনেকে বলতেন, সুদও তো ব্যবসার মতো। কিন্তু আল্লাহ বললেন - না, সুদ ব্যবসার মতো নয়। সুদ হারাম, ব্যবসা হালাল। আল্লাহর কাছে যেমন সুদ আলাদা,

www.pathagar.com

ব্যবসা আলাদা, তেমনি মডার্ন অর্থনীতিতে বলা হয় সুদ আলাদা, ব্যবসা আলাদা। ব্যবসা দু'ভাবে হতে পারে। একটি হলো ব্যাংক এবং পার্টির মধ্যে শরিকদারি ব্যবসা। যেমন পার্টির কিছু টাকা এবং ব্যাংকের কিছু টাকা মিলিয়ে দ্বিপক্ষীয় ব্যবসা হবে। অথবা ব্যাংক পুরো টাকা দেবে, পার্টি ব্যবসা করবেন। এভাবে শরিকদারি ব্যবসা হবে। আরো এক ধরনের ব্যবসা করা যায়, সেটি হচ্ছে মাল কিনে বিক্রি করা। একজনের একটি দোকান আছে, সে গাড়ি কিনে বিক্রি করে। এটি তো একটি ব্যবসা। কে বলবে এটি ব্যবসা নয়? ইসলামী ব্যাংক এ ব্যবসাটাই করে। পার্টি ব্যাংককে বলে আমাকে এই ম্যাটেরিয়াল কিনে দাও। তারা সেই ম্যাটেরিয়াল কেনে এবং বিক্রি করে লাভ করে। অথবা মেশিনারি কিনে বিক্রি করে লাভ করে। এটি অবশ্যই ব্যবসা। কেউ যদি বলে এটি ব্যবসা নয়, সেটি ভুল হবে। ইসলামে ব্যবসার কিছু নিয়ম-কানুন আছে; নানা ভাগ আছে। একটি ব্যবসা হলো, কি লাভ নেয়া হলো তা ক্রেতাকে বলে দিতে হবে। একে বলে মুরাবাহা। এটি আমরা করি। অন্য ব্যবসাগুলোতে ব্যবসায়ী লাভ বলতে বাধ্য নয়। এটিকে বলে বাই-মুয়াজ্জল, বাই-সালাম। ইসলাম এ দুটোকেই বৈধ করেছে। সুতরাং এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়, ইসলামী ব্যাংক ইসলামের নীতিমালা মেনেই ব্যবসা পরিচালনা করছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : এ ব্যাংকের অর্থায়নে অন্তত ৩০টি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়েছে। অন্তত ১০০ টি মধ্যম আকারের ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে। কয়েকশ ছোট ইন্ডাস্ট্রি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দেশের গার্মেন্টস শিল্পে ভূমিকা রাখা মানে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখা; বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা। সুতরাং আমি বলবো, ইসলামী ব্যাংক শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে, ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে এবং রিয়েল এস্টেট খাতে বিনিয়োগ করেছে। ইসলামী ব্যাংক তার সাইজের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকাই পালন করছে।

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের প্রথম শরিয়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে আরো কিছু ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং শুরু করে। বাংলাদেশে ইসলামী ধারার ব্যাংকিংয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : বাংলাদেশের ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান। এর প্রায় সবাই ইসলাম মেনে চলতে চান। মৌলিকভাবে ইসলাম থেকে কেউ দূরে সরতে চান না। কেউ বলেন না, আমি রোজা চাই না, অথবা কেউ বলেন না, আমি যাকাত চাই না। জনগণ ইসলাম ভালোবাসে। আমাদের ব্যাংকে প্রায় ১০০০ দরখাস্ত জমা পড়েছে নতুন শাখা খোলার জন্যে। প্রত্যেক উপজেলা থেকে ইসলামী ব্যাংকের শাখা খোলার দাবি উঠেছে। এটি প্রমাণ করে ইসলামী ব্যাংকিং দেশে কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমি মনে করি, ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনার সাথে যারা জড়িত আছে, তারা যদি যোগ্যতার পরিচয় দেন এবং ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারণা বন্ধ করা যায় তাহলে এ দেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ভবিষ্যৎ ভালো। আর একটি বিষয় হচ্ছে, ইসলামী ব্যাংকিং আসার কারণে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হচ্ছে। আমার যখন বয়স কম ছিল, ২৪-২৫ বছরের যুবক ছিলাম, তখন আমার ভেতর অনেক প্রশ্ন কাজ করতো। ব্যাংক না হলে অর্থনীতি কীভাবে হবে? সুদের কারণে ব্যাংক সম্ভব নয়, তাহলে ইসলামী অর্থনীতি কীভাবে হবে? ১৯৭০ সালের দিকে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে গেল। এতে ইসলামী অর্থনীতি সম্ভব কি না এ দ্বিধা আর থাকলো না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বাংলাদেশে একটি খেলাপি ঋণ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ব্যাংকের মোটা অংকের টাকা শ্রেণীবিন্যাসিত হয়ে পড়েছে। এ সংকট থেকে উত্তরণের উপায় কি বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর : সংস্কার কর্মসূচির ফলে শ্রেণীকরণের নতুন নিয়ম চালু হওয়ার পরে ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট কমে যাচ্ছে। খারাপ ঋণ কমে গেছে। এটি আরো কমতে থাকবে। কারণ সেন্ট্রাল ব্যাংককে ইন্ডিপেনডেন্ট করে দেয়া হচ্ছে। এটি হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রেগুলেটরি পাওয়ার অনেক বাড়বে। তখন খেলাপি ঋণ আরো কমবে। তবে আমি বলবো পরিস্থিতি পুরো সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসতে অনেক সময় লাগবে। আমি বলি না, এটি খুব সহজ কাজ। সেন্ট্রাল ব্যাংকের আরো ভূমিকা লাগবে। আইনগত বিষয়েও কিছু পরিবর্তন আনতে হবে। আইনের অভাব নেই। সমস্যা হচ্ছে প্রসিডিউরে। প্রসিডিউরটা খুব দুর্বল। এই প্রসিডিউরকে কীভাবে গতিশীল করা যায় তা সরকারকে ভেবে দেখতে হবে। সার্বিকভাবে আমি বলবো, খেলাপি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি হয়েছে, তবে আরো উন্নতি করতে হবে।

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা সাধারণত অন্যান্য ব্যাংক করে না। আপনাদের এ ধরনের ওয়েলফেয়ার কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : ইসলামী ব্যাংকের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে তার ক্যাপিটালের উপরে এবং রিজার্ভের উপরে যাকাত দেয়। এটি সে দিতে বাধ্য। তাই ইসলামী ব্যাংকের এ খাতে খরচের জন্যে ফান্ড আছে। আমাদের বর্তমান যে রিজার্ভ ও ক্যাপিটাল আছে তারই যাকাত হবে প্রায় ৭ কোটি টাকা। নিজস্ব টাকার উপরেই ব্যাংক যাকাত দেয়। ডিপোজিটের উপরে যাকাত দেয়ার দায়িত্ব ডিটোজিটরদের। এ ফান্ডের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্যে আমরা ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন গড়ে তুলি। যাকাতের টাকা ফাউন্ডেশনে ট্রান্সফার করা হয়, তারা নানা ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। আমাদের কোনো ইনকাম যদি শরিয়াহ কাউন্সিল ডাউটফুল মনে করে তাহলে ওই টাকা আমরা ফাউন্ডেশন ফান্ডে ট্রান্সফার করি। ফাউন্ডেশন লো-কস্ট হাসপাতাল করেছে, লো-কস্ট টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট করেছে, স্কলারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছে। শুধু চিকিৎসার জন্যে এক-দেড় কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। নানাধরনের মানুষের নানাধরনের সমস্যায় আমরা সাহায্য করি। আর একটি দিক হচ্ছে, শুধু আমরাই করছি না, আমাদের দেখাদেখি আরো কিছু ব্যাংক এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে সার্বিকভাবে দেশের ভালো হচ্ছে। আমরা শুরু করেছিলাম; শুরুর সময় ভাবতেও পারিনি বিষয়টি এতটা ইতিবাচক হবে। এখন আমরা কয়েকটি হাসপাতাল করে ফেলেছি, স্কুল করেছি, কলেজ করেছি, একটি মেডিকেল কলেজ করতে যাচ্ছি। কখনো একটি বিশ্ববিদ্যালয় করে ফেলতে পারি। সম্পূর্ণভাবে মানবসেবা ছাড়া এর পেছনে আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর : আমরা আমাদের একজিসটিং প্রোগ্রাম চালু রাখবো। রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আরো জোরদার করা হবে। আমরা আরো শাখা করবো। অটোমেশন বাড়াবো। সার্ভিস আরো ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করবো। এখন কিছু অভিযোগ আছে, সে অভিযোগগুলো দূর করার চেষ্টা করবো। ইসলামের মূল উদ্দেশ্যগুলো যাতে অর্জিত হয়, সে জন্যে আমরা চেষ্টা করবো।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : ব্যাংকিং সেক্টরে এখন যেসব কার্যক্রম চলছে তা অব্যাহত রাখতে হবে। অটোমেশন আরো বাড়াতে হবে। অনেক ব্যাংকের সার্ভিস সম্পর্কে অভিযোগ আছে। সার্ভিস আরো ভালো করতে হবে। কৃষি খাতে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনতে হবে। এফিশিয়েন্সি বাড়াতে হবে। স্টাফদের মানোন্নয়ন করতে হবে। অনেকগুলোর ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার দুর্বল আছে, সেগুলো সবল করতে হবে। ব্যাংকিং খাতের উন্নয়নে অনেক কিছুই করতে হবে।

প্রশ্ন : আপনি প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে জাতিগতভাবে আমাদের করণীয় কি?

উত্তর : আমি মনে করি, আমাদের যদিও দারিদ্র্য আছে, তারপরও গত ১৫-২০ বছরে আমাদের ইকোনোমি উন্নতি করেছে। প্রতি বছর জিডিপি ৪-৫ শতাংশ হারে বাড়ছে। এটি কোনো বানোয়াট কথা নয়। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা আইএমএফ বলছে যে, আমাদের অনেক ব্যবস্থাপনাগত সংকট আছে। আমাদের পোর্টগুলো, আমাদের রেলওয়ে, আমাদের ইনস্টিটিউশনগুলো, রোডগুলো সবকিছুর মধ্যে মিস ম্যানেজমেন্ট আছে। মাস্তানতন্ত্র, চাঁদাবাজি বা বিশৃঙ্খলা রয়েছে। আমাদের রাজনীতি দূষিত হয়ে গেছে। নীতি এটিকে গাইড করছে না, দেশপ্রেম এটিকে গাইড করছে না। রাজনীতিতে মাসলতন্ত্র এসে গেছে। প্রত্যেক নির্বাচনে অন্যায়ভাবে অর্থের ব্যবহার করা হচ্ছে। এ পরিস্থিতি খুবই মারাত্মক। সার্বিকভাবে যদি দেশের উন্নতি করতে হয়, তাহলে আমাদের পলিটিক্সকে ঠিক করতে হবে। সাংবাদিকদের, চিন্তাবিদদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের, ইন্টেলেকচুয়ালদের, বড় বড় নেতাদের এ কথা ভাবতে হবে। তার মানে এ নয়, রাজনীতি কারেক্ট করতে গিয়ে অর্থনীতি বসে থাকবে। অর্থনীতির কাজ করে যাবো আমরা। আমাদের ইস্যুগুলোকে আমরা নিরপেক্ষভাবে বিচার করি না। অন্তত আমাদের ইন্টেলেকচুয়ালরা করে না। যেমন গ্রাম ইস্যু - এটিকে অন্য মেরিটে বিচার করতে হবে, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হবে কি হবে না তা অন্য মেরিটে বিচার করতে হবে। কোনো উদ্দেশ্য থেকে এগুলো করা যাবে না। আমরা জাতীয় ইস্যুগুলোতে ঐকমত্য সৃষ্টি করতে পারছি না। সরকারগুলো ফেল করছে। সিনিয়র পলিটিশিয়ানরা একমত হতে না পারলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে না। ঢাকার ট্রাফিক সমস্যার সমাধান হবে না, কারণ একদল করলে অন্যদল বলবে কাজ যথাযথ হলো না। জাতীয় ঐকমত্য দরকার। শিক্ষাকে ঠিক করতে হবে। শিক্ষার সাথে নৈতিকতাকে সংযুক্ত করতে হবে। আমাদের মানুষ তৈরি করতে হবে, কেবল রোবট নয়। জাতিকে পরিশ্রম করতে হবে। এসব হলে সার্বিক অগ্রগতি হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : কামাল মাহমুদ ও দারা মাহমুদ
প্রকাশকাল : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০২, বাংলার সংবাদ

www.pathagar.com

অর্থনীতিকে উদ্ধার করতে হলে রাজনীতি ও মানবিকতা উদ্ধার করতে হবে আগে

প্রশ্ন : আপনি একাধারে অভিজ্ঞ ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, রাজস্ব বিশেষজ্ঞ, সমাজতাত্ত্বিক এবং ইসলামী চিন্তাবিদ। সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তর : আপনার প্রশ্নের ক্যানভাস এতো বিশাল যে, সাধারণ সাক্ষাৎকারের ফ্রেমে একে আটকানো সম্ভব নয়। তবে মূল বিষয়কে উপপাদ্য করে সংক্ষেপে একটি পর্যালোচনা দাঁড় করানোর চেষ্টা করা যেতে পারে এবং আমি তেমনটিই করতে চাচ্ছি। আমি বলবো, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর গত ত্রিশ বছরে অনেক সীমাবদ্ধতা ও সংকট থাকা সত্ত্বেও দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখা যাবে আফ্রিকার বেশিরভাগ দেশের জিডিপি গ্রোথ নেগেটিভ। ঠিক এ মুহূর্তে আমি আপনাকে কোনো চার্ট বা ফিগার বা যথাযথ তথ্য দিতে পারছি না। কারণ, এ ব্যাপারে যে ডাটার দরকার তা এ মুহূর্তে আমার কাছে নেই। তবে গত দশ থেকে পনেরো বছর ধরে আমাদের মোট অভ্যন্তরীণ প্রবৃদ্ধির হার ৪ থেকে ৬ শতাংশ পর্যন্ত উঠেছে। এটিকে মনগড়া বা বানোয়াট হিসাব বলা যাবে না। কারণ, এ হিসাবগুলো চেক করছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ এবং এ চেকিংয়ের ব্যাপারে তারা কোনো প্রকার দয়ামায়া দেখায় না। অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে তারা চেক করে। সেদিক থেকে আমি বলবো, সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে। অনেক সমস্যা-সংকট কাটিয়ে আমরা এমন কিছু অ্যাচিভমেন্ট করেছি, যা অন্য অনেক দেশ করতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ, নিরাপদ পানি সংরক্ষণের কথা বলা যায়। মোটামুটিভাবে বাংলাদেশের প্রায় ৯৫ ভাগ লোকের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল সহজলভ্য হয়েছে। অনেক দেশই এখনো এটি করতে পারেনি। প্রতিষেধক প্রদানের মাধ্যমে আমরা অনেক রোগ-বালাই থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পেরেছি। যদিও আমরা নতুন করে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হচ্ছি তবুও আমাদের মানতে হবে, যথাযথ প্রতিষেধকের মাধ্যমে জলবসন্তকে নির্মূল করতে পেরেছি। শিশুদের যে চার-পাঁচটি মারাত্মক রোগ হয় এবং যার ফলে শিশু মৃত্যুর হার ভয়াবহ রূপ নেয় সেগুলো কমাতে পেরেছি। পোলিও, টিটেনাস, হাম ইত্যাদি রোগকে ব্যাপকভিত্তিক ভেকসিনাইজেশন এবং টিকা খাওয়ানোর মাধ্যমে অনেক কমিয়ে আনতে পেরেছি। অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ পোলিওমুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মাইক্রো ক্রেডিটের ক্ষেত্রে আমরা একটি অনুকরণীয় মডেল দাঁড় করাতে পেরেছি যা বিশ্বের অনেক দেশই নিতে চাচ্ছে তাদের দেশে প্রয়োগের জন্যে।

www.pathagar.com

আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, গত বিশ-পঁচিশ বছরে আমাদের দেশে মাইক্রো ক্রেডিটের যে লেবেল ডেভেলপ করেছে, যে স্ট্যান্ডার্ড আমরা অর্জন করেছি এতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে কিন্তু তারপরও আমি বলবো বাংলাদেশেরই একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠান যে এ কাজটি করেছে তার বা তাদের কৃতিত্ব অবশ্যই ঐতিহাসিকভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মাইক্রো ক্রেডিট, ক্ষুদ্র ঋণ, গ্রুপ গঠন এবং গ্রুপভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম এ ধারণাটির সূচনা হয় ১৯৬৫ সালে তৎকালীন সমাজকল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে। এ তথ্য আমি জানতে পারি তখন যখন আমি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব লাভ করি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এ ধারণার ব্যাপ্তি ঘটে, যার সুসংগঠিত ও সমন্বিত রূপায়ণ করেন দেশের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ড. মুহাম্মদ ইউনুস। আরো অনেকে এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন, কাজ করেছেন, সফল হয়েছেন তাদের কথাও আমরা নিশ্চয় শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবো। আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, মাইক্রো ক্রেডিট মডেলের একটি লিমিটেশন আছে। এখন আমরা বুঝতে পারছি, প্রকৃতপক্ষে মাইক্রো ক্রেডিট দ্বারা ডেভেলপমেন্ট করা যাবে না। ডেভেলপমেন্টের জন্যে এর যে মডেল আছে বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রি, ভেভেলপমেন্টট অব ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ডেভেলপমেন্ট অব সার্ভিস সেক্টর এসবের জন্যে যে পদ্ধতি ফলো করা হয় সেসব পদ্ধতি আমাদেরকে নিতে হবে। তারপরেও মাইক্রো ক্রেডিট এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে কিছুটা হলেও সাহায্য করা যায়। সে ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যথেষ্ট কন্ট্রিবিউট করেছি এবং করছি। এখন প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী লাগসই প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারাকে বেগবান করা। মাইক্রো ক্রেডিট তার ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত না করতে পারলে দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির কাঙ্ক্ষিত স্তর স্পর্শ করা সম্ভব হবে না।

একটি বিষয় আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, আমরা ইতোমধ্যে অনেক কিছু করেছি এবং অনেক কিছু করতে পারি। ইউ মাস্ট হ্যাভ এ হোপ দ্যাট উই ক্যান ডু মেনি থিং, ইফ উই ট্রাই। আমাদের হতাশ হলে চলবে না, আশায় বুক বাঁধতে হবে এবং সে অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করতে হবে।

আপনার প্রশ্নে আর্থ-সামাজিক বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমি যা বললাম এর বাইরেও অনেক কিছু রয়েছে যা এ মুহূর্তে হয়তো বলা হয়নি। অর্থনীতির দিকেই বেশি কথা হয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রে আমি যদি বলি, অর্জনগুলো তো অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু সমকালীন বাস্তবতায় সামাজিক বিশ্লেষণে যদি যাই, তাহলে অবশ্যই অস্থিরতার একটি ছাপচিত্র তুলে ধরতে হয়। প্রকৃতপক্ষে সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রামে, নগরে, শহরে সর্বত্র একটি ইনডিসিপ্লিন, একটি অসহিষ্ণু, উগ্র ও অস্থির অবস্থা পরিবেশ প্রতিবেশকে অসুস্থ করে তুলছে। শৃঙ্খলার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে সর্বত্র। শিক্ষা ক্ষেত্রে, সরকারি অফিস-আদালতে এমনকি পারিবারিক জীবনে পর্যন্ত ঘটছে, ধস নেমেছে নৈতিকতায়, আচরণে, মানবিকতায়। প্রতীকী অর্থে বলা চলে, সত্তর-পূর্ব সামাজিক অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সত্তরকে আমি সময়ের একটি প্রতিনিধিত্বশীল স্তর হিসেবে মিন করছি। স্বাধীনতার পরবর্তী তিন-চার বছরকে আমি বিবেচনার বাইরে রাখতে চাই এ কারণে যে, সদ্য স্বাধীন একটি দেশের অনেক সমস্যা, অনেক অস্থিরতা, অনেক সীমাবদ্ধতা থাকে। সে কারণেই আমি সে সময়কে টেনে আনতে চাই না। আর সময় কালের উল্লেখকে আপনারা ভিন্ন অর্থে নেবেন না, কারণ এ সময়টিকে আমি সব ধরনের বিতর্কের উর্ধ্বে একটি প্রতীকী সাল হিসেবে ব্যবহার করেছি। যদি সে

www.pathagar.com

সময়কে স্ট্যান্ডার্ড ধরি, তাহলে আমরা দেখবো বর্তমানে সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা, জটিলতা, দায়বদ্ধতার অভাব, অসচ্ছতা, পেশীশক্তির ব্যবহার, মাস্তানতন্ত্রের বিস্তার ইত্যাদি। এসব মিলিয়ে স্বাধীনতা-পরবর্তী আমাদের মহান অর্জনগুলোকে ম্লান করে দিচ্ছে। আমাদের স্বপ্ন, আমাদের প্রত্যাশাকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, ম্লান করে দিচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য, সৃষ্টি, শালীনতা, সর্বোপরি সামাজিক সম্প্রীতিকে। এ অবস্থা না হলে আমরা যতদূর এগিয়েছি তার চেয়ে আরও অনেক বেশিদূর এগোতে পারতাম।

আজ থেকে ৩০/৩৫ বছর আগের তুলনায় সব ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অব্যবস্থা বেড়ে গেছে। দক্ষতা কমে গেছে, গণমুখী সেবা কমে গেছে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নৈতিকতা এবং আদর্শবাদিতার পতন ঘটেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এর কারণ খুঁজে পাই না। একটি কারণই মনে হয়, তা হচ্ছে নৈতিকতার পতন ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে আবার প্রশ্ন আসে নৈতিকতার পতন কেন ঘটেছে? দারিদ্র্যই কি এজন্য একমাত্র কারণ? আমার তা মোটেই মনে হয় না। কারণ, আগের তুলনায় জিডিপি গ্রোথ বেড়েছে, মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেড়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে কিন্তু তারপরেও এসব সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বিশৃঙ্খলা বেড়ে গেছে ব্যাপকভাবে। অথচ বিভিন্ন খাতে আমাদের বাজেট বেড়েছে। উন্নয়ন খাত, শিক্ষা খাত, সামরিক খাত সবখাতেই বাজেট বহুগুণ বেড়েছে। শিক্ষা খাতে বাজেট বেড়েছে বহু গুণ। শিক্ষকদের বেতন ভাতা, অন্যান্য সুবিধা বাড়ানো হয়েছে তাদের দাবির প্রায় কাছাকাছি, অথচ পাশের হার নেমে এসেছে। এজন্য দায়ী কে? আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এ জন্যে প্রধানত আমাদের রাজনীতির অধোমুখী প্রবণতাই দায়ী। আদর্শ ও গন্তব্যহীন রাজনীতির শিকার সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তর। এ অবস্থা চলতে পারে না। সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতিকে নৈতিকতার অধঃপতন থেকে এখনই বের করে আনতে হবে। টাকা এবং পেশীশক্তির অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে। কাজেই আমি বলবো, যদি আমাদের অর্থনীতিকে উদ্ধার করতে হয় তাহলে রাজনীতিকে উদ্ধার করতে হবে আগে। মানবিকতা ও সুস্থতা ফিরে পেতে হলে, বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের কাছেই নিজেদের দায়বদ্ধ হতে হবে।

প্রশ্ন : একজন নির্মোহ ব্যাংকার ও তাত্ত্বিক হিসেবে আপনার সুনাম এখনো অক্ষুণ্ন রয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে আপনি একটি বিশেষ সময়ে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরের বর্তমান সমস্যা-সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব গ্রহণ করি ১৯৯২ সালে। তার পূর্বেই ব্যাংকিং সেক্টরে একটি সংস্কার কর্মসূচি করা হয়। আমি যোগদানের পর এ কর্মসূচি পাইলট এবং মনিটরিং করার দায়িত্ব বর্তায় আমার উপর। আল্লাহর ইচ্ছায় এবং সহযোগীদের সদিচ্ছায় আমরা সে দায়িত্ব যথাসম্ভব সফল করতে পেরেছি। এটি একদিনে হয়নি। দীর্ঘ চার বছর আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অর্থনৈতিক ও নৈতিক সহায়তায় সে কাজ করেছি। পাশাপাশি নিজেরাও অনেক বিষয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা যে মৌলিক কাজগুলো করেছি, তার মধ্যে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক। যেমন- ঋণ শ্রেণীকরণ। আসলে তখন খেলাপি ঋণের রোগটাই ছিল অনির্ণীত। ফলে এর চিকিৎসা করা ছিল কঠিন। আমরা নানাভাবে রোগের উৎস খুঁজে বের করি এবং সে অনুযায়ী সময়কে বিবেচনায় রেখে বাস্তবতার নিরিখে প্রেসক্রিপশন তৈরি করি। সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করি এবং আমরা

www.pathagar.com

পুরোটা না হলেও প্রায় পূর্ণ একটি সলিউশন দিতে পেরেছিলাম। তখন আসলে ঋণ শ্রেণীকরণের পদ্ধতি ছিল দুর্বল।

ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসির উপর আমরা কাজ করেছি। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের ব্যাপারে আমরা আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড ফলো করার চেষ্টা করেছি। ইনভেস্টমেন্ট কোয়ালিটির উপর নির্ভর করে আমরা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার নির্ণয়ের পদ্ধতি দাঁড় করিয়েছি। ইনভেস্টমেন্ট অ্যাসেস করার জন্যে আমরা একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছি। আমরা ক্রেডিট রিস্ক অ্যানালাইসিস বা লেন্ডিং রিস্ক অ্যানালাইসিস প্রবর্তন করলাম। এ জন্যে আমরা কিছু ক্রাইটেরিয়া ঠিক করলাম। আমরা ক্যাপিটাল অ্যাডিকোসি নির্ধারণ করার জন্য ৮% ক্যাপিটাল নির্ধারণ করলাম যা আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য। আমি মনে করি, এসব পদক্ষেপ নেবার ফলে ব্যাংকিং সেক্টর তার অতীতের অস্বস্তিকর এবং অসহনীয় বিশৃঙ্খলা থেকে একটি স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। আমার সময়েই ব্যাংকিং সেক্টরকে তাৎক্ষণিক তথ্যগত সহায়তা দানের জন্যে একটি ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করলাম যাকে সিআইবি বা ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো বলা হয়। সে সময়ে আমরা আমাদের লক্ষ্যে এগিয়ে গেছি। আজ কিন্তু তার সুফল সবাই ভোগ করছেন।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধরনের সংস্কার কর্মসূচি গৃহীত হয়। এ সময়ে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে যে সংস্কার কর্মসূচি নেয়া হয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তানেও ততটা নেয়া হয়নি। ফলে দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে ক্রমান্বয়ে একটি শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। আমার বিশ্বাস, এ ধারার সাথে যদি সময়ের সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ অব্যাহত রাখা এবং নতুন খেলাপি হবার কারণগুলো বন্ধ করা সম্ভব হয় তাহলে সত্যিই ব্যাংকিং সেক্টর একটি স্বস্তিদায়ক অবস্থায় পৌঁছবে। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা-দুর্ঘটনা সত্ত্বেও আমি বলবো, ব্যাংকিং সেক্টর একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। অনেক দেশের তুলনায় আমাদের অনেক ভালো ব্যাংকার রয়েছে। সর্বোপরি ইউরোপ, আমেরিকা বা অন্যান্য অনেক দেশে অনেক ব্যাংক ফেইল করেছে, বন্ধ হয়ে গেছে, মার্জ হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে তা হয়নি। কাজেই আমি বলবো আমাদের ব্যাংকিং ভিত্তি এবং নির্ভরতা অনেক দৃঢ়। তবে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট কোয়ালিটি অনেকটা দুর্বল। এটিকে কাটাতে হবে এবং রিকভারির ক্ষেত্রে আরো সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রেসার রয়েছে যার জন্যে কাজের পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। যেমন-রাজনৈতিক প্রেসার, ইউনিয়নের প্রেসার, কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিচালকদের প্রেসার- এসব যদি ওভারকাম করা যায় তাহলে আমি মনে করি, আমাদের দেশে একটি সাউন্ড ব্যাংকিং সিস্টেম গড়ে উঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এটি কোনো হাইপোথেটিক্যাল বক্তব্য নয়, এটি বাস্তবতা। এক্ষেত্রে আমি মনে করি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রেগুলেটরি পাওয়ার বাড়াতে হবে। এর মধ্যে যাতে কোনো দুর্বলতা বা দুর্নীতি প্রবেশ না করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আরো কার্যকর করতে হবে এবং ব্যাংকের নিজের কার্যপরিধি ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে আর বাস্তবে সততার সাথে তা প্রয়োগ করতে হবে। একই সাথে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রোধ করতে হবে।

প্রশ্ন : অনেক প্রচার, পদক্ষেপ ও উদ্যোগের পাশাপাশি বেশ কিছু ছাড় দেয়া সত্ত্বেও ব্যাংকিং সেক্টরে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে - এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর : আমি ইতোমধ্যে এ প্রশ্নের জবাব অলমোস্ট দিয়েই ফেলেছি। আপনার এ প্রশ্নটি অ্যাবসল্যুট টার্মস এ সঠিক নাও হতে পারে। তবে আপনার প্রশ্নে একটি কঠিন বাস্তবতাও

www.pathagar.com

রয়েছে। যাহোক, আমি মোটামুটিভাবে এ বিষয়ে বলতে চাই, আমাদেরকে ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট কমাতে হবে। পলিটিক্যাল প্রেসার কাটিয়ে প্রফেশনালিজমকে গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি যেসব ঋণ খেলাপি হয়ে গেছে তা আদায়ের সিস্টেম ইমপ্রুভ করতে হবে। খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্যে অর্থঋণ আদালতের কার্যকারিতা সন্তোষজনক নয়, এটি সবাই স্বীকার করেন। বিগত সরকারগুলো এ বিষয়ে অনেক কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করেছে কিন্তু যে কোনোভাবেই হোক এটি ক্লিক করেনি। বর্তমান সরকারকে আরো গুরুত্বের সাথে বিষয়টি দেখতে হবে। আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরকে সামগ্রিকভাবে সঠিক পদ্ধতি এবং পথে পরিচালনার জন্যে যথেষ্ট আইন এবং নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। বিশেষ করে দেউলিয়া আইন যেটি মূলত আমার সময়কালেই হয়েছে। এটি একটি মেজর ইমপ্রুভমেন্ট। কিন্তু এটি ইফেকটিভ হচ্ছে না কেন, এটি সরকারকে দ্রুত দেখা দরকার। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একটি 'কুইক স্টাডি' করতে হবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়কেও এর দায়িত্ব নিতে হবে। খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এটি করতে হবে। ঝুলিয়ে রাখলে চলবে না। সর্বোচ্চ দু'তিন মাসের মধ্যেই করতে হবে। অন্যান্য দেশে অনেক এজেন্সি থাকে যারা সরকারের কাছ থেকে ব্যাংকগুলোর ঋণ কিনে নেয়। তারপর তারা তাদের ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে সেসব ঋণ রিকভারি করে ব্যাংক তথা সরকারকে সহযোগিতা করে।

প্রশ্ন : এ বিষয়ে আমার একটি সম্পূরক প্রশ্ন রয়েছে, তা হচ্ছে অন্যান্য দেশে এসব এজেন্সিগুলোকে যথেষ্ট আইনী সহায়তা এবং সিকিউরিটি সাপোর্ট দেয়া হয়। তাদেরকে সরকারিভাবে এমপাওয়ার্ড করা হয় - টু পারফর্ম দেয়ার ডিউটিজ স্মুথলি। কিন্তু আমাদের এখানে-

উত্তর : দেখুন, এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের সরকার খুবই সচেতন। তারা জানে, কি করা উচিত। এ ব্যাপারে আমার মনে হয় উপযুক্ত উদ্যোগ নিলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আমাদের দেশে যেভাবে মাস্তান কালচার গড়ে উঠেছে এবং অর্থ ঋণ আদালত অনেক ক্ষেত্রেই অর্থহীন হয়ে পড়েছে তাতে আমার শঙ্কা হয়, যথাযথ ক্ষমতায়ন না করে এসব এজেন্সিকে দিয়ে কাজ করানো সম্ভব নয়। আমাদের অর্থঋণ আদালতের অপ্রতুলতা অবিলম্বে দূর করতে হবে। ল'ইয়ার বিশেষ করে বিভিন্ন ব্যাংকের প্যানেল ল'ইয়ারদেরও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাদেরকে রাজনৈতিক প্রভাবসহ অনেক কিছুর উর্ধ্বে উঠে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থকে বড় করে দেখতে হবে।

প্রশ্ন : এ প্রসঙ্গে আমি একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, কিছুদিন আগে সোনালী ব্যাংকের ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন সেখানে তাদের উকিলদেরকে ঠিকমতো টাকা দেয়া হয় না। মাসের পর মাস উকিলদের ফি ঝুলিয়ে রাখা হয়, কম টাকা দেয়া হয় ফলে উকিলরাও তাদের কেস সম্পর্কে তেমন একটি গুরুত্ব দেয় না। অর্থমন্ত্রী স্বয়ং যদি বিষয়টি জানেন, তাহলে তিনি কেন এ ব্যাপারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে এ সমস্যার সমাধান করছেন না?

উত্তর : দেখুন, এ বিষয়টি নিয়ে অনেক গভীরে যাওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে, সাংবাদিক হিসেবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আপনারা তো এ ব্যাপারে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করতে এবং পরামর্শ দিতেই পারেন। আমার কাছেও এ ব্যাপারটি গুরুত্বহীন নয়। আমার মতে, যে কোনো খেলাপি ঋণের বিরুদ্ধে দ্রুত মামলা করতে হবে। আমাদেরকে পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্সের বাইরে বেটার ল-ইয়ার রাখতে হবে। বিশেষ করে যারা আইনবিদ বা অ্যাডভোকেট, যারা কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাজ করবেন তাদের মাঝে দেশাত্মবোধের গভীরতা থাকতে হবে। তাদেরকে ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে দেশপ্রেমকে স্থান দিতে হবে। দেশপ্রেম যে কেবল সাধারণ মানুষই দেখাবে, এটি তো ঠিক নয়। সচেতন এবং শিক্ষিত মানুষদের

www.pathagar.com

ভিতর এ বোধ অনেক বেশি থাকতে হবে। তাহলেই দেখবেন অনেক সমস্যার অনেক সহজ সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। আমার তো মনে হয়, আমাদের চেয়ে সাধারণ মানুষ যারা, ক্ষমতা বা অর্থের কাছাকাছি নন, তারা অনেক বেশি দেশপ্রেমিক। যাহোক, আমার মনে হয় রিকভারি আইনের ক্ষেত্রে প্রসিডিউর খুব দ্রুত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সময় ক্ষেপণ করার প্রবণতা কমানোর জন্যে এখনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর চেয়ারম্যান হিসেবে বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক অবস্থা এবং মানুষের জ্ঞানস্তরের প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে কিছু বলবেন, যাতে সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে সৃষ্ট কিছু 'বিভ্রান্তি' বা ভুল ধারণার অবসান হতে পারে?

উত্তর : আমরা সবাই জানি যে, আমাদের একটি প্রবণতা হচ্ছে, যে যেটি জানি না সে সেটি নিয়ে বেশি কথাবার্তা বলি। এটি একটি কালচারে পরিণত হয়ে গেছে। আমাদের মাঝে অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন, যারা কোনো বিষয়ে হঠাৎ করে কোনো ফতোয়া দিয়ে দেন। এটি খুব ভালো লক্ষণ নয়। ফতোয়া দেয়ার অধিকার বা অভিজ্ঞতা সবার থাকে না। যাদের নেই তারাও অনেক সময় তাই করেন। এ প্রবণতা দূর হওয়া খুব জরুরী। যাহোক প্রসঙ্গে আসি। আমার বিশ্বাস এবং জানা মতে, ইসলামী ব্যাংকিং একটি অত্যন্ত উন্নত ধারার ব্যাংকিং ব্যবস্থা। কাউকে খুশি করার জন্যে নয়, টু দ্য বেস্ট অব মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আই মাস্ট সে, ইসলামী ব্যাংকিং ইজ দ্য সুপিরিয়র কনসেপ্ট অব ব্যাংকিং। তবে আমরা যে ইসলামী ব্যাংকিং প্রাকটিস করছি সেটি ইসলামী ব্যাংকিং এর সর্বোত্তম মডেল নয়।

সত্যিকার অর্থে ইসলামী ব্যাংকিং এর মূল ভিত্তি হবে ব্যবসায় অংশীদারিত্ব বা মুদারাবা বা ব্যবসায় শরীকদার যাকে আমরা মুশারাকা বলি। মূলত আমরা যে ব্যাংকিং করছি তা ইসলামের দৃষ্টিতে সেকেন্ডারি, টারসিয়ারি পদ্ধতি বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাংকিং যা দিয়ে সমাজ পরিবর্তন করা যায় না। সমাজের ব্যাপক সংস্কার বা দারিদ্র্য বিমোচন করা যায় না। অর্থাৎ ইসলামের যে আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য, মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণ, তার চাহিদা পূরণ, তার সামাজিক পুনর্বাসন ইত্যাদি আমাদের প্রচলিত ইসলামিক ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা যা করছি তার মাঝে কোনো অস্বচ্ছতা নেই। কিন্তু তারপরেও কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। বিভ্রান্তিটা কেন হচ্ছে, এ বিষয়টি বুঝতে হবে। আমাদের দেশের মানুষের একটি বিরাট অংশ সুদ পছন্দ করে না। আবার সুদ আর অসুদের মধ্যে পার্থক্য করতে জানে না, এটি আরেকটি সমস্যা। এ সুদ আর অসুদের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারলে সমস্যা থাকে না। কুরআনুল করীমে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে যে, ব্যবসা বৈধ কিন্তু সুদ হারাম। তার মানে কুরআনের দৃষ্টিতে ব্যবসা এবং সুদ এক নয়। আগের যুগের লোকেরা বলত, ব্যবসা তো সুদের মতো। তখন আল্লাহ পাক সূরা বাকারাতেই বলেছেন- না, ব্যবসা বৈধ, সুদ হারাম। ইসলামের দৃষ্টিতে বা ইসলামের আইনের চোখে বা কারেন্ট আন্ডারস্ট্যানডিং এ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড বিজনেস ইজ নট সেইম। আমি খুব সহজ ভাষায় যাতে সাধারণ পাঠক বা জনগণ বুঝতে পারে সেভাবে বলছি- আমি একটি ব্যবসায় অংশ নিলাম বা একটি ব্যাংকের সাথে ব্যবসায় অংশগ্রহণ করলাম এবং অর্জিত লাভ-লোকসান শরিকানার ভিত্তিতে ভাগ করে নিলাম, এটি একটি ব্যবসা। আর একটি ব্যবসা হতে পারে ব্যাংক একজন ব্যবসায়ীকে তার প্রয়োজনীয় টোটাল

www.pathagar.com

ফান্ডটাই দিয়ে দিল তখন তাকে বলা হবে মোদারিব এবং ব্যাংক হলো ফান্ড প্রোভাইডার বা রাব্বুল মাল। এগুলো হচ্ছে ব্যবসায়ে শরিকদারী। আবার একজন কিনলো এবং একজন বেচলো এটিও এক ধরনের ব্যবসা। কেনাবেচার ব্যবসা আল্লাহ বৈধ করেছেন। এই যে কেনাবেচার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন একে তো কেউ সুদ বলে না। ইসলামী ব্যাংক এটিই করে, সে কেনে এবং বেচে। ফিকাহবিদদের মতে, ব্যবসা অনেক ধরনের। এর মধ্যে এ ধরনের ব্যবসাকে বলে মুরাবাহা। এখানে ব্যবসায়ীকে লাভ বা প্রোফিট ডিসক্লোজ করতে হয়। আমরা এ ব্যবসা করি। তাহলে ইসলামী ব্যাংক কি দোষ করলো যে কেউ বিভ্রান্ত হতে পারে বা ভুল বুঝতে পারে? আমি একটি বিষয়ে বলতে পারে যে, কিছু সাধারণ মানুষ আছেন যারা ইসলামী ব্যাংকের কনসেপ্ট সম্পর্কে ততটা ভালো জানেন না, তাদের কিছু বিভ্রান্তি থাকতে পারে। আবার একটি বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠী রয়েছে, যারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বা কোনো বিশেষ 'প্রয়োজনে' বিভ্রান্তি ছড়ায়। আমার মতে এটি ঠিক নয়। আমার পরিষ্কার বক্তব্য হচ্ছে, আমরা যে ধারায় ইসলামী ব্যাংকিং করি তাতে যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তাহলে তা সুস্পষ্টভাবে বলুন, আমরা পরীক্ষা করে দেখবো, যদি ত্রুটি থাকে তাহলে তা শুধরে নেবার চেষ্টা করবো।

প্রশ্ন : আপনি তো রাজস্ব বোর্ডের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দায়িত্ব পালনকালীন সময়ের অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতার আলোকে আমাদের দেশের কর কাঠামোর বিন্যাস, কর ব্যবস্থা এবং কর দাতাদের মানসিকতা সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা কি?

উত্তর : বর্তমানে আমাদের রাজস্ব বোর্ডের যে কর কাঠামো রয়েছে তা 'অ্যাসেনশিয়ালি কারেক্ট'। এখানে তিন ধরনের ট্যাক্স ফলো করা হচ্ছে। প্রথমত- 'ভ্যাট' বা কনজাম্পশন ট্যাক্স, দ্বিতীয়ত- কাস্টমস ডিউটি বা ইমপোর্ট ডিউটি, তৃতীয়ত- ইনকাম ট্যাক্স বা আয় কর। এ তিনটি ট্যাক্সই ভেরি অ্যাসেনশিয়াল। বর্তমানে আমাদের সামাজিক স্তর বিন্যাস এবং সমাজ কাঠামোতে এ তিনটি কর কাঠামোই খুব একটি খারাপ নয়। যদিও এ কর বিন্যাস যথোপযুক্ত বলা যাবে না তবুও খুব যে খারাপ তেমনটিও বলা ঠিক হবে না। কর বিন্যাস পরিবর্তনশীল। সময়, সমাজ এবং প্রয়োজনে এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও সংযোজন করার সুযোগ রয়েছে। এখানে প্রয়োজনে অ্যাডহক অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হয়। করার সুযোগও রাখা হয়। এটি নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর, যেমন এনবিআর-এর চিফ যিনি থাকবেন তার দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক ভাবনা, দেশাত্মবোধ ইত্যাদির উপর। পাশাপাশি তিনি তার সামগ্রিক ভাবনাকে সমন্বয় করবেন সমাজের প্রয়োজন, সামাজিক বিন্যাস, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন, দেশের বিশেষ মুহূর্তে আয়-ব্যয়, সুসময়-দুঃসময় ইত্যাদি বিবেচনা করে। দেশে একটি বাজেট হয়। সামগ্রিক বিবেচনায় বাজেট প্রণীত হয়। বাজেট প্রণয়নের সঙ্গে সংগতি রেখে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে কর কাঠামো পুনর্বিন্যস্তও হয়। তবে আমি আগেও বলেছি, এটি নির্ভর করে যিনি চেয়ারে থাকেন তার সামাজিক ভাবনা এবং দর্শনের উপর। কখনো সরকারের নির্দেশের উপর। আমি খুবই বাস্তববাদী মানুষ তাই বলবো- যাই করা হোক বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধ করেই করা প্রয়োজন।

একটি উদাহরণ আমি দিতে চাই সেটি হলো, বিগত বাজেট। বিগত বাজেটে এডিপি সাইজ নিয়ে একটি প্রশ্ন উঠেছিল। যেহেতু আমাদের বিদেশী ফাইন্যান্সিং সমস্যা ছিল, তাই প্রশ্ন উঠেছিল আমরা কি এডিপি সাইজ ছোট করবো, নাকি এক্সিস্টিং সাইজে রাখবো? বাকি তেমন কোনো বড় প্রশ্ন ছিল না গত বাজেটে। আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো এডিপি সাইজ ছোট

www.pathagar.com

করা দরকার এবং ব্যাপক লোকাল ফান্ডিং ও লোকাল ফাইন্যান্সিং বৃদ্ধি করা দরকার। কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী মনে করলেন এবং এ জন্যে তার যথেষ্ট বিশ্লেষণ-বিবেচনাও ছিল এডিপি সাইজ বাড়াতে হবে, লোকাল ফাইন্যান্সিং বাড়াতে হবে এবং এ জন্যে ট্যাক্স না বাড়ালে চলবে না। তিনি তাই করলেন। ইটস এ ম্যাটার অব পারসেপশন, ম্যাটার অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমি মনে করি, প্রত্যেক অর্থমন্ত্রীর নিজস্ব একটি দর্শন, রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা, দেশাত্মবোধ, আন্তর্জাতিক ভাবনা থাকে এবং তিনি তারই আলোকে তার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের ভিত্তিতে তার বাজেট বিন্যস্ত করেন। এতে অন্যদের সাথে ছোটখাট মত পার্থক্য থাকতেই পারে যা পরবর্তীতে নানাভাবে পরিবর্তন, পরিমার্জিত, সংশোধিত, সংযোজিত হয়। সব অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং আস্থা রেখেই আমি এসব কথা বললাম।

সবশেষ আমি করদাতাদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। করদাতাদের ব্যাপারে আরেকটি কথা প্রচলিত রয়েছে - না দিয়ে পারলে কেউ সহজে কর দেন না। এ কথা শুধু আমাদের দেশেই প্রযোজ্য নয় এটি সারা বিশ্বের করদাতাদের বেলাতেই কম বেশি প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে আমাদের স্ট্রাকচারটা এমন হওয়া উচিত যাতে সবাই কর দিতে আগ্রহী হয়, বাধ্য হয়। এ জন্যে বিধিবিধান সেভাবেই বিন্যস্ত করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন : এ প্রসঙ্গে আমার আর একটি প্রশ্ন আছে, যদি কর কাঠামো সহনীয় হয় এবং করের হার সাধ্যের মধ্যে থাকে তাহলে করদাতারা হয়তো খানিকটা বেশি আগ্রহী হতে পারে। কর কম করে যদি আদায় বেশি করা যায়, সেটি কি মঙ্গলজনক নয়?

উত্তর : এখানে দুটো বিষয়। প্রথমত, যদি সত্যিই কর কমিয়েও বেশি আদায় করা সম্ভব হয় তাহলে সমস্যা হবার কথা নয়। আমি এর পক্ষে। কিন্তু কর কমিয়েও আদায় বাড়ানো সম্ভব না হয় তখন তো আইন, নিয়ম পদ্ধতি কঠোর করতেই হবে। আমাদের কর কাঠামোতে ইনকাম ট্যাক্স এক সময় ৬০% ছিল কিন্তু বর্তমানে সেই কর ২৫% এ নেমে এসেছে। তারপরেও কিন্তু যারা ফাঁকি দেবার তারা ফাঁকি দিচ্ছেই। এটি মানসিকতার ব্যাপার।

এ মুহূর্তে যদি আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন করতে হয়, যদি আত্মনির্ভরশীল হতে হয় তাহলে জনগণ তথা করদাতাদের তাদের উপর ধার্যকৃত প্রকৃত কর প্রদানে প্রস্তুত থাকতে হবে। করদানের মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে, যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, স্লোগান নির্ভর নয়। মনে রাখতে হবে, কর কেবল আয়ের উপরে হয়। আয় করতে কর দিতে হবে। যাদের আয় নেই তাদের কর দেবার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং কর প্রদান আমার মতে দায়িত্ববোধ এবং দেশপ্রেমেরই পরিচায়ক।

প্রশ্ন : আপনার মতে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকিং এর মধ্যে কি এমন পার্থক্য বিরাজমান, যা সাধারণ গ্রাহকদেরকে গ্রহণ বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করতে পারে?

উত্তর : একটি বিষয় আমি বলবো, আমাদের সঙ্গে যারা ব্যাংকিং করছেন তারা সুদ চান না। সুতরাং বলতেই পারেন যে, আমাদের একটি প্রোটেক্টেড মার্কেট আছে। টু বি ভেরি ফ্রাংক, আমরা যদি তেমন লাভ নাও করি তাহলেও তারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। কারণ জনগণের একটি বড় অংশ জানেন যে, আল্লাহতায়ালা ইসলামে সুদ হারাম করেছেন। সুতরাং সুদের প্রতি তাদের অনীহা রয়েছে। এদিক দিয়ে আমাদের একটি শেলটারড্ মার্কেট আছে। তারপরেও আমি বলবো ইসলামী ব্যাংকের ব্যবহার অন্যদের তুলনায় ভিন্ন। অন্তত খারাপ নয়। যদিও আমি বলবো, এই ব্যাংকের গ্রাহকদের সাথে কর্মীদের ব্যবহার

www.pathagar.com

সবচেয়ে ভালো হওয়া উচিত। কারণ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার রয়েছে সেটি হচ্ছে ইনসাফ এবং ভালো ব্যবহার। আমি একথা কেবল ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রেই বলছি না, সার্বিকভাবে বলছি। তবে যেহেতু ইসলামী ব্যাংক ধর্মের অনুশাসন এবং নির্দেশিত পথে কার্যক্রম করে তাই এর ব্যবহার সবার চেয়ে ভালো হওয়া উচিত। আমি কিছু কিছু অভিযোগ পাই এবং সাথে সাথে তা দূর করার চেষ্টা করি। আমি আগেই বলেছি, ইসলামের মেইন অবজেকটিভ ইনসাফ এবং ভালো ব্যবহার। যদিও আমার মতে আমরা সে অনুযায়ী তেমন কিছুই করতে পারছি না। তারপরেও আমরা ব্যাংকিং এর পাশাপাশি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করছি। যেমন-ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের মাধ্যমে সুলভ ও নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা সারা দেশে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছি। ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের জন্যে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও সুলভ চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে দরিদ্র, মেধাবী শিক্ষার্থীদের কারিগরি শিক্ষাদানের পাশাপাশি সাধ্যমতো তাদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করছে। এছাড়াও রয়েছে দুস্থ আশ্রয় কেন্দ্র, স্কুল, পঙ্গু ও নির্যাতিত মহিলাদের পুনর্বাসন কেন্দ্র। এ ধরনের অনেক প্রোগ্রাম এগুলো ইসলামী ব্যাংকিং কায়ক্রমের অংশ নয় তবে এর সহযোগী কর্মকাণ্ড। একটি বিষয় আমি অকপটে স্বীকার করবো যে, আমরা ব্যাংকিং এ সর্বোচ্চ আদর্শ সেবা দিতে পারছি না, তবে আমরা চেষ্টা করছি এবং এ প্রচেষ্টা আরো উন্নততর সেবার লক্ষ্যে অব্যাহত থাকবে।

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংক দেশের ব্যাংকিং খাতে অনেক নতুন থিম, প্রোডাক্ট এবং কার্যক্রমের পাইওনিয়র। পুনঃনির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসেবে ব্যাংকের কার্যক্রমের ধারাকে আপনি কীভাবে বিন্যস্ত করতে চান, যাতে ব্যাংকের বর্তমান কল্যাণ ও গণমুখী ধারা তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তৃত হতে পারে?

উত্তর : আপনার এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলবো যে, ইউ হ্যাভ এ ভেরি সেট পলিসি। আমাদের বোর্ড অব ডাইরেক্টর এতো বেশি কড়া, এতো বেশি সতর্ক এবং রিজন্যাবল যে, ব্যাংকিং কার্যক্রমে কোনো শিথিলতা তারা সহ্য করেন না এবং গণমুখী যে কোনো কার্যক্রমকে তারা অনুমোদন করেন। আমরা আমাদের সেবার পরিধি আরো বিস্তৃত করার লক্ষ্যে শাখা সংখ্যা আরো বাড়াতে চাচ্ছি। যদিও আমি জানি, একটি ব্যাংকের একটি পর্যায়ের পরে শাখা না বাড়ানোই উচিত। তবে সে অবস্থা আমাদের এখনো আসেনি। আমরা গ্রামীণ অর্থনীতিতে আমাদের অবদান নিশ্চিত করতে চাই। আরো বেশি মানুষকে কল্যাণমুখী ব্যাংকিং সেবা, নতুন এবং প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট উপহার দিতে চাই। আমরা তাদের প্রয়োজনের কাছে পৌঁছাতে চাই। সে লক্ষ্যে নতুন শাখা খুলছি। এ বছরই আরো দশটি শাখা খোলা হবে এবং এক পর্যায়ে আমাদের শাখার সংখ্যা ২২০ পর্যন্ত পৌঁছাবো। শুধু শাখা খোলা নয়, এসব শাখার মাধ্যমে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কল্যাণমূলক সেবা গ্রাহকদেরকে আমরা প্রদান করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে সর্বস্তরে উন্নত সেবা পৌঁছে দেয়া হবে। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, আমাদের অত্যন্ত শক্ত ভিত্তি রয়েছে। চেয়ারম্যান এখানে প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান। প্রশাসন তার নিজস্ব গতিতে চলে। এখানে কোনো এন্টারফেয়ারেন্স নেই। এছাড়াও দুটো কমিটি রয়েছে যারা পরিপূর্ণ স্বাধীন এবং শক্তিশালী। এখানে কোনো পক্ষ থেকে কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা হয় না।

আমরা ব্যাংকের শাখা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত বাড়াবো। অন্যদিকে আমাদের একটি আরডিএস বা রুরাল ডেভেলপমেন্ট স্কিম রয়েছে। এ স্কিমের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর

www.pathagar.com

মাঝে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবো। এ স্কিমটিকে কেবলমাত্র দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্যে নয়, সামগ্রিকভাবে গ্রামের সর্বস্তরের মানুষকে এ স্কীমের আওতায় নিয়ে আসা হবে। অর্থাৎ টোটাল ভিলেজ ডেভেলপমেন্টট স্কিম, একটি গ্রামের সবার উন্নয়ন মানেই একটি উন্নত গ্রাম। আর অনেক অনেক উন্নত গ্রামই হচ্ছে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশের প্রতিশ্রুতি। আমরা সেই সমৃদ্ধ দেশ গড়ার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের অবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। এ ব্যাংকের যে সেটআপ, স্কিলড ম্যান পাওয়ার, দেশ ভাবনা, সমৃদ্ধ কর্মীবাহিনী এবং যেসব জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি রয়েছে এগুলো দেখে আমার এ বিশ্বাস জন্মেছে যে, ইসলামী ব্যাংক কেবল একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা আদর্শের অনুসারীদের ব্যাংক নয়। এটি সবার ব্যাংক। সব ধরনের গ্রাহকের জন্যে সামগ্রিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের একটি সুসজ্জিত ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংক এ দেশের অর্থ, ঐতিহ্য ও বিশ্বাসে লালিত একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নেটওয়ার্ক সমৃদ্ধ ব্যাংক। যার রয়েছে সুনির্দিষ্ট ভিশন এবং মিশন। আর এ কারণেই এ ব্যাংক ক্রমাগত সাফল্য অর্জন করে যাচ্ছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শামসুদ্দোহা মাহমুদ
প্রকাশকাল : ১৬-৩০ নভেম্বর ২০০২, অর্থকথা

www.pathagar.com

ইসলামী অর্থনীতিই সমতা আনতে পারে

প্রশ্ন : বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে ইসলামিক ব্যাংকিং এর সম্প্রসারণ যতটুকু হবার কথা ছিল ততটুকু হয়েছে বলে কি আপনি মনে করেন? যদি না হয়ে থাকে তাহলে বাধা কোথায়?

উত্তর : মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে তো ইসলামী আইনও হওয়া উচিত। এটি তো সরকারি একটি কমিটমেন্ট হতে পারে যে, মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে দেশের সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থাই ইসলামী শরীয়াহর ভিত্তিতে হবে। আবার আমরা অন্যভাবে দেখি, বাংলাদেশে ইসলামিক ব্যাংকিং শুরু হয়েছে বেসরকারি খাত থেকে। এখন দেশে ৫/৬টি ইসলামি ব্যাংকও কার্যক্রম শুরু করেছে। দেশের তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামিক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের শাখা সংখ্যা এখন ১২৯টি এবং এর সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা। ইসলামিক ব্যাংকগুলো দেশের মোট ব্যাংকিং ব্যবসার প্রায় ১০ শতাংশ এখন দখল করে নিয়েছে। প্রতি বছরই এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক কথায় আমি বলবো, ইসলামিক ব্যাংকিং বেশ দ্রুততার সাথেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকের যে কোনো শাখায় গিয়ে গ্রাহকদের উপচে পড়া ভিড় দেখলেই বোঝা যায় ইসলামিক ব্যাংকিং কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের অতিরিক্ত তারল্য রয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় ইসলামিক ব্যাংকিং -এর জনপ্রিয়তা।

প্রশ্ন : ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে ইসলামিক ব্যাংকগুলো কি কনভেনশনাল ব্যাংকিং করছে না?

উত্তর : এ প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমি বলবো প্রতিটি ব্যাংকই, হোক সেটি ইসলামিক ব্যাংক বা কমার্শিয়াল ব্যাংক, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংকিং করছে। যেমন- ইসলামী ব্যাংক হরহামেশাই এলসি খুলছে। এ ব্যাংকের সঙ্গে অসংখ্য প্রতিনিধি জড়িত। আমি এ প্রসঙ্গে আরো বলতে চাই যে, ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বর্তমানে আমরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই কাজ করতে পারছি। এ ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না। এলসি খোলার কথাই ধরুন না কেন, আমরা যদি বাই-মুরাবাহার কথাই বলি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একটি পণ্য একটি নির্দিষ্ট টাকায় কিনে আবার অন্যত্র বিক্রয় করছি। আমরা ফি নিচ্ছি, এলসি খুলছি। এর বিপরীতে আমরা সিকিউরিটি রাখছি। এ ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধাই আমাদের হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, বিদেশী ব্যাংকে টাকা প্রদানের জন্য যে একটি ফরেন এক্সচেঞ্জ প্রদান করতে হয় তা আমরা আগেই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকে রেজিস্ট্রেশন করে রাখছি এবং ক্ষেত্র

www.pathagar.com

বিশেষে বৈদেশিক মুদ্রা অগ্রিম ক্রয় করে রাখছি। শরীয়াহর নীতিমালার কারণে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা (forward booking) দিতে পারি না। আমাদের গ্রাহকগণও এ ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করছে। এছাড়া বর্তমান বিশ্বে ইসলামিক ব্যাংকিং বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এরই ফলে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের অনেক দেশেই আজ ইসলামিক ব্যাংকিং ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং আমার জানামতে, সমগ্র বিশ্বের অন্যান্য দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে আমাদের দেশের ইসলামিক ব্যাংকগুলোর কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না। ইসলামিক ব্যাংকগুলো সম্পূর্ণ শরীয়াহসম্মত উপায়ে সঠিকভাবেই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : 'ইসলামী মানি মার্কেট' গঠন ছাড়া ইসলামিক ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্ত মানি মার্কেট গঠন করা ইসলামিক ব্যাংকগুলোর স্বার্থেই অতীব জরুরী। এ ক্ষেত্রে ইসলামী মানি মার্কেট গঠন সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর : আসলে আমি মনে করি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে ইসলামী মানি মার্কেট রয়েছে। আমি আরো মনে করি, 'ইসলামী মানি মার্কেট' ইসলামিক ব্যাংকগুলোর মধ্যেই গড়ে ওঠা উচিত। যদি কোনো একটি ইসলামিক ব্যাংক তারল্য সংকটে পড়ে তাহলে ইসলামিক ব্যাংকগুলোর ভেতরেই সেই সংকট দূর করা সম্ভব। কেননা, এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করে উক্ত ব্যাংকটির উদ্ভূত সাময়িক সমস্যা দূর করতে পারে। তবে আমি বলবো- এটি শুধু তারল্য সংকটই নয়, এছাড়া আরো নানা সংকট হতে পারে যখন এক ব্যাংক অন্য ব্যাংককে সহায়তা করতে পারে। কেননা, আপনারা জানেন যে ইসলামিক ব্যাংকগুলো সুদের কারণে অন্যান্য কনভেনশনাল ব্যাংক থেকে এ ধরনের সহায়তা নিতে পারে না।

প্রশ্ন : ইসলামিক ব্যাংকগুলোতে যে বিনিয়োগযোগ্য তহবিল অলস অবস্থায় পড়ে আছে সে তহবিলের সঠিক ব্যবহারের জন্য কি করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আমি এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলবো, তা হলো ব্যাংকের তারল্যের সাথে মানি মার্কেটের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। ইসলামিক ব্যাংকগুলোর নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা ও পারস্পরিক অবস্থার উন্নতির জন্যই ইসলামী মানি মার্কেটের প্রয়োজন। ইসলামিক ব্যাংকগুলোর পরিচালনা নীতি কি হবে, কোন নির্ধারিত নীতির উপর ভিত্তি করে ব্যাংক চলবে- এ সকল ফ্যাক্টর নির্ধারণের জন্য আপনারা জানেন 'ইসলামিক ব্যাংক কনসালটেটিভ ফোরাম' নামে একটি সংগঠন রয়েছে। এ ফোরামের পক্ষ থেকেও ইসলামী মানি মার্কেট গঠনের জন্য ইতোমধ্যেই ইসলামিক ব্যাংকসমূহে আমরা চিঠি পাঠিয়েছি। এছাড়াও সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ডেও এ সংক্রান্ত সকল কাগজ আমরা জমা দিয়েছি এবং পরবর্তীতে তা পাস হয়ে আসার পর আমরা তা সকল ব্যাংকে পাঠিয়ে দেই। এখন এটি নির্ভর করছে ব্যাংকের এমডিগণের উপর। ইসলামিক ব্যাংকের এমডিগণ উদ্যোগ নিলেই ইসলামী মানি মার্কেট চালু হবে। এখানে এ কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (বাংলাদেশ ব্যাংক) ইসলামী মানি মার্কেট তৈরিতে কোনো ভূমিকা নেই। মানি মার্কেট সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসলামী ব্যাংকে আমানতের পরিমাণ আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অতিরিক্ত অর্থ ব্যাংকে অলসভাবে ফেলে রাখলে চলে না। এজন্য ব্যাংককে উক্ত অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। আর বিনিয়োগ করার জন্য খুঁজতে হয় যথাযথ প্রজেক্ট।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : এই যে অতিরিক্ত তারল্যের কথা বলা হচ্ছে এ অতিরিক্ত তারল্য দিয়ে সকল ইসলামিক ব্যাংক মিলিত হয়ে কোনো ইসলামী অর্থনীতি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করছে না কেন?

উত্তর : সত্যি বলতে কি, দেশের ছয়টি ইসলামিক ব্যাংক একত্রিত হয়ে সমগ্র ব্যাংকিং ইকোনমির প্রায় ১০/১২ শতাংশ মাত্র স্থান দখল করে আছে। এটি সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি ক্ষুদ্র অংশ। তার পরেও আমরা চেষ্টা করছি দেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামী অর্থনীতির ধারণাকে আরো স্বচ্ছ করে তুলে ধরতে। এরই অংশ হিসেবে আমরা দেশের গ্রামাঞ্চলে ইসলামী ব্যাংকের কয়েকটি প্রোডাক্ট যেমন- বাই-মোয়াজ্জাল, বাই-মুরাবাহা প্রভৃতি গ্রামীণ জনগণের মধ্যে পরিচয় ঘটিয়েছি। আমি আশা করি, আগামী ১৫ বছরের মধ্যে আমরা সারা বাংলাদেশে ইসলামী শরীয়াহ ব্যাংকিং আরো ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হব।

প্রশ্ন : বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোতে দেখা যায় মুনাফার হার (Lending rate) অন্যান্য ব্যাংকের সুদের হারের তুলনায় কিছুটা বেশি। এর কারণ কি?

উত্তর : কথাটি সরাসরি সত্যি নয়। ইসলামী ব্যাংক তার অর্জিত মুনাফার কমপক্ষে ৬৫ শতাংশ আমানতকারীর মধ্যে বিতরণ করে থাকে। বাকি ৩৫ শতাংশ থেকে ব্যবস্থাপনা ব্যয় ও কর প্রদান করে থাকে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে দেখা যায় ট্রাডিশনাল ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামী ব্যাংকের লাভ অনেক সময় বেশি হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : আপনাদের তহবিল ব্যয় (Cost of Fund) কত?

উত্তর : ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে তহবিল ব্যয় বলতে কোনো কথা নেই। তবে বিগত বছরসমূহে লাভ-ক্ষতি শেয়ারিং ব্যবস্থায় কি পরিমাণ তহবিল ব্যয় হয়েছে তা পরবর্তীতে বের করা যায় এবং ব্যবস্থাপনা ব্যয় বলতে আমাদের একটি খরচ আছে।

প্রশ্ন : দেশে এখনো পর্যন্ত কোনো ইসলামী ব্যাংকিং আইন তৈরি হয়নি। সেক্ষেত্রে ইসলামিক ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন মামলায় আদালতে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়? এর সমাধানই বা কি?

উত্তর : ব্যাংক কোম্পানী আইনে ইসলামিক ব্যাংকিং সংক্রান্ত কতিপয় ধারা থাকার ফলে ইসলামিক ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনগত তেমন কোনো বাধা আছে বলে আমি মনে করি না। কনভেনশনাল ও ইসলামিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে আদালতে সাধারণত ঋণ খেলাপী বা অন্য কোনো আইনি লড়াই প্রচলিত একই আইনে হতে কোনো সমস্যা রয়েছে বলেও আমি মনে করি না। তবে পূর্ণাঙ্গ এবং স্বতন্ত্র ইসলামিক ব্যাংকিং আইন থাকলে তা ব্যাংক পরিচালনা ক্ষেত্রে অধিকতর সুবিধা হয়।

প্রশ্ন : তার অর্থ দেশে কোনো ইসলামিক ব্যাংকিং আইন দরকার নেই?

উত্তর : না, সেটি ঠিক নয়। ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং ইসলামিক ব্যাংকিং অধিকতর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইসলামিক ব্যাংকিং আইন প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন : কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ইসলামিক ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক কোনো বিভাগ নেই। সেক্ষেত্রে ইসলামিক ব্যাংকগুলো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কীভাবে?

উত্তর : ইসলাম জীবন থেকে আলাদা কোনো বিষয় নয়। তেমনি ইসলামিক ব্যাংকিংও আলাদা বিষয় নয়। শুধু সুদ এবং হারাম বাণিজ্য পরিহার করে চলাই নয় ইসলামিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য সারা দেশে ইসলামিক অর্থনীতি চালু করা। কিন্তু দেশে এখনো যেহেতু ইসলামিক অর্থনীতি চালু হয়নি তাই ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আলাদা একটি ব্যাংকিং

www.pathagar.com

ব্যবস্থা ধরা হচ্ছে। দেশে ইসলামিক ব্যাংকের সংখ্যা এখন ছয়টি। এর শাখা ও ব্যবসার পরিধি ক্রমেই বাড়ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে ইসলামিক ব্যাংকিং তদারকির জন্য একটি পৃথক ইসলামিক ব্যাংকিং সেল রয়েছে। তবে, ক্রমবর্ধমান অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে ইসলামিক ব্যাংকিং সেল আরো সম্প্রসারণ করা দরকার। আর ইসলামিক ব্যাংকিং সেলে প্রতিটি কর্মকর্তাকেই হতে হবে ইসলামিক ব্যাংকিং ধারণাসম্পন্ন।

প্রশ্ন : বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে যেখানে কনভেনশনাল ব্যাংকগুলো নিত্য নতুন প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়ছে, সেখানে ইসলামিক ব্যাংকগুলো সেভাবে এগুচ্ছে না কেন?

উত্তর : ব্যাংকগুলো প্রোডাক্ট কখন ছাড়ে, যখন তাদের আমানতে ঘাটতি দেখা দেয়। কিন্তু ইসলামিক ব্যাংকগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, তাদের আমানত সবসময়ই অতিরিক্ত থাকছে। এতদসত্ত্বেও ইসলামিক ব্যাংকগুলো মুদারাবা হজ্জ ডিপোজিট স্কিম, মোহর ডিপোজিট স্কিম, মুদারাবা সেভিংস বন্ড ইত্যাদি জাতীয় সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রোডাক্ট বাজারে ছেড়েছে এবং আরো নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে গবেষণা চলছে। তাই নতুন প্রোডাক্ট চালুর খুব একটা প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয় না।

প্রশ্ন : সে ক্ষেত্রে গ্রাহক সেবায় ইসলামিক ব্যাংকগুলো কি পিছিয়ে পড়ছে না?

উত্তর : আমরা নতুন প্রোডাক্ট যে একেবারেই ছাড়ছি না তা নয় কিন্তু। যেমন, সম্প্রতি ইসলামী ব্যাংক মোহরানা পরিশোধের জন্য একটি সঞ্চয় প্রকল্প চালু করেছে। তবে ক্রেডিট কার্ড বা যার মধ্যে হারাম জড়িত সে ধরনের প্রকল্পে ইসলামিক ব্যাংকগুলো কখনোই যাবে না। এক কথায়, ইসলামের মূল্যবোধকে কোনোক্রমেই লঙ্ঘন বা এড়িয়ে যাবার এখতিয়ার কারোরই নেই।

প্রশ্ন : ইসলামিক ব্যাংকগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আমি বলবো, ইসলামিক ব্যাংকগুলো প্রথমত দায়বদ্ধ আল্লাহর কাছে। ইসলামের নামে যেন আমরা অনৈসলাম না করি, মোনাফেকি না করি। ইসলামিক ব্যাংকগুলোর দ্বিতীয় দায়বদ্ধতা আমানতকারীদের কাছে। ইসলামে আমানতের খেয়ানত করার কোনো অবকাশ নেই। ইসলামে সমাজের কাউকে কম বা বেশি মর্যাদা প্রদানের এখতিয়ার নেই। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ব্যাংকিং কার্যক্রম এর পাশাপাশি হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ, সেলাই প্রশিক্ষণসহ বহু সামাজিক কর্মকাণ্ডও পরিচালনা করছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : এনায়েত করিম ও মাহমুদ খান
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০০৩, দি ইন্ডাস্ট্রি

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র ঋণ দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়

প্রশ্ন : বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনীতি নিয়ে আপনার চিন্তাভাবনা কি?

উত্তর : জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম একটি প্রধান দেশ। দেশটির রিসোর্সও খারাপ নয়। জমি উর্বর। পানি সম্পদ প্রচুর। বিরাট সমুদ্র উপকূল। সাগরে মাছ আছে। গ্যাস রয়েছে। তেল যে নেই তাও বলা যাবে না। সে সাথে অন্য ধরনের কিছু খনিজ সম্পদও আছে। পর্যটনেরও ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে যদি আমরা তা কাজে লাগাতে পারি। বাংলাদেশের অর্থনীতির দুটো বৈশিষ্ট্য খেয়াল করতে হবে। শত ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমাদের জিডিপি (Gross Domestic Product) গড়ে প্রতি বছর ৪/৫ ভাগ হারে বাড়ছে। ১৯৭৫ সাল থেকেই এ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত একটি ডিফিকাল্ট পিরিয়ড গিয়েছে। সে সময় জিডিপি ডিকলাইন করে। এরপর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসলেন। মূলত '৭৭ থেকেই জিডিপি ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে। এটি বাংলাদেশের একটি সাফল্য। বাংলাদেশের ব্যুরোক্রেসি, পলিটিশিয়ানরা যাই হোন না কেন বা জনগণের মধ্যে নানা ধরনের সমস্যা যাই থাকুক না কেন বাংলাদেশ এটি অর্জন করতে পেরেছে - এটি স্বীকার করতেই হবে। এ সময় আফ্রিকার অনেক দেশ এটি করতে পারেনি। আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশেরই নেগেটিভ গ্রোথ ছিল।

বর্তমান অর্থনীতি নিয়ে কথা বলার আগে মনে রাখতে হবে, আমাদের সাডেন ব্রেক থ্রো সম্ভব নয়। বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় উন্নয়নের বেস অনেক নিচে রয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, আমরা যদি ৭/৮ ভাগ হারে প্রবৃদ্ধিতে যেতে পারি তাহলে দশ বছরের মধ্যেই আমরা জিডিপিকে দ্বিগুণে নিয়ে যেতে পারব। এতে লেবেল অব ইনকামও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। বিশ বছরের মধ্যে তা চারগুণ করে ফেলতে পারব।

কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের অস্থির রাজনীতি এবং রাজনৈতিক কোন্দল। যার ফলে পলিসির ধারাবাহিকতা থাকে না। আমরা রাজনৈতিক নীতিমালা মানছি না বা মানতে চাচ্ছি না বলেই এ অস্থিরতা। রাজনীতিতে আমরা অস্ত্র ও পেশিশক্তি ব্যবহার করছি। ভোট রিগিং করছি। দলের পক্ষে সরকারি কর্মচারীদের জড়িয়ে ফেলছি। আমরা সবসময় ক্ষমতায় থাকতে চাচ্ছি। যারাই ক্ষমতায় যাচ্ছেন তারাই এটি চাচ্ছেন। জনগণ চাইলে থাকব, না চাইলে থাকব না - এটি তারা বলছে না। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা কিংবা ফ্রান্সে কিন্তু এরকম নেই। সেখানে জনগণের ভোটই চূড়ান্ত কথা। It is a great achievement of Europe, particularly West Europe. তারা নির্বাচনে পেশীশক্তি ব্যবহার করে না। অস্ত্র ব্যবহার করে না। They are absolutely ready to face consequence. সেখানে কোনো পার্টি হেরে গেলে নেতা নিজেই পদত্যাগ করেন। এ ধরনের ট্রেনিং আমাদের হচ্ছে না।

www.pathagar.com

আমরা যদি রাজনীতিতে নীতিবোধ ফিরিয়ে আনতে পারি, মানবিকতা ফিরিয়ে আনতে পারি, সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যদি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো মেনে চলে, তাহলে আমাদের রাজনীতিও ঠিক হয়ে যাবে। 'তাহলে' অবশ্য অনেক বড় শর্ত। যদি হয় তবে আমরা ৭/৮ ভাগ প্রবৃদ্ধিতে যেতে পারব। আর এখানেও 'যদি' খুব বড়।

আগেই বলেছি বাংলাদেশে হঠাৎ করে ব্রেক থ্রো করা সম্ভব নয়। এরপরও বর্তমানে যিনি অর্থমন্ত্রী আছেন তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ব্যক্তি, অর্থনীতিটা দেখছেন। তবে এটি ঠিক আমাদের প্রাইস লেবেল বেড়েছে। এমন কিছু প্যারামিটার দেখানো যেতে পারে যেগুলো ভালো বলে মনে হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলব, জিডিপি একই রয়েছে এবং সামনেও তাই হওয়ার সম্ভাবনা। কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। এটি একটি ভালো দিক। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এমন দুটি দিকের উন্নতি হয়েছে যাতে আশাবাদী হওয়া যায়। রেভিনিউ কালেকশনের উন্নতি হয়েছে। আমি বলব ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। হয়তো ট্যাক্স করে এটি করা হয়েছে। কিন্তু উন্নতি তো হয়েছে। সবেচেয়ে বড় কথা হলো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে। রিজার্ভ কমে গেলে আমরা খুব রিস্কে পড়ে যাই। রিজার্ভ না থাকলে ক্রাইসিসকে আমরা কীভাবে মোকাবিলা করবো? হঠাৎ যদি কোনো সময় দশ লাখ টন খাদ্য আমদানি করতে হয় তাহলে আমরা কি করবো? রিজার্ভ না থাকলে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ সহজেই আমাদের ঘাড়ে চেপে বসবে। আমাদের রিজার্ভ এখন ১.৫ বা ১.৭ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। অর্ধ বিলিয়ন থেকে নিশ্চয় এটি ভালো অবস্থা। আমি বলব, অর্থনীতির অবস্থা মন্দ নয়। ট্রেন্ডটা মন্দ নয়। আমার মনে হয় ট্রেন্ড ঠিক আছে।

প্রশ্ন : সরকারের পক্ষ থেকে জিডিপি'র যে হিসাব দেয়া হয় তা জনগণ কিন্তু বিশ্বাস করতে চায় না। তারা কারেন্ট অর্থনৈতিক অবস্থাটাই কি বিবেচনা করে না?

উত্তর : জনগণকে আমি বলব এটি বিশ্বাস করা উচিত। তার কারণ হচ্ছে হিসাবগুলো প্রথম তৈরি করে আমাদের পরিসংখ্যান ব্যুরো। কিছু হিসাব তৈরি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এটি বিশেষজ্ঞরা করেন। সুতরাং এখানে কোনো অসংগতি সম্ভব নয়। আবার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সবকিছুর আলাদা হিসাব রাখে। আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের লোকাল অফিস আমদানি, রফতানি, রেমিট্যান্সের প্রতিদিনের তথ্য পাচ্ছে।

হ্যাঁ, এটি ঠিক কিছু কিছু ব্যাপার তো জনগণকে স্পর্শ করবে না। একটি ছোট অংশ ছাড়া জনগণের লেবেলে সবাই কিছু জিনিস বুঝবেও না - যেমন, ইনফ্লেশন রেট কীভাবে ডিটেইল ক্যালকুলেশন করা হয় অথবা বাংলাদেশের টাকার সাথে অন্যদের টাকাকে কীভাবে মেলানো হয়। আরেকটি বিষয়, আমাদের ডিস্ট্রিবিউশনে কিছু সমস্যা হয়তো রয়েছে। সম্পদ যেটুকু বাড়ছে সেটুকু সব সেকশনেই ফ্লো করছে না।

এ প্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলতে চাই, সেটি হলো বাংলাদেশের দারিদ্র্য কি কমছে? আমরা নিজেরাই যদি স্টাডি করি তাহলে দেখব গ্রামে এখন কয়জনে খালি পায়ে চলে, বিশ বছর আগে কয়জনে চলত। খালি পায়ে চলা লোকের সংখ্যা এখন অনেক কম। স্কুলে যাওয়ার সংখ্যা বেড়েছে। মাস্টাররা যতই ফাঁকি দিন না কেন প্রায় একশত ভাগ ছেলেমেয়েই স্কুলে যাচ্ছে। মানুষ খালি গায়ে থাকছে না, জামা পরছে। কাজেই আমরা অস্বীকার করতে পারব না যে ২০/৩০ বছর আগের তুলনায় নব্বই ভাগ গ্রামেই পরিবর্তনের একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শহরেও এটি হচ্ছে।

আসলে ব্যাপারটি হলো বাংলাদেশীরা একটি সমালোচক জাতি। তারা ভালোটা কম দেখে। সবকিছুতেই মন্দ দিয়ে শুরু করে। আমরা আবেগপ্রবণ ও ভাবপ্রবণ জাতি। আমি নিজেও

www.pathagar.com

এর ব্যতিক্রম নই। নিজের দলের সরকার না হলে আমরা কেবল মন্দটাই দেখি। আবার কেউ সবকিছুকেই ভালো বলে।

প্রশ্ন : মানুষের এ নেতিবাচক চিন্তা অথবা অস্থিরতার পেছনে কোন কোন বিষয়গুলো ক্রিয়াশীল বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : অস্থিরতার পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। প্রশাসনের অবনতি এর একটি কারণ। পোর্ট, এয়ারপোর্ট কিংবা অফিসগুলোর দিকে যখন তাকাই তখন আমি বলতে বাধ্য হই '৭০-এ অবস্থা অনেক ভালো ছিল। পোর্টগুলোতে বিশৃঙ্খলা ছিল না, এয়ারপোর্টে বিশৃঙ্খলা ছিল না। বর্তমানে সবকিছুতেই একটি বিশৃঙ্খলা। আর রাজনীতিতে তো রয়েছেই। এটি অস্থিরতার অন্যতম একটি শক্তিশালী কারণ। The nation is deeply divided now. হয়তো এটি '৫৪ পর্যন্ত ছিল না। '৫৮-র পরে মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে যে জনমত তাতে সবাই একমত ছিল। কিন্তু '৬৬-তে এসে জাতি কেমন করে যেন দু'ভাগ হয়ে গেল এবং যে কোনোভাবেই হোক সেটি বাংলাদেশ হওয়ার পরও চলতে থাকল। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্যরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। বিএনপি ক্ষমতায় আসল। বিএনপি এবং অন্যান্যরা - এ ধরনের একটি বিভাজন কেমন করে যেন চলে আসল। এ ধরনের বিভাজন একটি জাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

আমি বলতে চাই, বাংলাদেশে যারা সেকিউল্যার রাজনীতি করেন তাদেরকেই একটি বিষয় মেনে নিতে হবে। এদেশে ইসলামের যে ভূমিকা রয়েছে সেটিকে তাদের স্বীকার করতে হবে। কারণ এটিই সত্য। সত্যকে অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই। গণতন্ত্রের ব্যাপারে এখানে খুব একটি বিরোধ নেই। আমাদেরকে বাংলাদেশ কেন্দ্রিক চিন্তা করতে হবে। Bangladesh is a piller of our thought. আমাদের দেশের নব্বই ভাগ মানুষ মুসলিম। আমরা যদি মেনে নেই Islam will have very strong influence in its public life - তাহলে বিরোধটা কমে আসে। আর এটি তো সত্য যে Islam is a great civilization. After colonial period it is rising again. ইসলাম সম্পর্কে আজ ভুল বোঝাবুঝি কমছে - এটি আশার কথা। ইসলাম কারো জন্য সমস্যা নয়। ইসলাম মানবাধিকার, নারীর অধিকার, মানুষের মৌলিক অধিকারে বিশ্বাস করে। ইসলাম গণতান্ত্রিক সরকার এবং সংবিধান পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে। সন্ত্রাসবাদে ইসলামের বিশ্বাস নেই। ইসলাম চরমপন্থায় বিশ্বাস করে না।

দেশের অধিকাংশ মানুষই মুসলমান। তারা হজ্জ করেন, নামায পড়েন, রোযা রাখেন, কুরআন পড়েন। কাজেই তারা যদি ইসলামকে সঠিকভাবে আত্মস্থ করতে পারেন তাহলে জাতির এ বিভক্তি চলে যাবে।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে এ অস্থিরতার জন্য আপনি কি রাজনৈতিক কারণকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন বেশি?

উত্তর : হ্যাঁ, আমরা যদি চারটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছাতে পারি তাহলে এ অস্থিরতা থাকছে না। Let us agree on four things. প্রথমত, অর্থনীতিতে যে ফ্রি মার্কেট চলছে চলুক। আমার কথা হলো সরকার শুধু প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করবে, অন্যথায় নয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের সবাইকে ডেমোক্রেটিক পলিটিক্যাল সিস্টেমে বিশ্বাস করতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতায় আসবে, অন্য কোনো মাধ্যমে নয়। এটি হলো গণতন্ত্রের মূল কথা। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের অস্তিত্ব নিয়ে তাকে ডিফেন্ড করতে হবে। দেশের স্বার্থ আমাদেরকে দেখতে হবে। এ তিনটি বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে কারো মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ নেই। চতুর্থ,

www.pathagar.com

যে বিষয়টি আমি বলতে চাই সেটি নিয়েই অনেকে প্রশ্ন তুলে থাকেন। বিষয়টি হলো এদেশে ইসলামের ভূমিকা কি হবে? বাংলাদেশে ইসলামের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ঐতিহাসিকভাবে আসছে। প্রথমেই '৬৬ সালে এ নিয়ে কথা উঠেছিল। এরপর স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুতেই সংবিধানে সেকিউল্যারিজম ঢুকানো হলো। আজকে আমরা জানি ইসলামের যে বিধান সেটিই মানবজাতির জন্য প্রকৃত কল্যাণকর। সেকিউল্যারিজমের একটি মূল দিক হচ্ছে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর কোনো অত্যাচার করা যাবে না। মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে হবে। It is also a part of Islam. আর এটুকুকে মেনে নিতে তো কারোর কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি এটি হতো তাহলে আমি মনে করি জাতির বিভাজনও থাকতো না। যদি পারতাম তাহলে আমি এ কথাটি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে বোঝাতাম। আমার নিয়তও আছে এ বিষয়টি নিয়ে তাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করার।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে অনেক এনজিও-ই রাজনীতির সাথে নানাভাবে জড়িয়ে গেছে। এরা দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলছে। কিন্তু বিশ্বে এমন কোনো নজির নেই যে এনজিও'র মাধ্যমে কোন দেশ তার দারিদ্র্য বিমোচন করতে পেরেছে। আর তাই যদি হয়, তাহলে এনজিওদের কাজকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

উত্তর : প্রত্যেক বিষয়েরই একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থাকে। আমি বিষয়টিকে পজেটিভলি দেখব। আমাদের মতো দেশগুলোতে যখন দারিদ্র্য ব্যাপক হচ্ছিল, সমাধান হচ্ছিল না - তখন একটি চিন্তা আসল। ড. ইউনুস বা তাদের মতো লোকজন এ বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন, সমস্যাটি হলো যারা নিম্নবিত্ত মানুষ তারা ঋণ পাচ্ছে না। ভাবনা এল কি করে এ সমস্যা দূর করা যায়। তারা একটি সাংগঠনিক ভিত্তিতে কাজ শুরু করল। শুধু ঋণ দেয়াই নয়, কী করে প্রেসার সৃষ্টির মাধ্যমে সে ঋণ ফেরত নেয়া যায় তার একটি পরিকল্পনা হলো। শুধু ঋণ দিয়ে গেলেই তো চলবে না।

কেউ অভিযোগ করলেন এনজিওদের রাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। হ্যাঁ, থাকতে পারে। আমি সেদিকে যাব না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তো সবারই থাকে। আমি একজনকে দোষী করবো কেন? কিন্তু এটি মনে রাখতে হবে এ ধরনের আইডিয়া সরকারি কর্মচারীরা প্রথম করেছিলেন। আমি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলাম। আমি জানি পাকিস্তান আমলে Rural Social Service (RSS) নামে এই আইডিয়াটির প্রকৃত প্রোগ্রাম শুরু হয়। হয়তো এখান থেকেই ড. ইউনুস বা তারা তাদের আইডিয়া পিকআপ করেছেন। অথবা স্বতন্ত্র আইডিয়াও তাদের থাকতে পারে। এতে আমি অন্যায় কিছু দেখি না। আমরা তো কত জায়গা থেকেই কত আইডিয়া নিয়ে থাকি।

আমি বলব যারা এগুলো করেছেন তাদের নিয়ত ভালো ছিল। They really wanted to serve their people. কিছুটা যদি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে থাকে তাহলে আমি তাতে অন্যায় কিছু দেখি না।

তবে সত্য যে, ত্রিশ বছর পর এসে এটি প্রমাণ হয়ে গেছে, দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ বড় ভূমিকা পালন করতে পারে না। ক্ষুদ্রঋণ দ্বারা উন্নয়নও সম্ভব নয়। এজন্য ড. ইউনুস এখন গ্রামীণ ব্যাংকের দিকে যত না জোর দিচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি দিচ্ছেন আইটি সেক্টর, গ্রামীণ ফোন, গ্রামীণ চেকের দিকে। এটি ইন্ডিকেট করে যে, তিনি নিজেও বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। This is not the way, this is a small step. উন্নয়নের পথ হলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সার্ভিস সেক্টরে উন্নয়ন, শিক্ষা খাতে উন্নযন, কৃষিতে উন্নয়ন। আমাদের সে পথে যেতে হবে।

www.pathagar.com

আমরা মনে করি হার্ড-কোর প্রোভার্টি ক্ষুদ্রঋণ দ্বারা দূর করা সম্ভব নয় আরেকটি কারণে। এ সামান্য দুই-পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ করে মূলধন ফেরত দেয়া, লাভ বা সুদ ফেরত দেয়া খুবই কষ্টসাধ্য। সত্যিকার অর্থে এর দ্বারা কিছুই হয় না। এজন্যেই ইসলামপন্থীরা বলেন, You have to introduce free element or contribution element - যেমন, যাকাত। এখানে আদায়ের কোনো কারবার নেই। পুরোপুরি দিয়ে দিতে হয়। কাজেই যাকাত বা যাকাত ধরনের ব্যবস্থা কঠিন দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আদর্শ ব্যবস্থা। ইতিহাসে তাই হয়েছিল। তবে যাকাত দেয়ার ব্যবস্থা সিস্টেমেটিক্যালি করতে হবে।

প্রশ্ন : অনেকে বলেছেন, বর্তমানে এনজিও আট-দশটা ব্যবসার মতো স্রেফ একটি ব্যবসা। এ অভিযোগটির ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : আমি এভাবে বলব না। তাদের মধ্যে যেমন ব্যবসায়ী ধরনের লোক আছে, তেমন আছে বেশকিছু সিনসিয়ার লোক।

প্রশ্ন : বর্তমানে বেকার সমস্যা একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ সমস্যাটা কি কেবলই অর্থনৈতিক, নাকি রাজনৈতিক?

উত্তর : রাজনৈতিক নয়, মূলত অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক হিসেবে এটি যদি না মানি তাহলে সেটি রাজনৈতিক হবে। এ অর্থে রাজনৈতিক যে Political leadership has failed to tackle it. আর কোনো অর্থে নয়। এটি গোটা অর্থনীতির প্রশ্ন। আমরা শুরুতে যে ৭/৮ ভাগ উন্নয়নের কথা বলেছি তা যদি করতে পারি, ফ্যামিলি প্ল্যানিং যদি সঠিক পথে এগোয় তাহলে বেকার সমস্যা কমে যাবে। আর আমাদের সেলফ এমপ্লয়মেন্ট বাড়াতে হবে। আমাদের দুর্নীতির কারণে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে যায়। আমরা যদি বাজেটের ৪০ হাজার কোটি টাকার অন্তত ৫শ' কোটি টাকা প্রতি বছর সেলফ এমপ্লয়মেন্টে ব্যয় করতে পারি তাহলে আমাদের বর্তমানে বেকার সমস্যা দশ বছরে অনেক ভাগ কমে যাবে। তবে এটি অবশ্যই পরিকল্পিত ও দুর্নীতিমুক্তভাবে করতে হবে। কিন্তু আমি মানছি দুর্নীতিমুক্তভাবে করতে পারা মুশকিল।

প্রশ্ন : সাধারণ জনগণের সহজ হিসাব হলো দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে শিল্পের বিকাশ হচ্ছে না। যার কারণে বেকারত্বও কমছে না।

উত্তর : হ্যাঁ, এটি ঠিক। আমি অকপটে স্বীকার করছি যে, আমলাতন্ত্র কিছু ভালো কাজ করেছে এটি যেমন সত্য, তেমনি জটিল আমলাতন্ত্র আমাদের গতি স্লো করে দিয়েছে সেটিও সত্য। আমি বলেছি আমরা ৪/৫ ভাগ প্রবৃদ্ধি করেছি। সেটি যেমন আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে কিছুটা হয়েছে তেমনি কিছুটা হয়েছে প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে। প্রাইভেট সেক্টরকে যত ফ্রি করা হবে উন্নয়ন তত ত্বরান্বিত হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তখন আমলাতন্ত্র কেবল সহায়ক শক্তি হবে।

আমলাতন্ত্রের ভূমিকাকেও কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না, আমাদের দেশে ইম্যুনাইজেশন প্রোগ্রাম, সেফ টিউবওয়েল প্রোগ্রাম সারাদেশে ছড়িয়েছে কারা? আলটিমেটলি এগুলো তো আমলাতন্ত্রের মাধ্যমেই হয়েছে। এটি আমলাতন্ত্রের ভালো দিক। মন্দ দিকটি হচ্ছে এটি Largely corrupt.

প্রশ্ন : এ করাপশনটি কি রাজনৈতিক করাপশন থেকে এসেছে?

উত্তর : না, আমার মনে হয় এটি বলা ঠিক হবে না। প্রত্যেকে তার নিজের কাজের জন্য দায়ী। আমলারা তাদের করাপশনের জন্য দায়ী। আর পলিটিশিয়ানরাও তাদের কাজের জন্য দায়ী। এখানে নিজের সুবিধার জন্য অন্যকে দায়ী করা ঠিক নয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : অভিযোগ রয়েছে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা দুর্নীতিবাজ - এ সুযোগটি কি আমলারা নিচ্ছেন?

উত্তর : আমি কিন্তু জানি আল্লাহর আইন ও দুনিয়ার আইন দুই আইনই বলে প্রত্যেকে নিজের কাজের জন্য দায়ী। একথা কেউ বলতে পারবে না যে, আমি চুরি করেছিলাম যেহেতু আমার বস বলেছিলেন। আমি বলব, আমলারা দুর্নীতিগ্রস্ত নিজের অবস্থা ভালো করার জন্য। পলিটিশিয়ানরা দুর্নীতিগ্রস্ত তাদের নিজেদের লাভের জন্য। উভয়েই এখানে জাতির স্বার্থকে অবহেলা করছেন। একজনকে দোষী করবো অপরকে করবো না - আমি এ নীতিতে বিশ্বাসী নই। That will be very improper, both groups are responsible. তবে এটি ঠিক দেশের যা কিছু উন্নতি হয়েছে তা তাদের জন্যেই হয়েছে, যা হয়নি তার জন্যেও তারা দায়ী। প্রশ্ন হলো আমরা বিষয়টিকে কীভাবে দেখব, হাফ ফুল নাকি হাফ খালি?

প্রশ্ন : আমাদের মনে হচ্ছে আপনি 'হাফ ফুল' বলার পক্ষে।

উত্তর : আমি মনে করি মানুষের জীবনকে পজিটিভভাবে দেখা উচিত। পজিটিভভাবে না দেখার কারণেই যত ঝামেলা। আমি যে ম্যাসেজ দিতে চাই সেটি হলো ইসলামপন্থীরা যেন এ বিষয়টি বোঝে। How to be Al-Amin and Al-Sadek. রাসূল (স) নবী হওয়ার আগে আল-আমিন হয়েছিলেন, আল-সাদেক হয়েছিলেন। আমরা কেন সেভাবে গ্রহণীয় হচ্ছি না?

প্রশ্ন : আপনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (National Board of Revenue - NBR) চেয়ারম্যান ছিলেন। যুগান্তকারী কর ব্যবস্থা ভ্যাট-এর সূচনাকারী। প্রশ্ন হলো এদেশে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বাধাটা কোথায়?

উত্তর : সত্যিকারভাবে বলা কষ্টসাধ্য যে আসল বাধাটি কি বা কোথায়। তবে আমি বলব কেউ ইনকাম ট্যাক্স দিতে চায় না। এজন্য প্রধানত করদাতারাই দায়ী। তারা হয়তো বলবেন আমরা নিয়মকানুন জানি না, পদক্ষেপগুলো কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিলসহ এরকম প্রফেশনালরা যত রোজগারই করুন না কেন তাদের ডিক্লারেশন খুব সামান্য। তারা ঠিকভাবে কর দিচ্ছেন না। ছোট ব্যাবসায়ীরা বলতে গেলে খুবই ফাঁকি দিচ্ছেন। বর্তমানে আমাদের যে ইনকাম ট্যাক্স রেট তা বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় খুবই কম। একে কোনোভাবেই হাইরেট বলা যাবে না। ইনকাম ট্যাক্স না দেয়ার কোনো যুক্তি নেই। আমার মনে হয় লিস্টেড কোম্পানি বাদ দিলে ট্যাক্স ফাঁকির পরিমাণ ৬০ থেকে ৭০ ভাগ। এমনকি ৮০ ভাগও হতে পারে। সত্যিকার অর্থে এর কোনো সমাধান নেই। সমাধান সম্ভব হতো যদি ইনকাম ট্যাক্সের লোকজন ঠিকমত তা আদায়ের ব্যবস্থা নিতেন। তারা যদি নিজেরা দুর্নীতিগ্রস্ত না হতেন। এটি মানতেই হবে যে, ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট বাই এন্ড লার্জ দুর্নীতিগ্রস্ত - This is the reality of Bangladesh. এটি কারোর বিরুদ্ধে নিন্দার জন্য বলছি না। এটি না বলা হলে বলতে হবে সবাই সাধু। তা বলারতো কোনো সুযোগ নেই। কাজেই বিট বাই বিট এগোতে হবে।

ইনকাম ট্যাক্সের একটি ভালো দিক যা সরকার করতে বাধ্য হয়েছে - তা হলো উইথহোল্ডিং ট্যাক্স করা। অর্থাৎ যেখানেই সম্ভব আগে ট্যাক্স নিয়ে নেয়া। আমি বলব এটি করা সঠিক হয়েছে।

সংকটের আরেকটি দিক হলো কর দেয়ার ব্যাপারে আমাদের অনীহা। এটি একটি বড় ফ্যাক্টর। আমাদের ট্যাক্স কালচারটি সেভাবে গড়ে ওঠেনি। ইউরোপ আমেরিকাতে ইনকাম

www.pathagar.com

ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া কঠিন ব্যাপার। আমি শুধু এটুকুই বলব ইউরোপ আমেরিকার এ সংক্রান্ত আরো কিছু প্রসিডিউর আমাদের কর ব্যবস্থায় যদি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার হয় তাহলে তা করতে হবে। বাকি ট্যাক্সের ক্ষেত্রে - যেমন কাস্টমস ডিউটি, ভ্যাট প্রভৃতিতে ইমপোর্ট পর্যায়ে যে রেভিনিউ আসার কথা তার ৯৮ ভাগই চলে আসে বলে আমার ধারণা। লোকাল ম্যানুফ্যাকচারিং লেবেলে যে ট্যাক্স তাতে আমার ধারণা বড় বা মাঝারি ইন্ডাস্ট্রিজে ফাঁকি দেয়া কঠিন। কারণ নানা ধরনের লিংকস এর সাথে রয়েছে। কিন্তু ছোট সেক্টরে ফাঁকি দেয়া এখনো সম্ভব। সার্ভিস সেক্টর যেমন মিষ্টির দোকান, হোটেল, ক্লিনিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে ট্যাক্স ব্যবস্থা চালু আছে তাতে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে বড় বড় হোটেল যেমন সোনারগাঁও, শেরাটন - সেখানে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়।

ট্যাক্স ফাঁকি প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র হলো অডিট সিস্টেমকে শক্তিশালী করা। যে কোনো কারণেই হোক আমরা অডিট সিস্টেমকে স্ট্রং করতে পারিনি। আমি দু'দফায় কর ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও অডিট ব্যবস্থার ততটা উন্নয়ন করতে পারিনি। শেষ মেয়াদে অবশ্য আমি মাত্র এক বছর দায়িত্বে ছিলাম। অডিটকে তখন আমি ফোকাসে আনার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এর মধ্যে আমি রিজাইন করে চলে আসার ফলে বিষয়টি যতটুকু শক্তিশালী করা উচিত ছিল ততটুকু হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

এনবিআর-এর বর্তমান চেয়ারম্যান ড. শোয়েব অনেক যোগ্য ব্যক্তি। আমি আশা করি তিনি এদিকটায় বিশেষ নজর দেবেন। এটি খুবই ক্রিটিক্যাল সেক্টর। অডিট ব্যবস্থা জোরদার করা হলে বড়, মাঝারি বা ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে কর ফাঁকি দেয়া কঠিন হয়ে যাবে। আরেকটি কথা। রেট না বাড়িয়ে ইনকাম ট্যাক্সই আমাদের বেশি করে আদায় করতে হবে। একটি কথা বলি, যদিও শিল্পপতিরা আমার এ বক্তব্য পছন্দ করবেন না। সত্যি কথা হচ্ছে ট্যাক্স হলিডে রেখে এতো লো রেট গ্রহণীয় নয়। আমরা ট্যাক্স হলিডে যদি তুলে দিতে পারতাম তাহলে রেট কমানো যেত। ট্যাক্স হলিডের বিষয়টি আজ রিভিউ করা দরকার। রাজনীতিবিদরা নির্বাচনের আগে শিল্পপতি বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে টাকা নেন। আমি বলব, দেশের স্বার্থেই ট্যাক্স হলিডে তুলে দেয়া দরকার। শুধু রফতানি আয়ের উপর ট্যাক্স করা উচিত নয়। এ কথাটি আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বারবারই বলে আসছে। তবে প্রত্যেক সরকারই রাজনৈতিক কারণে এটি করে না। এটি করা সম্ভব যদি দেশের চারটি প্রধান রাজনৈতিক দল এ ব্যাপারে একমত হয়ে যায়।

প্রশ্ন : আপনি আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কথা বললেন। কিন্তু তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে, তাদের প্রেসক্রিপশনে কোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এরপরও আমরা এ দুটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে দুর্বল। তাদের কাছ থেকে বেশি অর্থ পেলে সরকার নিজেকে সফল দাবি করে। অন্যদিকে অর্থের কম প্রাপ্তিকে বিরোধীদল সরকারের ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত করে। বিষয়টি আপনি ব্যাখ্যা করবেন কি?

উত্তর : আমরা আমাদের সিস্টেমের উন্নয়ন করতে পারছিলাম না, কারণ আমাদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা নেই। যেমন, ট্যাক্স সিস্টেম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ট্যাক্স সিস্টেম কি তা আমাদের জানা নেই। আর তা জানতে গেলে আমাদের কয়েক বছর লেগে যাবে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও আইএমএফ-এর সুবিধা হলো তাদের কার্যালয়ে সমস্ত আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা মজুদ আছে। তারা যে কোনো দেশে টিম পাঠিয়ে দেখতে পারে আন্তর্জাতিক অবস্থার আলোকে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্যটা কোথায়। আর সে আলোকে তারা পরামর্শ দিতে পারে। আমি অকপটে স্বীকার করবো তাদের কারণে আমাদের সিস্টেমের উন্নতি হয়েছে।

www.pathagar.com

অন্যদিকে আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করছি যে, এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের অর্থ নিয়ে একটি জাতি লাভবান হয় আবার হয় না। লাভবান হয় সাময়িকভাবে। শেষ পর্যন্ত বিশাল ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে। এ কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বে এখন এক নতুন দাসত্বের সৃষ্টি হয়েছে। সেটি হলো ঋণ দাসত্ব (Debt Slavery)। আগে ব্যক্তি দাস হতো, এখন জাতি দাস হয়ে যাচ্ছে। এ দাসত্ব হচ্ছে দুটি শক্তির কাছে - ইউরোপ ও আমেরিকা। আর তাদেরকে এ কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করছে আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। তাহলে, আসল ব্যাপার দাঁড়ালো বিশ্ব দাসত্বের এক নতুন কিসসা।

প্রাচীন রোমান আইনে দেখা যায় কেউ ঋণ শোধ করতে না পারলে তাকে দাস বানানো যেত। কিন্তু আজ অফিসিয়ালি বলা হচ্ছে না যে, You are a slave - কিন্তু বাস্তবে আমরা দাস হয়ে যাচ্ছি। এ বিষয়টি হচ্ছে মূলত একটি দেশের স্বার্থে। সে কাজটি তারা করছে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সির মাধ্যমে। এজেন্সিগুলো চোখবুঁজে চরম আনুগত্য দেখিয়ে তার পারপাস সার্ভ করছে। তারা এতো ভালো বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দেয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই তাদের স্বার্থের বাইরে কথা বলতে পারে না।

আমি বলব আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সিস্টেমের উন্নয়ন বিশ্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভালো। কিন্তু সামগ্রিক উন্নয়ন তাদের কারণে হয়েছে বলে আমি মনে করি না। প্রত্যেক জাতি যদি রাজনৈতিক সচেতন হতো এবং তারা যদি নিজের রিসোর্সে বড় হতো তাহলেই সেটি অনেক ভালো হতো। যেমন বর্তমান বাংলাদেশ প্রায় বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ পাঁচ হাজার কোটি টাকার মতো আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে ঋণ পায়। এখানে ঋণ শোধেরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। এ দুটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আজ যারা আন্দোলন করছে, বিক্ষোভ করছে, তারা প্রকৃতপক্ষেই সাধারণ গরীব মানুষের পারপাসই সার্ভ করছে। তারা ঠিক কাজটিই করছে।

আমার মূল্যায়ন হচ্ছে এ দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নয়নের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশি। দাসত্বের সৃষ্টি হয়েছে। আর অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকেই তো রাজনৈতিক দাসত্ব, সাংস্কৃতিক দাসত্ব চলে আসে। এ কারণেই বিশ্ব ইতিহাসে আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ভূমিকাকে আমি পজিটিভ নয়, নেগেটিভই বলব। সামগ্রিকভাবে ফেল না পাস - এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলব, ফেল।

প্রশ্ন : তাহলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য তৃতীয় বিশ্বের কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : মুসলিম বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বসহ সকল দেশের প্রতি আমার প্রেসক্রিসশন হলো, দশ-বিশ বছরের মধ্যে তাদেরকে ফরেন এইড ট্র্যাপ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাদের উন্নয়ন বাজেটের ৫/১০ ভাগ কাট করে এবং রেভিনিউ বাজেটকে ৫/১০ ভাগ কমিয়ে সারপ্লাস বের করতে হবে। ব্যুরোক্রেসি থেকে অপব্যয় কমিয়ে এগুলো করতে হবে। উন্নয়ন বাজেটকেও ১০/১৫ ভাগ কমিয়ে ফেলতে হবে। এটি করতে পারলে আমি মনে করি, ইনশাআল্লাহ আমরা অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারব।

কিন্তু এটি সম্ভব হচ্ছে না কেন? কারণ এর মধ্যে আমলা ও রাজনীতিবিদদের একটি স্বার্থ জড়িয়ে গেছে। ঋণ আসা মানে কারো এজেন্সি হয়, কারো কন্ট্রাক্ট হয়, কারো কনসালটেন্সি হয়, কারো ছেলেমেয়েরা বিদেশে পড়তে পারে, বিদেশ ভ্রমণ করা যায়। প্লেজার ট্রিপের ব্যবস্থা হয়, বিদেশে ব্যাংক ব্যালেন্স করা যায়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই বিভিন্ন সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা (যেমন পাঁচশালা) নেয়া হয়। এ ধরনের পরিকল্পনা কি কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আদৌ সহায়ক?

উত্তর : আমেরিকা, বৃটেনে কিন্তু এ ধরনের পরিকল্পনা নেয়া হয় না। সম্ভবত ফ্রান্সেও নেই। আগেও ছিল না। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন New Economy Plan (NEP) নামে প্রথম এ ধরনের পাঁচশালা পরিকল্পনা নেয়। যখন কমান্ড বা সোসালিস্ট ইকোনোমির বিষয়টি আসলো তখন তারা এ ধরনের প্ল্যান করল। পরিকল্পিতভাবে কাজ করার জন্যই মূলত এটি করা হয়েছিল। সে থেকেই আসলো প্ল্যান্ড ইকোনোমি। আইডিয়াটি সোসালিস্ট চিন্তা থেকেই বেরিয়ে আসে। আইডিয়াটি ভালো। সোসালিজম বা ক্যাপিটালিজমের সবই যে খারাপ তা তো নয়। ক্যাপিটালিজমই তো ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করেছে। সেটি তো আমাদের কাজে লাগছে। অর্থনীতিকে সে কীভাবে কাজে লাগাবে সে ব্যাপারে সরকারের একটি পরিকল্পনা থাকা দরকার। সে প্ল্যানের ভিত্তিতে সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো চলতে পারে। সরকার যদি ছোটও হয় তাকে অন্তত দশটি রাস্তা বানাতে হবে, একটি এয়ারপোর্ট বানাতে হবে, একটি পোর্টের উন্নয়ন করতে হবে। তার জন্য একটি পরিকল্পনা করা আমি সঙ্গত মনে করি।

হ্যাঁ, তাহলে আমেরিকা কেন এটি করে না? তাদের প্রাইভেট সেক্টর খুবই উন্নত। বলতে গেলে সরকারি সেক্টর নেই বললেই চলে। আমাদেরও যদি সরকারি সেক্টর একেবারে ছোট থাকে তাহলে আর এ ধরনের পরিকল্পনা করার প্রয়োজন নেই। আমেরিকায় উন্নয়ন কার্যক্রম লোকাল বা সিটি গভর্নমেন্ট করে থাকে বার্ষিক বাজেটের ভিত্তিতে। কাজেই যে কোনোভাবেই হোক সেখানেও প্ল্যান থাকে। কিন্তু ক্যাপিটালিস্টরা এটি মানতে চায় না। তারা বলে এটি ক্যাপিটালিজমের আইডিয়ার বাইরে।

বাংলাদেশ সরকারকে উন্নয়ন বাজেটের প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হয় - রাস্তাঘাট উন্নয়নে, দারিদ্র্য বিমোচনে বা অন্য ক্ষেত্রে। সে ক্ষেত্রে বার্ষিক পরিকল্পনা দরকার আছে বলে আমি মনে করি। পরিকল্পনা তো জীবনেরই একটি অংশ। আর অর্থনীতি জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাহলে অর্থনীতিতে পরিকল্পনা থাকবে না কেন?

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উন্নয়ন ক্ষেত্রে সরকার ও প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকা কি ধরনের হওয়া উচিত?

উত্তর : বিষয়টি স্টেজের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ অর্থনীতি কোন স্টেজে আছে। যেমন বাংলাদেশে পোর্ট, এয়ারপোর্ট বা হাইওয়েজ, পাওয়ার সেক্টরসহ বড় ধরনের অবকাঠামো প্রাইভেট সেক্টর করবে এটি বর্তমানে আশা করা যায় না। পাঁচশ কোটি টাকার একটি সার কারখানা করা কি কোনো প্রাইভেট সেক্টরের পক্ষে সম্ভব? কাজেই এখন এ ধরনের কাজ সরকারকেই করতে হবে। প্রাইভেট সেক্টর পর্যাপ্ত পর্যায়ে উন্নতি করলে তখন তাদেরকে সরকার এসব কাজ দিয়ে দিতে পারে। যেমন পাওয়ার সেক্টর সম্পূর্ণই প্রাইভেট সেক্টরকে দিয়ে দেয়া যাবে। এমনকি আমি বলব তেল কোম্পানিও দেয়া যাবে। সেখানে সরকারের শেয়ার থাকবে। আমি মনে করি, আমরা বর্তমানে যে স্টেজে আছি তাতে সরকারকে এখনো অবকাঠামোতে থাকতে হবে। কোনো ইন্ডাস্ট্রিজের ক্ষেত্রে নয়। তবে দু'একটি ইন্ডাস্ট্রিজের ক্ষেত্রে যেমন পাওয়ার কিংবা সার-কারখানা তৈরির কাজ সরকারকেই করতে হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আমাদের দেশে সরকার ছোট হচ্ছে না। বরং হেন কোনো বিষয় নেই যেখানে সরকার নাক গলায় না।

উত্তর : সরকারকে অবশ্যই ছোট করে আনতে হবে। বর্তমানে যে ৮/৯ লাখ সরকারি কর্মচারী আছে তা কমাতে হবে। ইউরোপ, আমেরিকায় কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত ছোট। লোকাল গভর্নমেন্টই মূলত সব কাজ করে। ট্যাক্স উঠানোর কাজও তারা করে। আর ওখানে অবস্থা এমন যে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার কোনো উপায় নেই। আবার বলি, আমি ছোট সরকারের পক্ষে। ব্যুরোক্রেসিকে ছোট করে আনতে হবে। এজন্য খুবই সাহসী একজন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজন হবে। সাহসী অর্থমন্ত্রী লাগবে। সাহসী কেবিনেট লাগবে। কারণ এটি পলিটিক্যালি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা একটি পরিকল্পনা নিতে পারি যে, দশ বছরের মধ্যে এটি করবো। কিন্তু সব সরকারই ভয় পায় যে, এটি করলে হয়তো পাঁচ বছর পর আর ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। এজন্য সকলের ঐকমত্য দরকার।

প্রশ্ন : ব্যাংক উচ্চবিত্তের জন্য। নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্তরা এ থেকে কোনো উপকার পায় না - এ অভিযোগে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর : এসব বিষয় মানুষ সরলীকরণ করে ফেলে। প্রথম কথা এ অভিযোগ ঠিক নয়। সুস্পষ্টভাবে সব কাজ বুঝতে হবে। তবে একথা বলা ঠিক, ব্যাংক যদি ইমপোর্ট ফাইন্যান্স করে, ইমপোর্ট যদি সঠিকভাবে হয় তাহলে তা সবারই কাজে লাগবে। তেমনি এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সের ব্যাপারেও একই কথা। এতে রাষ্ট্র বেনিফিট পায়। আর রাষ্ট্র পেলে তো জনগণও পায়। এছাড়া ব্যাংক যদি ম্যানুফ্যাকচারিং-এ ফাইন্যান্স করে তাহলে পণ্য তৈরি হয়। কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। জনগণ উপকৃত হয়। কাজেই একথা ঠিক নয় যে নির্দিষ্ট কেউ উপকৃত হচ্ছে না। তবে আমি বলব ব্যাংকগুলোকে ক্ষুদ্র শিল্পে আরো বেশি ফাইন্যান্স করা উচিত ছিল। ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজে আরো বেশি ফাইন্যান্স করলে ভালো হতো। একইভাবে সেলফ এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে বলা যায়। কিন্তু যেহেতু আমাদের মানসিকতা ক্যাপিটাল ওরিয়েন্টেড, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ওরিয়েন্টেড বা জাস্টিস ওরিয়েন্টেড নয়, সেহেতু আমরা এদিকে নজর দেই না। সোজা কথা আমরা এলিটে চলে গেছি। গরীবের দুঃখ বুঝি না। রমযান মাসের শুধু ক্ষুধার কষ্ট ছাড়া আর কোনো দুঃখ বুঝি না। We have democracy but not social democracy. আমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে। কবি বলেছেন, "আমরা সবাই পরের তরে"। কিন্তু এ বিষয়টি আর আমাদের মধ্যে নেই। ক্যাপিটালিজম আমাদেরকে মেটেরিয়ালিস্ট বানাচ্ছে।

ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্পে ঋণ দেয়ার ব্যাপারে ব্যাংকের নেতিবাচক মনোভাবের অনেক কারণ রয়েছে। আমাদের ব্যাংকাররা এমনকি ইসলামী ব্যাংকের ব্যাংকাররাও বলে থাকেন আমরা যদি এদের কাছে বিনিয়োগ করি তাহলে আমাদেরকে এক হাজার, দুই হাজার গ্রাহক নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। কর্মচারী বেশি নিয়োগ করতে হবে। কাউন্টার বেশি লাগবে। সবকিছুই বেশি বেশি লাগবে। আর যদি সেখানে একবারে একশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয় তাহলে পরিশ্রম কম লাগবে। আসলে ব্যাংকগুলো নিজেদের খরচ বাঁচাতে চায়। সমাজকে নয়। নিজেরা নিজেকেই বাঁচালো। ইসলামের উদ্যোগকে সামনে রাখলো না।

ড. ওমর চাপড়া বলেছেন, ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচার, এর অর্থ চাহিদা পূরণ। আগে নিড ফুলফিলমেন্ট কর। এ বিষয়টি আমাদের মধ্যে নেই।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : অভিযোগ রয়েছে ঋণ খেলাপীর পেছনে ব্যাংকের ভূমিকাই প্রধান। আপনার কি অভিমত?

উত্তর : এটি ঠিক নয়। ভুল কথা। মূল কারণ, যারা খেলাপী তারা ঠিকমত ঋণ ফেরত দিচ্ছেন না। নানারকম তথ্য গোপন করে তারা ঋণ নেন। কিংবা প্রভাব বিস্তার করে ঋণের ব্যবস্থা করেন। প্রভাব বলতে রাজনৈতিক প্রভাব, ইউনিয়নের প্রভাব। আসলে ঋণ খেলাপীর পেছনে এ প্রভাবটার ভূমিকাই প্রধান। তবে ব্যাংকগুলোর দুর্বলতা হলো অযৌক্তিক চাপের সামনে নত হওয়া। আবার তাদের মধ্যে কিছু দুর্নীতি আছে। খেলাপী ঋণ রিকভারের জন্য তাদের যতটা মনোযোগ দেয়ার দরকার তারা তা দিচ্ছেন না। অন্যদিকে তারা হয়তো বলবেন, Legal system is very complex in our country left by British Government and made more complex by our people. কাজেই It is combination of factors. আমার যেটি মনে হয়, আসল সমাধান হচ্ছে ঋণ দেয়ার সময় মন্দ ঋণ না দেয়া।

আরেকটি কথা বলি, বর্তমানে যে ২৩ ভাগ খেলাপী ঋণ তা আগের হিসেবে প্রায় ৭০ ভাগ। কারণ বর্তমান ঋণ শ্রেণীকরণ পদ্ধতি বেশ টাফ। হিসাব পদ্ধতিও বেশ কড়া। সে অর্থে দশ বছর আগের তুলনায় তা এখন সত্যিই উন্নতি করেছে। কাজেই আমি বলব, ঋণ খেলাপীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আমরা যে পরিকল্পনার মাধ্যমে রিফর্ম করেছিলাম, ৯২-৯৬ পর্যন্ত আমি এর দায়িত্বে ছিলাম, তাতে ব্যাংকিং সিস্টেম বেশ উন্নতি করেছে। আমাদের দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা কিন্তু ভালো। অন্যদেশে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়, দেউলিয়া হয়ে যায়। আমাদের দেশের এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাংক বন্ধ হয়নি। বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও দেখি না।

প্রশ্ন : বিশ্বের প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থায় কোনো মুসলিম দেশে সার্বিকভাবে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন কি সম্ভব?

উত্তর : প্রথমে বুঝতে হবে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাটি কি? তবে, এর আগে বলে নেই এটি সম্ভব। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় বর্তমানের মতোই আমদানি-রফতানি হবে। এরকমই একটি সেন্ট্রাল ব্যাংক মনিটরি পলিসি ফলো করবে। সরকার এরকমই একটি ফিন্যান্স সিস্টেম ফলো করবে। তার একটি ব্যয়নীতি, ট্যাক্সনীতি থাকবে। বর্তমানের মতোই ব্যাংকিং পলিসি থাকবে। অর্থাৎ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা কল্পনা রাজ্যের কোনো ব্যাপার নয়। হ্যাঁ, মনিটরি ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন হবে। এ ব্যাপারে আমি ড. ওমর চাপড়ার Towards a Just Monitory System গ্রন্থের Monitory Policy অধ্যায়টি পড়ার জন্য বলব। ট্যাক্স ব্যবস্থাও প্রায় একই রকম থাকবে। খুব বেশি হলে যাকাত ব্যবস্থা আলাদা করা হবে। যাকাতের এ অর্থ শুধুমাত্র সোস্যাল ওয়েলফেয়ারে ব্যয় হবে। এরপর ব্যয়নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন হবে। সরকারের 'অগ্রাধিকার' পরিবর্তন হবে। সরকার লাক্সারিস-এ একদমই যাবে না। আগে নিড ফুলফিলমেন্ট। ব্যাংক পলিসিও পরিবর্তন হবে। আমরা সুদকে পরিত্যাগ করবো। যতটা সম্ভব মুদারাবা, মুশারাকা সিস্টেমে যাব। মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জল, বাই-সালাম, ইসনিসনাতে যাব।

আমাদের মধ্যে একটি ধারণা আছে। ওই যে বলে না, খোল নলচে বদলে দেব - পুরোপুরি ভেঙে গড়ে তুলব - এগুলো হচ্ছে আধুনিক অর্থনীতি ও জীবনব্যবস্থা না বোঝার কারণে এবং ইসলাম সম্পর্কে লিটল নলেজ থাকার কারণে। বাস্তবে সব বদলাতে হবে না। একটি কথা পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই যে, আমাদের যে আইন আছে তা গবেষণা করলে দেখা যায় এর তিনটি ভাগ রয়েছে। একটি হচ্ছে, আমাদের ইনহেরিটেন্স - যেমন বিয়ে, তালাক,

www.pathagar.com

কাস্টডি, এডপশন ইত্যাদি। এসবগুলোই ইসলামী আইন মোতাবেক হচ্ছে। আচ্ছা, ট্রাফিক আইনকে কি ইসলাম বিরোধী আইন বলা যাবে? কাজেই বলা যায় ৯০ ভাগ আইনই ইসলাম বিরোধী নয়। এই যে, ফুটবল খেলা- ইসলামী রাষ্ট্রে এটি থাকবে। নামাযের সময় খেলা বন্ধ থাকবে। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে পাঁচ দিনের টেস্ট এমনভাবে শুরু করা হবে যা শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলে। কারণ শুক্রবারটি জুম্মার নামাযের জন্য বন্ধ রাখতে হবে। আসলে ইসলামপন্থীদের আরো গভীর পড়াশুনা দরকার। তাহলে বুঝার ক্ষেত্রে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

প্রশ্ন : একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আপনাকে কেউ চিন্তাবিদ, কেউ শিক্ষাবিদ, কেউ লেখক, কেউ আমলা আর কেউবা অর্থনীতিবিদ হিসেবে দেখে থাকেন। ইদানিং আপনাকে কেউ কেউ বিশিষ্ট ব্যাংকার হিসেবেও উল্লেখ করেন। আপনার নিজের কোন পরিচয়ে পরিচিত হতে ভালো লাগে।

উত্তর : আমি জানি না লোকেরা আমার সম্পর্কে কি ভাবে। আমি নিজেকে মনে করি, আমি একজন ইসলাম বিশ্বাসী মানবসেবক বা সমাজসেবক। আমি এ পরিচয়ে পরিচিত হতে ভালোবাসি। আমি মানুষের উপর অত্যাচার করিনি, তাদের উপর জুলুম করিনি। যতটুকু পেরেছি মানবসেবা ও সমাজসেবার চেষ্টা করছি। তবে আমি এরকম মনে করলেই তো আর হবে না। আমি হয়তো এ ধরনের টাইটেল পাওয়ার যোগ্যই নই। আসলে হয় কি, একটি জাতি যদি অন্ধকারে থাকে তাহলে ছোট মোমবাতিকেও বড় মনে হয়। আমাদের দেশ অন্ধকারে ভরা। সেখানে আমার মতো ক্ষুদ্র লোককেই কেউ কেউ বড় মনে করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো When I see myself, I find myself full of faults.

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সরদার ফরিদ আহমদ ও ওমর বিশ্বাস
প্রকাশকাল : ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা

www.pathagar.com

সম্ভাব্য অর্থনৈতিক চাপ মোকাবিলায় আমাদের এখনই মাঠে নামতে হবে

প্রশ্ন : ইরাক যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতিতে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : যুদ্ধ তো কোনো ভালো কাজ নয়। যদিও আমেরিকা মনে করে যুদ্ধ একটি খেলার বস্তু। আমরা গত এক বছর ধরে যা দেখছি তাতে প্রথমে তারা বলেছিল ইরাককে নিরস্ত্র করতে তারা যুদ্ধ করবে। তারা কোনো প্রমাণই দেখাতে পারেনি গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার। আর এখন তারা যুদ্ধ করছেন সরকার বদলের জন্য। এ যুদ্ধ পুরোপুরি আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে। বিশ্বে এরচেয়ে অন্যায় যুদ্ধ খুব কমই হয়েছে। যুদ্ধ কখনো কোনো ভালো ফল বয়ে আনে না। বিশ্ব অর্থনীতির উপর এ যুদ্ধ মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। আমেরিকা প্রথমে বলেছিল স্বল্প সময়ের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। ফলে অর্থনীতির উপর তেমন প্রভাব পড়বে না। এখন তো দেখা যাচ্ছে যুদ্ধ দীর্ঘ সময় চলবে। এ যুদ্ধের সমাপ্তি কীভাবে ঘটবে তা বলা মুশকিল। যুদ্ধের ফলে তেলের দাম বাড়বে। তেলের দাম বাড়া মানেই জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে যাওয়া। এর ফলে অন্যান্য দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পাবে। সারা দুনিয়া এজন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে অর্থনীতির মারাত্মক ক্ষতি হবে।

প্রশ্ন : এ যুদ্ধ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কেমন প্রভাব ফেলতে পারে?

উত্তর : আমি মনে করি, ইরাক যুদ্ধ আমাদের অর্থনীতিতে মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলবে। দেরি করে হলেও বাংলাদেশ সরকার যৌক্তিক অবস্থান নিয়েছে, স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে, যুদ্ধ বন্ধ কর। ঢাকায় ইরাকী কূটনীতিকের সংখ্যা হ্রাস করার যে প্রস্তাব তারা দিয়েছে সরকার তা রাখেনি। এটি রাখা খুবই অন্যায় হতো। ফলে আমেরিকার আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবার কোনো কারণ নেই। আমরা ধরেই নিতে পারি যে, দেশের সকল স্তরের জনগণ, সকল পত্র-পত্রিকা যেভাবে মার্কিন সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে এতে মার্কিন সরকার বাংলাদেশের জনগণের মতামত সম্পর্কে এখন ভালোভাবেই বুঝতে পারছে। ফলে আমাদের উপর তারা নাখোশ হবে এটিই স্বাভাবিক। আর তা যদি হয়, তাহলে আমাদেরও তৈরি হতে হবে। তারা যে কোনো সময় গার্মেন্টসের কোটার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে। সরকার যদি মনে করেন এটি হবার পর আমরা ব্যবস্থা নেব তবে তা ঠিক হবে না। আমাদের এখনই ধরে নিয়ে এগুতে হবে যে, আমেরিকা কোনো না কোনোভাবে আমাদের আঘাত করবে। আমাদের সে প্রস্তুতি নিয়েই এগুতে হবে। এজন্যে

www.pathagar.com

আমি মনে করি, সরকারের উচিত তার আমদানি-রফতানি কর্মসূচিকে পুরোপুরি পুনর্গঠন করা। ঘটনা ঘটার জন্য সকলে বসে থাকলে চলবে না। এখনি কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। জনগণকেও এমন একটি পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত করে তুলতে হবে। আমেরিকার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার অর্থই যে একটি মূল্য দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা, সকল রাজনৈতিক দলকে তা বুঝতে হবে।

প্রশ্ন : সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছে যে, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই নাজুক। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর : আমি এ ব্যাপারে বহুবার বলেছি যে, বিশেষ কোনো দিনকে অর্থনীতির জন্য শুভ বা অশুভ বলা যায় না। আমরা কি কোনো দিন বলেছি যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো? গত ত্রিশ বছরের প্রতি তাকালে দেখা যাবে যে, আমাদের অর্থনীতিতে ভালো কোনো দিন আসেনি। কোনো সরকারকেও বলতে শুনিনি যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো যাচ্ছে। আওয়ামী লীগের আমলে বা এরশাদের আমলে আমি কাউকে বলতে শুনিনি যে, দেশের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো যাচ্ছে। সুতরাং এটি আমাদের মানসিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন : কিন্তু অন্যান্য সময় দেখা যেত সরকার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভালো বলছেন আর বিরোধীরা বা জনগণ বলছেন খারাপ। কিন্তু কিছুদিন আগে স্বয়ং অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, আগামী তিন মাস দেশের অর্থনীতির জন্য বেশ খারাপ...

উত্তর : সেটি অন্য বিষয়। কিন্তু আমি বলবো যে, অর্থনীতিকে খারাপ বলার একটি প্রবণতা আমাদের মানসিকতার মধ্যেই রয়ে গেছে। নেগেটিভ চিন্তাটাই বেশি কাজ করে। আমাদের অর্থনীতি দুর্বল অর্থনীতি এ কথা সত্যি। কিন্তু তারপরও আমি বলবো যে, গত ১৫/২০ বছর ধরে, বিশেষ করে ৭৮/৭৯ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছরে গড়ে শতকরা ৫/৭ ভাগ করে আমাদের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে - এটি অর্থনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক দিক। আমাদের দেখতে হবে দারিদ্র্য বেড়েছে কি না। আমি দেখেছি, গ্রামে তেমন জুতা পরা, শার্ট পরা লোক পাওয়া যেত না। তারা খালি পায়ে, খালি গায়ে থাকতো। এখন শার্ট পরা, জুতা পরা লোক গ্রামে যথেষ্ট পাওয়া যায়। গ্রামে টেলিভিশন চলে গেছে। সর্বাংশে না হলেও বিরাট অংশে বিদ্যুৎ চলে গেছে। গ্রামে এখন বিশুদ্ধ খাবার পানি পাওয়া যাচ্ছে। আমার অল্প বয়সে ১৯৫৫/৬০ সালের দিকে দেখেছি পুরো গ্রামের মানুষ কুয়ার পানি খাচ্ছে। সুতরাং সার্বিক বিচারে দারিদ্র্য কমেছে।

আমাদের প্রতি বছরের যে প্রবৃদ্ধি সেটিকে সামনে রেখে আমি বলতে চাই, এমন কথা বলা ঠিক নয় যে, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। তবে একথা সত্য যে, গত এক বছরে দ্রব্যমূল্য অনেক বেড়েছে। যে কোনো সরকারের জন্য এটি বিব্রতকর ব্যাপার। যেখানে আমাদের বাম্পার ফলন হয়েছে, সেখানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির তেমন কোনো কারণও নেই। তেলের দামসহ কিছু বিষয় অবশ্য আন্তর্জাতিক মূল্যের উপর নির্ভরশীল। দ্রব্যমূল্যের এ বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের খুব কষ্ট হচ্ছে - এ কথা আমি অস্বীকার করবো না। কিন্তু অন্যভাবে বলতে গেলে আমি বলবো ম্যাক্রো ইকোনোমির ক্ষেত্রে আমাদের রাজস্ব আদায় ভালো হয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে। সুতরাং সার্বিক বিচারে আমাদের অর্থনীতি ভালো না বললেও আমি খারাপ বলবো না। যদিও বার্ষিক প্রবৃদ্ধি আরো বাড়ানো গেলে, ৭/৮ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করা গেলে আরো ভালো হতো। সেটি আমরা পারছি না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বাংলাদেশে সম্প্রতি অনেকগুলো বেসরকারি ব্যাংক গড়ে উঠেছে। এটিকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখছেন?

উত্তর : আমাদের ব্যাংকের সংখ্যা খুব বেশি আমি তা বলবো না। কারণ আমেরিকাতে হাজার হাজার ব্যাংক আছে। প্রত্যেক ছোট শহরে একটি করে ব্যাংক আছে। এগুলোকে লোকাল ব্যাংক বলে, আমাদের তো লোকাল ব্যাংক নেই। আমাদের রয়েছে কিছু জাতীয়ভিত্তিক ব্যাংক। এ ব্যাংকের সংখ্যা আমি বেশি বলবো না, তবে একটি বিষয় দেখা দরকার। সকল সরকারের আমলে দেখা গেছে কিছু ব্যাংক রাজনৈতিক কারণে অনুমোদন দেয়া হয়। কোনো বিশেষ ব্যাংকের কথা আমি বলতে চাই না। এ প্রবণতা আমাদের অবশ্যই পরিহার করতে হবে। সরকার তাদের লবি ইন্টারেস্টের বাইরে যেতে পারে না। কোনো না কোনো উপায়ে তারা নিজেদের দলের লোকদের স্বার্থ দেখে। এটি আমাদের একটি জাতীয় সমস্যা। এটি ঠিক নয়। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, ব্যাঙের ছাতার মতো ব্যাংক গড়ে উঠেছে। একথাও ঠিক নয়। তবে ভবিষ্যতের ব্যাপারে আমি বলবো, ব্যাংকের অনুমোদন দেয়ার ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

প্রশ্ন : অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাংক তুলনামূলক উচ্চহারে লভ্যাংশ ঘোষণা করছে। পাশাপাশি সরকারি ব্যাংকগুলোকে অব্যাহত লোকসান দিতে দেখা যায়। এর কারণ কি?

উত্তর : অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাংক উচ্চ হারে লভ্যাংশ দিচ্ছে এ কথা ঠিক নয়। কিছু কিছু ব্যাংক দিচ্ছে। তারা পুঁজি ঠিকমতো রাখছে কি না সেগুলো না দেখে কিছু বলা যায় না। অনেক সময় লভ্যাংশ বেশি দেয়ার অর্থ দাঁড়ায় মালিকদেরকে বেশি দিয়ে দেয়া। এর অর্থ মালিকদের ফেভার করা। এটি ঠিক নয়। তাছাড়া ক্রেডিট নেয়ার জন্য আপনি যত টাকা লাভ করলেন তার সবই দিয়ে দিলেন, ব্যাংকের জন্য কিছুই রাখলেন না - এটিও ঠিক নয়। এর অর্থ কেবল মালিকের স্বার্থ রক্ষা করা। এছাড়া সব বেসরকারি ব্যাংকই যে লভ্যাংশ দিচ্ছে, একথাও ঠিক নয়। কিছু ব্যাংক তেমন কিছুই দিতে পারছে না। তাছাড়া সরকারি ব্যাংকগুলো তো লভ্যাংশ দেয়ার প্রশ্নই আসে না। তারা দেবে লাভ। তাদের সব লাভই সরকারি ফান্ডে চলে যাবার কথা।

প্রশ্ন : সরকারি ব্যাংক সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সত্ত্বেও লস দেয় কেন?

উত্তর : এ প্রশ্ন তাদের করাই ভালো। তবে আমি বলতে পারি সরকারি ব্যাংকগুলোকে সরকারের চাপে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ করতে হয়। রাজনৈতিক চাপে নয়, সরকারি স্বার্থেই করতে হয়। মনে করুন তাঁত শিল্পকে বাঁচাতে হবে। কোন প্রাইভেট ব্যাংক সেখানে বিনিয়োগ করতে রাজি হচ্ছে না। সরকার সরকারি ব্যাংকগুলোকে বললো, তোমরা ইনভেস্ট কর। সরকার টেক্সটাইল শিল্পকে বাঁচাতে চায়। সেটি কেবল সরকারি সেক্টরে নয়, বেসরকারি সেক্টরেও। সরকার বলল, আর কেউ না দিলেও তুমি দাও। ডকইয়ার্ডকে তুমি দাও। বন্দরকে তুমি দাও, বাংলাদেশ বিমানকে তুমি দাও। সরকারি ব্যাংকগুলোকে বাধ্য হয়ে জাতির পক্ষে কিছু কাজ করতে হচ্ছে। ফলে তার পক্ষে ওভাবে লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না, যেভাবে হচ্ছে প্রাইভেট ব্যাংকগুলোর পক্ষে। প্রাইভেট ব্যাংকগুলো তো যেখানে তাদের স্বার্থ নেই সেখানে যাবেই না। তবে আমার কথার অর্থ এ নয় যে, সরকারি ব্যাংকগুলোর কোনো সমস্যা নেই। তাদের যেসব দুর্বলতা আছে, দুর্নীতি আছে, সেটি দেখতে হবে। তারা যে রাজনৈতিক প্রভাবের শিকার - সেটিও দেখতে হবে। তারা যে ইউনিয়নের চাপের শিকার - সেটিও দেখতে হবে। তবে এগুলো দীর্ঘ মেয়াদে দূর করতে

www.pathagar.com

হবে। আমাদের জাতির যে পরিচয় তাতে স্বল্প সময়ে এসব বড় সমস্যা আমরা দূর করতে পারবো বলে আমার মনে হয় না। তবে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের। সেটিও একটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার। সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব বলা যত সহজ তৈরি করা তত সহজ নয়। রাজনৈতিকভাবে যদি কিছু সৎলোক আসে, সাংবাদিকদের মধ্যে যদি কিছু সৎ লোক আসে, ব্যাংকারদের মধ্যে যদি কিছু সৎ লোক আসে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে যদি কিছু সৎ লোক আসে তবে অর্থনীতির ভালো হবে। প্রয়োজন যোগ্যতার ও সততার।

প্রশ্ন : কোনো কোনো ব্যাংক একীভূত করার একটি উদ্যোগ সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একে আপনি কীভাবে দেখছেন?

উত্তর : একীভূত করা কোনো নতুন কিছু নয়। সারা দুনিয়া একীভূত হচ্ছে। তবে জোর করে কোনো ব্যাংককে একীভূত করা যাবে না। এটি আইনবিরোধী হবে। কিন্তু দুটি ব্যাংক যদি মনে করে যে, আমাদের একীভূত হওয়া দরকার তবে তারা করবে। কিন্তু তা স্বাধীনভাবে হওয়া উচিত। তবে হ্যাঁ, এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি দেখে যে, কোনো ব্যাংকের অবস্থা খুব খারাপ সেক্ষেত্রে ঐ ব্যাংককে আরেকটি ব্যাংকের সঙ্গে মার্জ করিয়ে দিতে পারে যদি সে ব্যাংক রাজি হয়। এক্ষেত্রে সরকারি ব্যাংককে মার্জ করানো যতটা সহজ কোনো বেসরকারি ব্যাংকের ক্ষেত্রে বিষয়টি ততটা সহজ নয়। কারণ সরকারকে অতি সহজেই রাজি করানো যায়। তবে একীভূতকরণ যেমন ক্ষতিকর কোনো কিছু নয় ঠিক তেমনি জোর করে একীভূত করাও উচিত নয়।

প্রশ্ন : সরকার সম্প্রতি বেসরকারি ব্যাংকগুলোর জন্য কতিপয় নীতিমালা তৈরি করছে। ব্যাংক মালিকরা এর বিরোধিতা করে চলছেন। এ ব্যাপারে আপনাদের অবস্থান কি?

উত্তর : এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস (বিএবি) এর অবস্থান যা আমাদের অবস্থানও তাই। আমরা জানি না, সরকার কেন তাড়াহুড়ো করে এ কাজটি করল। ব্যাংকিং সেক্টরের উন্নতির সঙ্গে এর কি সম্পর্ক তাও আমি জানি না। ব্যাংকিং সেক্টরের মূল সমস্যা এগুলো নয়। বিনিয়োগকারীদের মধ্য থেকে দু'জন পরিচালক নিলেই ব্যাংক উন্নতি করে যাবে এটি সঠিক নয়। একটি বোর্ড যদি ১১ জনেরও হয় বা ১৩ জনেরও হয় কিংবা ১৫ জনেরও হয় সেক্ষেত্রে দু'জন ডাইরেক্টর সংস্কার করে ফেলতে পারবেন - এ কথা আমি মনে করি না। পাকিস্তান আমল থেকে আমি ব্যাংকিং দেখছি কিন্তু কখনও শুনিনি যে, ডিপোজিটরদের মধ্যে থেকে পরিচালক নেয়া হয়। হঠাৎ করে একটি কথা কেউ বলল আর সেটিকে ইউরেকা মনে করে একমাত্র সমাধান হিসেবে আইন পাস করে নিলো - এটিকে আমি একেবারে নাহক কথা বলে মনে করি। এ নিয়ম শতকরা ৯৮ ভাগ দেশে অনুসরণ করা হয় না। দু'একটি দেশে অনুসরণ করা হলেও তারা আমাদের চেয়ে উন্নত নয়। দ্বিতীয়ত বলা হচ্ছে যে, পরিচালকদের স্বপদে ৬ বছরের বেশি থাকা যাবে না। তাদেরকে তিন বছর ব্রেক দিতে হবে। তারপর আবার আসতে পারবে। এ আইনটি হয়তোবা আইনসম্মত, আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু একটি কথা হচ্ছে যে, সকল বেসরকারি ব্যাংক কোম্পানি আইন কর্তৃক গাইডেড হয়। কোম্পানি আইনের বাইরে যে অংশটি হয় সেক্ষেত্রে আমরা ব্যাংক কোম্পানি এ্যাক্টে যাই। সকল কোম্পানি যদি কোম্পানি আইনে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, হঠাৎ করে এটিকে আলাদা করার প্রয়োজন হলো কেন? সরকার যদি এমন কিছু করতে চায় তবে এখন থেকে আইনটি করতে পারে। তারপরে ৬ বছর পরে শেয়ারহোল্ডারগণ যদি তাকে পুনর্নির্বাচিত করতো তবে কি দোষ হতো? গ্যাপ দিলে অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটবে, তিনি তখন

www.pathagar.com

নিজে না দাঁড়িয়ে আরেকজনকে দাঁড় করিয়ে দেবেন। পরিবারে আর কাউকে দেবেন, বন্ধু-বান্ধবকে দাঁড় করিয়ে দেবেন। আবার তিন বছর পরে চলে আসবেন। মূল কথা হচ্ছে এ আইন ব্যাংকিং সেক্টরের কোনো মৌলিক কল্যাণ করবে না। ব্যাংকিং সেক্টরের আসল স্বাস্থ্যের পরিবর্তন দরকার। সরকার এসব যা করছে এগুলো হলো কসমেটিক। মুখের ওপর পাউডার লাগানো হচ্ছে। মূল কথা হচ্ছে আমি পুনর্গঠনের পক্ষে। পুনর্গঠনকে আমি ভালোবাসি। বাংলাদেশ ব্যাংকে থাকার সময় এবং এনবিআরএ থাকার সময় আমি পুনর্গঠনে নেতৃত্বে দিয়েছি। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে বর্তমান আইন কোনো সুফল বয়ে আনবে না। মূল সমস্যা এগুলো নয়। মূল সমস্যা হলো দক্ষতার সমস্যা, দুর্নীতির সমস্যা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুপারভিশনের অভাব। মূল সমস্যা হচ্ছে আমাদের মামলাগুলো বছরের পর বছর ঝুলে থাকে। আমাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক নেই। এগুলো দূর না করে আমরা যদি এসব কসমেটিক্স করি তার কোনো মানে হয় না। এটি সরকারের জন্য ভালো হবে বলে আমি মনে করি না।

প্রশ্ন : বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত অর্থ সহজে তাদের স্বজনদের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংক যে বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের একটি বিরাট অংশ আসছে মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের পাঠানো অর্থ থেকে। কঠোর পরিশ্রম করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে তারা দেশের ও নিজ পরিবারের আংশিক উন্নতি সাধন করছে অথচ এ টাকা দেশে পাঠাতে গিয়ে তাদেরকে নানা ভোগান্তির শিকার হতে হয়। প্রবাসীদের এ সীমাহীন দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে আমরা প্রবাসীদের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠানোর সহজতম পন্থা চালু করেছি। এ ব্যবস্থায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে তারা দেশে টাকা পাঠাতে পারছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আমরা মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিনিধি রেখেছি। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের জনপ্রিয় ব্যাংকগুলোর সঙ্গে চুক্তি করেছি। সেখানে আমাদের একাধিক টিম প্রেরণ করা হয়েছে। আরো প্রেরণ করার পরিকল্পনা আমাদের আছে। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশীরা অত্যন্ত সহজ উপায়ে, স্বল্প সময়ে এবং কম খরচে টাকা পাঠাতে পারছেন।

প্রশ্ন : দেশে ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা এবং সাধারণ ব্যাংকের ইসলামী শাখার সংখ্যা দিনদিন বেড়েই চলছে। এর কারণ কী?

উত্তর : এটি প্রমাণ করে যে, জনগণ ইসলামী ব্যাংকিং চায়। জনগণ সুদ এভয়েড করতে চাচ্ছে। আগের চেয়ে জনগণ এখন ইসলাম বেশি বোঝে। আগের চেয়ে অনেক বেশি লোক কুরআন-হাদিস পড়ে, কুরআনের অনুবাদ এখন বেশি পাওয়া যায়। সুদ যারা নেয় তারাও মনের দিক থেকে অশান্তিতে থাকে। জনগণের তীব্র চাহিদার প্রেক্ষিতেই নতুন নতুন ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে। অনেক ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর করা বেশ সময়ের ব্যাপার। সেক্ষেত্রে তারা যদি দু'একটি ইসলামী শাখা খোলে তাতো শুভই। কিন্তু যা করবে সিনসিয়ারলি করা উচিত। ইসলাম নিয়ে খেলা করা উচিত নয়। ইসলাম তো শো-বিজ নয় যে প্রদর্শন করবে। জনগণ এখন ইসলামী ব্যাংক চায়। যেমন এখন দেশের একশ' পার্সেন্ট লোক ইরাক যুদ্ধের বিরুদ্ধে। একশ' ভাগ লোক না চাইলেও ৯০ পার্সেন্ট মানুষের ইসলামী ব্যাংকিং-এ আপত্তি নেই। আপনি শুনে অবাক হবেন যে, আমাদের প্রথম শাখার প্রথম গ্রাহক ছিলেন একজন অমুসলিম। কাকতালীয়ভাবে এ ঘটনা ঘটে গেলেও এদেশের অনেক

www.pathagar.com

অমুসলিম আছেন যারা ইসলামী ব্যাংকিং চান। তারা নির্ভেজাল ব্যাংকিং চান। আমি বলব, শতকরা ৯০ ভাগ লোক যে ব্যাংকিং চায় প্রত্যেক ব্যাংকেরই সে ধারায় ফিরে আসা উচিত। সমস্যা জনগণ নয় বরং ব্যাংকাররাই এমন ব্যাংকিং চান না। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে আগে জনমনে এক ধরনের সন্দেহ ছিল যে, ইসলামী ব্যাংকিং সম্ভব কি না। ইসলামী ব্যাংক দাঁড়িয়ে যাবার পর এখন জনগণ বুঝছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং ভালোভাবেই সম্ভব। এ পদ্ধতি সাধারণ ব্যাংকিং পদ্ধতির চাইতে অবশ্যই উত্তম। যারা উত্তম মনে করবেন না তাদের কাছে অন্তত সমান। তবে ইসলামী ব্যাংক যদি ব্যর্থ হতো তবে এর পরিণতি হতো খুবই খারাপ। তখন লোকের মুড অন্যরকম হতো। ইসলামী ব্যাংক সফল হবার কারণে জনগণ ইসলামী অর্থনীতির উপর, ইসলামী ব্যাংকের উপর এবং ইসলামী পদ্ধতির উপর আস্থাশীল হয়েছে।

প্রশ্ন : কিন্তু কেউ কেউ এমনও বলেন যে, সাধারণ ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে নাম ছাড়া অন্য কোনো তফাত নেই।

উত্তর : বিষয়টিকে যারা হালকাভাবে দেখেন কেবল তারাই এমন মন্তব্য করতে পারেন। বিষয়টিকে বেশ গভীরভাবে দেখা উচিত। ইসলামী ব্যাংকিং এর মূল জিনিস যদি খুঁজি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে, কতিপয় মৌলিক পার্থক্য এর মধ্যে রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মূল যে সিস্টেম মুদারাবা-মুশারাকা, এটি সব দিক থেকে জাস্টিফাইড। মুদরাবাতে বলে যে, একজনের পুঁজি আরেকজনের শ্রম দুটো একত্রিত হবে এবং তারা লাভ-লোকসান ভাগ করে নেবে। এর চাইতে উত্তম সিস্টেম আর কি হতে পারে? এর তুলনায় আমি কাউকে টাকা দিলাম তার লাভ বা লোকসান যাই হোক আমি নির্দিষ্ট লাভ নিয়ে নেব। আর বেশি লাভ হলেও আমি ওটিই নেব এবং লোকসান হলেও তাই নেব - এটি কোনো অংশেই উত্তম হতে পারে না। সাধারণ ব্যাংক বলছে, আমি তোমাকে একলাখ টাকা দিলাম। তুমি নির্দিষ্ট সময় পরে আমাকে একলাখ দশ-বিশ হাজার টাকা দেবে। লাভ-লোকসান বুঝি না। এটি কোনোভাবেই জাস্টিফাইড হতে পারে না।

ইসলামের অপর যে সিস্টেম মুশারাকা তাও লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে। আমার এক লাখ টাকা আর আপনার এক লাখ টাকা একত্রিত করে আমরা একটি ব্যবসা করবো। ফলাফল যাই দাঁড়ায়, লাভ হলেও দু'জনে ভাগ করে নেব, লোকসান হলেও ভাগ করে নেব। যদি এ ব্যবসার আউটকাম কিছুই না হয় তবুও আপনি ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা নেবেন আর আমি পুঁজি হারিয়ে ৯০ হাজার টাকা নিয়ে বাড়ি যাব এটি কোনোভাবেই উত্তম পদ্ধতি হতে পারে না। আমি সেন্ট্রাল ব্যাংকে থেকে দেখেছি যে, ছোট ব্যবসা শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ ফেল করে যায়। সব ব্যবসায় সাফল্য আসে না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি, আমার জীবনে চারবার ব্যবসা করেছি। অবশ্য ক্ষুদ্র ব্যবসা। চারবারই ব্যর্থ হয়েছি, লোকসান দিয়েছি। এতেই বোঝা যায়, ছোট ব্যবসা কতটা ফেল করে। এ রকম ঝুঁকির মধ্যে সুদী ব্যবসা কীভাবে জাস্টিফাইড হতে পারে? ইসলাম বলে, 'লা তাজলিমুনা ওয়া লা তুজলামুন', অর্থাৎ তোমরা জুলুম করবেও না এবং জুলুমকে মেনেও নেবে না। আল্লাহ সুদ নিষিদ্ধ করার পরপরই এ কথা বলেছেন। আমরা এ মুদারাবা-মুশারাকা পরিপূর্ণভাবে চালু করতে পারছি না এটিও আসল ইসলামী বিধান নয়। আমরা সে পর্যায়ে যেতে পারছি না। আমরা একজনকে কাঁচামাল কিনে দিলাম। তিনি সে টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করবেন। এটি বাই মুয়াজ্জেলার মাধ্যমে হয়। অথবা আমরা কাউকে গাড়ি কিনে দিলাম। গাড়িটি ভাড়ায় খাটলো। তিনি ভাড়ার টাকায় কিস্তি পরিশোধ করবেন। এটিকে আমরা বাই মুয়াজ্জাল বলি।

www.pathagar.com

আমরা একটি বাস কিনে দিলাম ৫০ লাখ টাকা দিয়ে এবং বললাম যে তুমি আমাকে ৬০ লাখ টাকা দেবে। আমরা যেখানেই ইনভেস্ট করি না কেন তাতে পণ্য থাকে। সুতরাং সুদ থাকছে না। থাকছে পণ্যের বেচাকেনা। এটি পণ্যের বেচাকেনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

কিন্তু এ পদ্ধতিতে কমটা কি তা বলছি। ঐ ব্যবসায় আপনি টোটাল লাভ-লোকসানের অংশীদার হচ্ছেন। কিন্তু এখানে একটি ট্রানজিকশনেই আপনি লাভ করে নিচ্ছেন। কারণ টোটাল বিজনেস-এ কাস্টমারের লাভ নাও হতে পারে। শ্রমের দাম দিয়ে, অন্যান্য খরচ দিয়ে তার লোকসানও হতে পারে। অথচ আংশিক ব্যবসায় আমি লাভ করে নিলাম। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ডেফিনেটলি এটি বৈধ অপারেশন। কারণ সে পণ্য পাচ্ছে। তবে আমরা চেষ্টা করছি ইসলামী অর্থনীতির মূল ধারায় যেতে। এখন মধ্যবর্তী সিস্টেমে আছি। আমরা সাধারণ সুদী ব্যবসা থেকে ইসলামের সুদবিহীন ব্যবসার দিকে অনেক দূর এগিয়েছি। তবে ইসলামের সুফল পেতে হলে আমাদেরকে ঐ সিস্টেমেই যেতে হবে। তার জন্য কতিপয় শর্ত থাকে। রাষ্ট্র ইসলামী হওয়া উচিত, আইন ইসলামী হওয়া উচিত।

রাজনৈতিক সরকার ইসলামিক হওয়া উচিত। সেগুলো তো একটু দিল্লী দূরত্বের মতো। এজন্য আরো সময় লাগবে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন যে, ছোট ব্যবসার ক্ষেত্রে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ মার খায়। অথচ ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখছি কেবল সাফল্যই।

উত্তর : আমাদের সিস্টেমের মধ্যে যে অবস্থাটা আছে, আমরা যেসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসা করি তাদেরকে আমরা দোকান থেকে মাল কিনে দেই। আমরা একজন কৃষককে একটি গরু কিনে দিলাম কিংবা একটি পাওয়ার টিলার কিনে দিলাম। তার বিপরীতে ৫০/৬০ হাজার টাকা কিস্তিতে নিলাম। মেশিনটি যদি সামান্য ডিস্টার্বও করে তবু একেবারে ক্ষতি হয় না। কিন্তু অন্য ব্যাংকগুলোয় দেখা যাচ্ছে টাকা দিয়ে দিচ্ছে। ঐ লোকটা ঐ টাকা কোন কাজে ব্যবহার করল তা তদারকী করা হয় না। দেখা গেল সে ঐ টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। তাতে করে টাকা পরিশোধ করা কঠিন হয়ে যায়।

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংক প্রায় দুই দশক ধরে কাজ করছে। এ সময়ে আপনাদেরকে কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে?

উত্তর : আমরা এক দীর্ঘ দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। কারণ, আমাদের সামনে কোনো মডেল ছিল না। আমাদের আগে দু-একটি দেশে প্রাথমিক অবস্থায় মাত্র কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক থাকলেও তাদের অবস্থা অতটা উন্নত ছিল না। আমাদের দেশ থেকে মাত্র কয়েকজন লোক গিয়ে তাদের ব্যাংকিং সিস্টেম দেখে এসেছেন। আমাদেরকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুতে হয়েছে। একেবারে নতুনভাবে এসে আমাদেরকে আধুনিক ব্যাংকিং-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে। পরিভাষাগত সমস্যায়ও ভুগছিলাম আমরা। সুতরাং আমি বলবো যে, নতুন এ ব্যাংকিং ধারায় সাফল্য খুবই কঠিন বিষয় ছিল। তবে আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা একটি মডেল বিল্ড-আপ করেছি। আমরা যে সফল মডেল করেছি তা যে কেউ অনুসরণ করতে পারবে। পরে যারাই ইসলামী ব্যাংক করেছে তাদের সামনে একটি মডেল ছিল। কেউ ইসলামী ব্যাংক বা ইসলামী শাখা করতে চাইলেই আমাদের কাছে চলে আসছেন পরামর্শের জন্য।

দ্বিতীয়ত, আমরা জনগণকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, এটি একটি রিয়েল ব্যাংকিং সিস্টেম। আমাদের বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচার হয়েছে যে, ঘুরিয়ে খাওয়া হচ্ছে। যে কথা আপনিও

www.pathagar.com

বললেন। কেউ বুঝে বিরোধিতা করেছেন কেউ না বুঝে করেছেন। অনেকে নিজেরা ইসলামের ধার ধারে না। কিন্তু আমরা ইসলাম মানছি কি না সে ব্যাপারে তাদের মাথাব্যথা। তারা ইসলামের অনেক বিধিবিধান মেনে নাও চলতে পারেন। কিন্তু আমাদের ইসলাম পুরোপুরি মানতে হবে। তবে এখন আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, জনগণ বুঝতে পেরেছেন। একথা আমি এজন্যে বলবো যে, যে কোনো পত্রিকার চিঠিপত্রের পাতা উল্টালে আপনি দেখবেন সাধারণ ব্যাংকের নির্দিষ্ট করে শাখা চেয়ে ক'টি চিঠি আসে আর ইসলামী ব্যাংকের শাখা চেয়ে কয়টি আসে। আমাদের কাছেই প্রায় এক হাজার চিঠি এসেছে শাখা খোলার জন্য।

তৃতীয়ত, যে কাজটি খুব কঠিন ছিল তা হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কনভিন্স করা। এটি খুব দুরূহ কাজ ছিল। ছোটখাট সমস্যা সব ব্যাংকেরই থাকে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক একমাত্র ব্যাংক যেখানে তেমন কোনো সমস্যা নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সকল গভর্নর শেষ পর্যন্ত একমত হয়েছেন যে, ইসলামী ব্যাংক খুবই ভালো ব্যাংক। আমি তাদের মানসিকতা দেখেছি। তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমরা কতিপয় আইন সংশোধনের জন্য প্রস্তাব দিয়েছি। আমি দেখেছি, আমাদের প্রতি সকলের দৃষ্টিভঙ্গি এখন ইতিবাচক। বড় বড় ব্যাংকের মালিকরা এখন আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করছেন। এক সময় ধারণা করা হতো ইসলাম সুদ হারাম করেছে। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাংকিং সম্ভব নয়। সুতরাং অর্থনীতি হবে না, ইসলামও হবে না। এসব কথা গত পাঁচ বছরে আমাকে কেউ আর বলেনি। বড় জোর কেউ জানতে চেয়েছে আমরা কীভাবে এটি করি। আমাদের অনেক দুর্বলতা আছে। আরো অনেক দূর যেতে হবে আমাদেরকে। কিন্তু আমরা অনেক পথ পাড়ি দিয়েছি। এজন্যে আমরা আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করি।

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংকের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলুন?

উত্তর : এ ব্যাপারে আমি শুধু এটুকু বলবো যে, আমাদের বর্তমান অবস্থান প্রথম স্থান বা প্রথম স্থানের কাছাকাছি। এটি আমরা ধরে রাখতে চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আমরা সেবার মান উন্নত করতে চেষ্টা করবো। আমরা আধুনিক যন্ত্রায়ণের চেষ্টা করবো। ইসলামের নীতি পুরোপুরি অনুসরণ করার চেষ্টা করবো। আমরা ইসলাম নিয়ে খেলতে চাই না। ইসলামের ব্যাপারে আরো সিরিয়াস হতে চেষ্টা করবো। আমরা শাখা সম্প্রসারণ করবো তবে সীমার বাইরে যেতে পারব না। সবশেষে আপনাদের মাধ্যমে আমি বলতে চাই, সকল সাধারণ ব্যাংকের উচিত ধীরে ধীরে ইসলামী ব্যাংকিং-এ ফিরে আসা। পুরোপুরি না পারলে একটি-দু'টি করে শাখাকে ইসলামী শাখায় রূপান্তরিত করা এবং চূড়ান্তভাবে ইসলামের কল্যাণকর অর্থনৈতিক ধারায় ফিরে আসা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : জিয়াউল হক মিজান
প্রকাশকাল : ৬ এপ্রিল ২০০৩, সাপ্তাহিক রোববার

www.pathagar.com

জাতিসংঘকে নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা হচ্ছে আমেরিকার কৌশল

প্রশ্ন : ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন হামলার বিষয়টি আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

উত্তর : এটি খুব স্পষ্ট যে, ইরাক যুদ্ধের পেছনে জাতিসংঘের কোনো অনুমোদন ছিল না। যদিও আমেরিকা জাতিসংঘের ১৪৪১ নম্বর প্রস্তাবের কথা বলে দাবি করেছে যে, ইরাককে নিরস্ত্র করতে সেখানে হামলা চালানোর অধিকার তাদের জন্মেছে কিন্তু বিশ্বের আইনজ্ঞ সমাজ তা মনে করে না, বিশ্ব জনমত এটি মানে না। বিশ্বের সাংবাদিক মহলেরও অন্তত নিরানব্বই শতাংশ মনে করে না যে, ইরাকে মার্কিন হামলার পেছনে কোনো রকম আইনগত যুক্তি বা লিগ্যাল কভারেজ ছিল। সুতরাং এটি একটি অন্যায়, অবৈধ যুদ্ধ, যার বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বের জনমত প্রবলভাবে সোচ্চার।

প্রশ্ন : আমেরিকা আগে বলেছে ইরাককে নিরস্ত্র করার কথা। কিন্তু পরে তারা বলা শুরু করে যে, সাদ্দাম হোসেনের স্বৈরশাসন থেকে ইরাকের জনগণকে 'মুক্ত' করার জন্য তারা ইরাকে এসেছে। সাদ্দামের হাত থেকে ইরাকের জনগণকে মুক্ত করার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্র কোথায় পেয়েছে?

উত্তর : হ্যাঁ, জাতিসংঘের প্রস্তাবে যে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের কথা বলা হয়েছে, আমেরিকা ইরাকে হামলা করেছে সেই কারণে নয়। তারা সেখানে গেছে ইরাকের সরকার পরিবর্তন করতে। দুঃখের বিষয়, জাতিসংঘের প্রস্তাবে যা ছিল না সেটির জন্য আমেরিকা ইরাকে হামলা করেছে। আমেরিকা আফগানিস্তানে সরকার পরিবর্তন করেছে। তারা অবৈধভাবে এটি করেছে। অন্য একটি স্বাধীন দেশের সরকারকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উৎখাত করে সেখানে নতুন সরকার বসানোর প্রথম নজির আফগানিস্তান। তালেবান সরকার ভালো কি খারাপ আমরা জানি না, কিন্তু ওই সরকারটি আফগানিস্তানে ডি ফ্যাক্টো (de facto) সরকার ছিল। কোনো দেশের ডি ফ্যাক্টো সরকার ওই দেশের প্রতিনিধিত্বকারী সরকার হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়, এটি একটি সাধারণ রীতি। সেই ডি ফ্যাক্টো সরকারকে আমেরিকা জোর করে সরিয়ে দিল শুধু এ অজুহাতে, তালেবান সরকার ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় দিয়েছে। ওসামা বিন লাদেন ভালো কি মন্দ তা আমি জানি না, তার বিরুদ্ধে কোথাও কোনো অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে কি না তাও জানি না, তার বিরুদ্ধে কোনো ওয়ারেন্টও জারি হয়নি। কিন্তু সে ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে বলে তালেবান সরকারকে উৎখাত করা হলো। এবার তারা জাতিসংঘের ১৪৪১ প্রস্তাবের প্রসঙ্গকে ছাড়িয়ে গিয়ে ইরাকেও একইভাবে শক্তি প্রয়োগ করে সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা করছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : তা হলে কি জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক আইন-কানুন, রীতি-নীতি সবকিছু অকার্যকর হয়ে গেল?

উত্তর : আমি যদি আমার মনের কথা বলি, জাতিসংঘ মরে গেছে। জাতিসংঘ নেই। কারণ এটি সবাই দেখতে পাচ্ছে - জাতিসংঘ তখনই ভালো, যখন সে আমেরিকার ইচ্ছে-অনিচ্ছাকে অনুমোদন করে। জাতিসংঘের প্রস্তাবগুলোর তাৎপর্যও আমরা জানি। জাতিসংঘকে প্রস্তাব পাস করতে বাধ্য করা হয়। এটি আমরা দেখেছি - যুক্তরাষ্ট্র চাপ দিয়ে হোক, আইনের মাধ্যমে হোক, অন্যান্য প্রভাব খাটিয়ে হোক, যেভাবেই হোক নিজেদের স্বার্থে জাতিসংঘকে দিয়ে প্রস্তাব পাস করিয়ে ফেলে। যেখানে প্রস্তাব পাস করাতে পারে না, সেখানে ভেটো দেয়। অথবা এমনভাবে শব্দ চয়ন করে, যার দ্ব্যর্থক ব্যাখ্যা হতে পারে এবং সেটির সুযোগ তারা নিতে পারে। যেমন একটি উদাহরণ এ মুহূর্তে মনে পড়ছে। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরে যুক্তরাষ্ট্রের চাপে জাতিসংঘের যে প্রস্তাব পাস হয় তাতে বলা হয়েছিল, ইসরায়েলকে 'সেইফ অ্যান্ড সিকিউরড্ বর্ডারের' মধ্যে, অর্থাৎ নিরাপদ ও সুরক্ষিত সীমান্তের মধ্যে থাকতে হবে। এখন সেইফ অ্যান্ড সিকিউরড্ বর্ডারের ব্যাখ্যা কী, সেটি তো আর সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না। ফলে ইসরাইল সমস্যার সমাধান হলো না। এ হচ্ছে জাতিসংঘকে নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করার আমেরিকান কৌশল। তাই আমি বলি এ জাতিসংঘ মরে গেছে।

প্রশ্ন : তা হলে এখন আমরা কী করতে পারি? আন্তর্জাতিক বিবাদ-সমস্যাগুলো নিরসনে সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য একটি ব্যবস্থা ছাড়া কি চলতে পারে?

উত্তর : এ ব্যাপারে সবাই মিলে চিন্তা করতে হবে, কী করা যায়। তবে আমার নিজের একটি ভাবনা হলো, জোট নিরপেক্ষ দেশগুলো মিলে আরেকটি জাতিসংঘ গঠন করা উচিত। সে জাতিসংঘ হবে ভেটো-ক্ষমতামুক্ত এবং সেখানে সবচেয়ে কঠিন বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিতে পাঁচ ভাগের চার ভাগ সদস্যের ঐকমত্যের প্রয়োজন হবে। যেমন ধরুন, যুদ্ধ করবো কি করবো না - এ ব্যাপারে প্রস্তাব পাস করতে হলে ওই সংখ্যক সদস্য রাষ্ট্রের ভোট প্রয়োজন হবে এবং কোনো সদস্যের ভেটো দেয়ার ক্ষমতা থাকবে না। এটি একটি প্রাথমিক ভাবনা। কারণ এ জাতিসংঘ থেকে আমাদের লাভ কী?

প্রশ্ন : এরকম ভাবনা কতটা বাস্তবসম্মত? জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর মিলিত শক্তি-প্রভাব কতটুকু যে তারা একটি নতুন জাতিসংঘ তৈরি করলেই আমেরিকা বা সেরকম কোনো কোনো প্রবল রাষ্ট্রের গুণ্ডামি বন্ধ করতে পারবে?

উত্তর : একটি নতুন জাতিসংঘ গঠনের প্রস্তাব করছি আমি। জি, আমি প্রস্তাব করছি। কেন করছি? এ জাতিসংঘে আমরা থাকতে পারি, আবার সেখানে বসে আলোচনা করতে পারি, কিন্তু আবার সে একই কথা হবে। আপনি যদি মাননীয় বুশ সাহেবকে মেনে নেন তা হলেই সব ঠিক। এ জাতিসংঘ আমেরিকার ইচ্ছার বাইরে কিছুই করতে পারে না। আপনি এটি লিখবেন, ইউএনও এখন আর ইউনাইটেড নেশন্স নয়। এটি এখন আমেরিকার তল্পিবাহক, তাই একে ইউনাইটেড স্টেট্স ওরগানাইজেশন বা ইউএসও বলা যায়। এর থেকে বিশ্বমানবতা বেরিয়ে আসতে পারে। দুটো কাজ হতে পারে। একটি হচ্ছে, এ জাতিসংঘকে পুনর্গঠন করে এটিকে ভেটো মুক্ত করতে হবে। আর যে রাষ্ট্র জাতিসংঘের প্রস্তাব লঙ্ঘন করে কোনো কাজ করবে, তাকে বহিষ্কার করে এক ঘরে করার বিধান করতে হবে। এ জাতিসংঘকে যদি সেভাবে পুনর্গঠন করতে হয়, একে যদি বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের স্বার্থ দেখার মতো একটি ন্যায়ানুগ বিশ্ব প্রতিষ্ঠান করতে হয়, তা হলে এখন আমেরিকাকে বহিষ্কার করতে হয়। কিন্তু সেটি তো আমরা পারব না। তাই আমরা আপাতত বলব, আমেরিকা

www.pathagar.com

জাতিসংঘকে ধ্বংস করেছে, তাই ন্যামের মাধ্যমে বা আরব লীগ, ওআইসির সহায়তায় একটি নতুন জাতিসংঘ গঠন করা হোক। এটি খুব কঠিন কথা, এটি দুঃখের কথা। কিন্তু আমি এ কথা না বলে পারছি না।

প্রশ্ন : ইরাকে যুদ্ধ তো প্রায় শেষের পথে। এখন কী হবে?

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে, জাতিসংঘ, বিশ্বজনমত ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে যুদ্ধ শুরু করেছে, কিন্তু তার আগে তারা একটি অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা পর্যন্ত করল না যে কারা ইরাক টেক-ওভার করবে। আমার মনে হয় না, আমেরিকান জেনারেলদের ইরাক শাসন করার কোনো অধিকার আছে। যদি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়, তা হলে সবার আগে অধিকার আছে আরব লীগের। আরব লীগের মহাসচিব হবেন ইরাকের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধানের দায়িত্ব গ্রণের জন্য সবচেয়ে যথার্থ ব্যক্তি। তা সম্ভব না হলে আমার মতে, ওআইসির মহাসচিব। আর তা-ও যদি না হয়, জাতিসংঘের মহাসচিব তার প্রতিনিধিদের দিয়ে সাময়িকভাবে ইরাকের প্রশাসন চালাবেন, তিন মাস বা ছয় মাস বা এক বছর। তখন তিনি ইরাকের যেসব রাজনৈতিক পক্ষ আছে তাদের পরামর্শ নেবেন, নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করবেন। আর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে অবিলম্বে ইরাক থেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং সেখানে বিভিন্ন আরব বাহিনী মোতায়েন করা দরকার। মিসর, সুদান, আলজিরিয়া এমনকি সৌদি আরবের সেনাবাহিনী সেখানে অংশ নিতে পারে।

প্রশ্ন : আমেরিকার ইরাক আক্রমণ এবং দখল করার ঘটনা থেকে বোধহয় এটি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আমেরিকা যা চাইবে তাই করতে পারবে। এখন আমাদের মতো দেশগুলো কি করতে পারে?

উত্তর : এর মোকাবিলা সহজ নয়। এটি মানতে হবে আমাদেরকে। আমি মনে করি, ছোট রাষ্ট্রগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তি অর্জন করতে হবে, নিজেদের অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে হবে। সেটি করার জন্য বিদেশী সাহায্যের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বিদেশী সাহায্যের জাল হচ্ছে দাস বানানোর জাল। এটি তারা ব্রিটন উডস ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে খাড়া করেছে গত ৫০ বছর ধরে। এ জাল থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

প্রশ্ন : কিন্তু এটি তো সহজ নয়।

উত্তর : বাংলাদেশ এখন সত্যিকার অর্থে বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল মাত্র ১০ শতাংশ। চাইলে আমরা আগামী ১০ বছরে বিদেশী সাহায্য থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারি। আমরা যদি সিদ্ধান্ত নিই, আমরা সেটি করতে পারব। সেজন্য আমাদের সিভিল সার্ভিস, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামরিক নেতৃবৃন্দকে ত্যাগী হতে হবে। আমার নিজের ছেলে স্কলারশিপ পেল কি না, আমার কনসালটেন্সি হলো কি না, ফরেন ট্রেনিং পেলাম কি না, একটু ফরেন মানি পাওয়া গেল কি না - এগুলো ভুলতে হবে।

প্রশ্ন : কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন বা স্বনির্ভর হলেই কি ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর আগ্রাসন থেকে নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে?

উত্তর : স্বল্প মেয়াদে এর কোনো সমাধান নেই। আমাদের দীর্ঘ মেয়াদে চিন্তাভাবনা করতে হবে। সেখানে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা একটি প্রাথমিক পূর্বশর্ত। তারপর শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। কারণ আপনি জাতিসংঘের ওপর নির্ভর করতে পারেন না। কোনো

www.pathagar.com

ছোট রাষ্ট্র জাতিসংঘের পেছনে দাঁড়াতেই পারবে না। এই যে আজকে ইরাকের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ হচ্ছে, একটি রাষ্ট্রও তাকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না, আপনি কল্পনা করতে পারেন? ফলে, আমার মনে হচ্ছে, ছোট রাষ্ট্রগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে হবে, আর তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে যে আমেরিকান পণ্য বয়কটের একটি কথাবার্তা শুরু হয়েছে, এটিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

উত্তর : আমি সাবধানে বলব, আমেরিকার অন্যায় ও বর্বর আচরণের বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা প্রকাশের আর কী রাস্তা আছে? এটি তো স্বাভাবিক। মানুষ তার অন্তরের ঘৃণা কীভাবে প্রকাশ করবে? ফলে, আমেরিকান পণ্য বর্জনের আন্দোলন জনগনের অসন্তোষ বা ঘৃণা প্রকাশের একটি পদ্ধতি। একে আমি সঠিক বলে মনে করি।

প্রশ্ন : কিন্তু তাতে যদি আমেরিকা ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর আঘাত হানে?

উত্তর : আপনি আমেরিকান পণ্য বর্জন করুন আর না করুন, আমেরিকা আমাদের আঘাত করবেই। সেটি তারা স্থির করে ফেলেছে। বাংলাদেশের মানুষ, মুসলমান-অমুসলমান, তথাকথিত বাম এবং তথাকথিত ডান রাজনৈতিক শক্তিগুলোসহ আপামর জনসাধারণ আমেরিকার বিরুদ্ধে যেভাবে ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছে, তারপর আমাদের নাম কোন শিবিরে তারা লিখে ফেলেছে তা আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি। তাই আমেরিকা আমাদের আঘাত করবেই, এটিকে ভয় করলে চলবে না।

প্রশ্ন : আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের ৭০ শতাংশের বাজার আমেরিকা, এবং রফতানি আয়ের সিংহভাগ আসে আমেরিকা থেকেই। গার্মেন্টস শিল্পের ওপর আঘাত এলে লাখ লাখ মানুষ বেকার হয়ে যাবে...

উত্তর : হ্যাঁ, আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের ওপর আঘাত আসবে। সেজন্য আমাদের রফতানি বাজার বহুমুখী করার ব্যাপারে গুরুত্বের সাথে চিন্তাভাবনা করতে হবে। আমাদের আমেরিকার বাজারের ওপর নির্ভর করলে চলবে না।

প্রশ্ন : কোথায় আমরা বাজার খুঁজে পেতে পারি?

উত্তর : ইউরোপের মন বদলেছে। আমেরিকার সঙ্গে তাদের বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এখন বাজারের সন্ধানে ইউরোপমুখী হতে পারি। ইউরোপ আমাদের সাদরে গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন : উন্নয়ন সাহায্য বা ঋণ?

উত্তর : দেখুন, আমাদের বাজেট প্রায় ৮ মিলিয়ন ডলার। তার মধ্যে মাত্র ১ বিলিয়ন আসে আমেরিকা থেকে, মানে প্রায় ১৫ শতাংশ। এই ১৫ শতাংশের অন্তত ১০ শতাংশ আমরা পেতে পারি জাপান থেকে, আমরা যদি তাদের সঙ্গে ভালো করে আলাপ করতে পারি। তা ছাড়া আমরা সৌদি আরবের কাছেও যেতে পারি। আমরা তো কখনো সৌদি আরবের কাছে ভালো করে অ্যাপ্রোচও করিনি। এখন আমরা ফ্রান্স ও জার্মানির সঙ্গেও এসব ব্যাপারে দ্বিপক্ষীয়ভাবে অগ্রসর হতে পারি। ওদিকে দক্ষিণ কোরিয়াও আছে।

প্রশ্ন : কিন্তু এ যুদ্ধের যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিকভাবেই আমাদের ওপর পড়বে, সেটি মোকাবিলার জন্য কী করা যায়?

উত্তর : আমাদের তৈরি হতে হবে যে, আমাদের অর্থনীতির ওপর আঘাত আসবে। আমরা যদি দেশকে ভালোবাসি, নিজেদের সত্যিকারের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, মর্যাদাশীল জাতি হই, তা হলে বিলাসিতা ত্যাগ করতে হবে। আমাদের একটু কষ্ট করতে রাজি হতে হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : রাজনৈতিক বা আদর্শিক ক্ষেত্রে ইরাক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াগুলো কেমন হবে?

উত্তর : মুসলিম বিশ্ব আরো সংহত হবে। মুসলিম জনগণের একদম তৃণমূল পর্যায়ে আমেরিকা-বিরোধী মনোভাব চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে।

প্রশ্ন : এর রাজনৈতিক প্রতিফলন কী হবে?

উত্তর : আমার মনে হয় মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কগণ মুখে বলুক বা না বলুক, অন্তরে বুঝেছেন যে, আমরা আর আমেরিকার ওপরে নির্ভর করতে পারি না। মুসলিম বিশ্বের আরো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটি পরিস্থিতি ভেতর থেকে সৃষ্টি হয়েছে। মানসিক যে ঐক্যটা এসেছে তার একটি বাহ্যিক ফলাফল দেখতে পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন : দেশে দেশে ইসলামী রাজনৈতিক আদর্শের জাগরণ সৃষ্টি হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, সেটি হবে।

প্রশ্ন : সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বাড়বে না? একশ লাদেন জন্ম নেবে বলে তো শোনা যাচ্ছে?

উত্তর : যদিও বলা হয়েছে যে ইরাকে হামলার পর ১০০ ওসামা বিন লাদেন তৈরি হবে, আমার কেন জানি মনে হয়, এটি না-ও হতে পারে। কারণ মুসলিম বিশ্ব বাস্তববাদী হচ্ছে। তারা ইসলাম চায়, কিন্তু চরমপন্থা চাচ্ছে না। কারণ উগ্র চরমপন্থা ইসলামের জন্য ক্ষতিকর। আমার জানামতে ইসলামে কিন্তু সন্ত্রাসবাদের স্থান নেইও। আমার মনে হয় না যে, তারা এসব পথ ধরবে।

প্রশ্ন : কিন্তু আত্মঘাতী বোমা হামলা চলছে এবং জিহাদের কথা আরো জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে।

উত্তর : কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা যে ঘটবে না তা বলা যাবে না। ঘটতেই পারে, এটি স্বাভাবিক, কারণ বহু লোকের মনেই বিক্ষোভ আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, বাংলাদেশে যারা চিন্তাশীল মুসলমান, তারা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে ব্যাপারগুলো ভাবছেন। তারা মনে করছেন, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বড় হতে হবে, আমাদের শক্তি অর্জন করতে হবে, শিক্ষাদীক্ষায় বড় হতে হবে। না হলে তো আমরা এ শক্তির মোকাবিলা করতে পারব না। এ একই উপলব্ধি সারা মুসলিম বিশ্বেই হচ্ছে। তাই আমি মনে করি না যে, সামনের দিনগুলোতে সন্ত্রাসবাদ বাড়বে, যদিও বাড়ার কথা ছিল। কিন্তু তালেবানের কারণেই হোক বা আমেরিকার ঘটনার কারণেই হোক একটি উপলব্ধি হয়তো এসেছে যে, সন্ত্রাসবাদের ফল ভালো হয়নি। আমার মনে হয় না যে, সন্ত্রাসবাদের উত্থান ঘটবে। বরং ইসলামী চেতনা বা ইসলামী মানসের উত্থান ঘটবে এবং তারা রাজনৈতিকভাবে আমেরিকার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে। এটি প্রধানত যাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, মুসলিম মানস এখন স্বাধীন-স্বনির্ভর হতে চাইবে। আগে যেমন তারা ভাবতো যে আমেরিকা তো আমাদের বন্ধু, সে আমাদের দেখবে - এ ভাবনা আর থাকবে না, চলে যাবে। আমার মনে হয় এটি একটি ইতিবাচক বাঁক পরিবর্তন। এটিই হবে সবচেয়ে বড় পাওয়া।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মশিউল আলম
প্রকাশকাল : ১৩ এপ্রিল ২০০৩, প্রথম আলো

www.pathagar.com

জিহাদ ও সন্ত্রাস এক নয় গণতন্ত্রই সঠিক পথ

প্রশ্ন : বাংলাদেশে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলন এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
উত্তর : প্রাথমিক পর্যায়ে আছে বলেই আমার মনে হয়। অনেক কাজ বাকি।

প্রশ্ন : ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য বিলম্বিত হবার কারণ কি? এক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলো কি কি?
উত্তর : আমাদের যোগ্যতার অভাবই মূল কারণ। আমাদের সকল পর্যায়ে যোগ্যতা অর্থাৎ শিক্ষা, জ্ঞান, Skill ও dedication বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রশ্ন : চলমান জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং বিরাজমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় ইসলামের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণের পদ্ধতি কি?
উত্তর : আইনসম্মত, শাসনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পথেই এগুতে হবে।

প্রশ্ন : আপনার কাছে বর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের সঠিক প্রক্রিয়া কোনটি বলে মনে হয়? কেন?
উত্তর : ইসলামের সঠিক জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে হবে। এর দ্বারা যোগ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজন বাড়বে। এসব ক্ষেত্রে বর্তমানে আমাদের অভাব রয়েছে।

প্রশ্ন : দেশে বিদ্যমান পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র বা সামরিক-অসামরিক শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান ইসলামী দলগুলোর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা কীভাবে আসবে বলে মনে করেন? কেন?
উত্তর : জনগণ যেহেতু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং যেহেতু জনগণ ইসলামের পক্ষে, তাই আজ হোক কাল হোক জনগণের সমর্থনেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে।

প্রশ্ন : বর্তমান অবস্থায় কি ইসলামী দলগুলো সেক্যুলার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সহযোগী হবে, না ইসলামী শক্তির ঐক্য গড়ে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করবে? নাকি ময়দানে টিকে থাকার জন্য চলমান সুবিধাবাদী রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করবে?
উত্তর : দেশের ইসলামী দলগুলোকে প্রয়োজনে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহায়তা নিয়েই এগুতে হবে। এটিই বাস্তব অবস্থার দাবি।

প্রশ্ন : ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা দেশীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে নিয়মতান্ত্রিক ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা কীভাবে সম্ভব?
উত্তর : সময় লাগলেও গণতন্ত্রই পথ। অন্য কোনো পথ সঠিক নয়। ১৯৪৮ সনেই সে সময়কার আলেমগণ democracy as enunciated by Islam-কে গ্রহণযোগ্য বলে মতামত দিয়েছেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : অনেক দেশে ইসলামপন্থীরা নির্বাচনে জয়লাভ করেও ক্ষমতায় আসতে পারেনি। এর কারণ ও প্রতিকার কি?

উত্তর : এটি অন্যদের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। যেমন বার্মাতে বা আরো অনেক দেশে হয়েছে। চূড়ান্ত বিচারে নির্বাচনে বিজয়কে সাময়িকভাবে আটকে রাখতে পারলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সম্ভব হবে না।

প্রশ্ন : ইসলামী দল ও পীর-মাশায়েখগণ একই আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও সুন্নাহকে অনুসরণ করে অভিন্ন লক্ষ্যে পৌছার জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও তারা একই মঞ্চ থেকে জনগণের কাছে একই আহ্বান ও একই কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারছে না কেন? ঐক্য বা সমঝোতার পথে বাধা কোথায়?

উত্তর : ঐক্য জোর করে আদায় করা যায় না। তবে তাদের ছোট ছোট ফিকাহ্ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কোন্দল করা উচিত নয়। তাদের এসব ক্ষুদ্র কোন্দল বাদ দিতে হবে। মূল বিষয়সমূহে ঐক্য থাকলে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা করা উচিত।

প্রশ্ন : আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসা এবং সময়ের দাবি পূরণের জন্য ইসলামী তাত্ত্বিকদের ইজতেহাদের দ্বার উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন আছে কি? থাকলে এজন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন করা জরুরী বলে কি আপনি মনে করেন?

উত্তর : সকল বড় আলেমই এখন ইজতিহাদ করছেন। দরজা খোলার কোনো প্রশ্ন নেই। বিভিন্ন দেশে ফিকাহ কাউন্সিল এবং ওআইসি ফিকাহ একাডেমীও এ ক্ষেত্রে কাজ করছে।

প্রশ্ন : জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলমানরা আজ প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার আক্রমণের শিকার। মিডিয়ার বৈরিতা থেকে আত্মরক্ষা এবং ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে মুসলমানদের কি ভূমিকা নেয়া উচিত?

উত্তর ঃ আমাদের শক্তিশালী মিডিয়া গড়ে তুলতে হবে। মুসলিম ব্যবসায়ীদের এ ব্যাপারে সহযোগিতা করা উচিত। অবশ্য বিভিন্ন দেশে এ ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন : দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব মুসলমান একান্ত বাধ্য হয়ে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে সশস্ত্র জিহাদের পথ অনুসরণ করেছে, তাদের 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত করে নির্মূল অভিযান চালানো হচ্ছে। এ থেকে এসব মুসলমানদের নিস্কৃতির উপায় কি?

উত্তর : জিহাদ ও সন্ত্রাস এক নয়। আমাদেরকে জিহাদ কাকে বলে ভালো করে জানতে হবে। সন্ত্রাস পরিহার করতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : পালাবদল প্রতিবেদক
প্রকাশকাল : পালাবদল ১০ বর্ষ ১২ সংখ্যা

www.pathagar.com

দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুপারভাইজড যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত

প্রশ্ন : মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবস্থায় এনজিওগুলোর প্রবর্তিত সুদ গ্রুপ সদস্যদের উপর প্রায়ই অভিশাপ হয়ে আসে - এজন্য সুদের মূল্যোৎপাটন ঘটানো উচিত, না অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্যপীড়িত গ্রুপ সদস্যদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা যায়?

উত্তর : মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবস্থা একটি ঐতিহাসিক ডেভেলপমেন্ট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন সমাজে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যাও বেড়েছে। এর মধ্যে যে চরম দারিদ্র্য তা কিন্তু বিশ্বব্যাপী গত এক'শ বছরে বেড়েছে। আগে দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু চরম দারিদ্র্য কম ছিল। তাই কল্যাণ অর্থনীতি বা মানুষের কল্যাণ নিয়ে যারা চিন্তাভাবনা করছিলেন তারা ভাবছিলেন, কি করা যায়? সমাজতান্ত্রিক ধারায় একরকম চিন্তা করা হচ্ছিল। আবার পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থায় কি করা যায় তা নিয়েও চিন্তাভাবনা হচ্ছিল। সে সব চিন্তা থেকেই আমাদের মাইক্রো ক্রেডিট বা ক্ষুদ্রঋণের ধারণা আসে। প্রচলিতভাবে বলতে হয় যে, এ বিষয়ে ধারণা দেন ড. ইউনুস। যদিও আমি আমার অন্য এক সাক্ষাৎকারে বলেছি এ ধারণা মূলত সমাজসেবা অধিদপ্তরই প্রথম দেয়। সুপারভাইজিং এবং গ্রুপ গঠনের ধারণাও মূলত তাদের। এটি তাদের এজন্য বলছি যে, ড. ইউনুসের আগে তারা এটি করেছিলেন। আমি ঐ সাক্ষাৎকারে বলেছি যে, ড. ইউনুস সেখান থেকেই নিয়েছেন আমি এটিও বলছি না। হয়তো তিনি নিজেই স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভাবন করেছেন। আর স্বতন্ত্রভাবে যে কেউ কোনো কিছু করতেই পারে।

আমাদের দেশে যারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে তারা মূলত দক্ষ (efficient)। কিন্তু তাদের অভাব হচ্ছে পুঁজি বা সম্পদের। অথচ তারা সামান্য পুঁজিতেই অনেক বড় কাজ করতে পারে। এ ধারণার ভিত্তিই প্রকৃতপক্ষে ড. ইউনুস বিভিন্ন গ্রামে পরীক্ষা করেন। শেষে তিনি গ্রামীণ ব্যাংক গড়ে তোলেন। সেখান থেকেই এ ধারণাটি আরো শত শত এনজিও নিয়ে নেয়। সে সাথে এ মডেলটি বিশ্বের অনেক দেশে নানারকম সংস্থার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। কতটুকু ছড়িয়েছে তা অবশ্য হিসাবের ব্যাপার। এটি গ্রামীণ ব্যাংকে থাকতে পারে।

আমরা আজ দেখি ক্ষুদ্র ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। প্রায় তিন কোটি লোক এর আওতায় চলে আসছে। তাদের এ ব্যবস্থা সুদ ভিত্তিক। আমরা আরো দেখি তাদের প্রশাসনিক খরচ নানা কারণে বেশি। এ অভিযোগও রয়েছে যে, মাইক্রো ক্রেডিটের যে টাকাটা বিদেশ থেকে আসছে তার একটি বড় অংশ ব্যবস্থাপনায় খরচ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু

www.pathagar.com

গরীবরা অল্পই পাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থপনায় সুদের হারটা বেশি। এটি প্রশাসনিক খরচের সাথেই যোগ করে দেয়া হয়েছে। সব মিলিয়েই কিন্তু খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। আরেকটি জিনিস লক্ষণীয় যে, মাইক্রো ক্রেডিট আন্দোলন শুরু হয়েছে প্রায় ত্রিশ বছর আগে। আর এর মূল্যায়ন শুরু হয়েছে গত দশ বছর ধরে। এখন মূল্যায়নে এটি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মাইক্রো ক্রেডিট আন্দোলনের মাধ্যমে যে ব্যাপক বিপ্লব হবে বলে মনে করা হচ্ছিল এবং চরম দারিদ্র্য দূর হবে তা কিন্তু হয়নি। বরং মাইক্রো ক্রেডিটের উপর জনগণের বিশ্বাস বা আস্থাও কমে এসেছে। এমনকি মাত্র ৫/৬ বছর আগে মাইক্রো ক্রেডিটের উপর বিশ্ব সম্মেলন হয়েছিল। তাতে বিশ্বের সকল দেশের অর্থমন্ত্রীরা গিয়েছিলেন। এটি উদ্বোধন করেছিলেন মিঃ ক্লিনটন। সেখানে তারা ১০০ বিলিয়ন ডলার তহবিল গঠনের অঙ্গীকারও করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে এক বিলিয়ন ডলারও পাওয়া যায়নি। এটি দুঃখজনক। এসব বড় বড় নেতারা এ প্রতিশ্রুতিই বা কেন দিলেন আর তা রক্ষাই বা কেন করলেন না - এটি একটি প্রশ্ন। তবে এ থেকে এটিও প্রমাণ হয় যে, এর উপর মানুষের আস্থা কমেছে। কারণ এর মাধ্যমে উন্নয়ন হবে, সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে, সমাজ বিপ্লব হয়ে যাবে এমন মনে হচ্ছে না। বরং সঠিক এপ্রোচ বলব এটিই - একটি জাতির সর্বোপরি উন্নয়ন না হলে সে জাতি দারিদ্র্য মুক্ত হবে না। অর্থাৎ দেশের অবকাঠামো, কৃষি, শিল্প তার বিভিন্ন সেবাখাতকে উন্নত করতে হবে এবং বন্টনের দিকে নজর দিতে হবে যাতে এর সুবিধা দরিদ্র সমাজ পেতে পারে। এটি হলো দারিদ্র্য বিমোচনের এবং উন্নয়নের মৌলিক কৌশল। তারপরও কিছু লোক বঞ্চিত থাকবে। তাদের জন্য আমার মতে মাইক্রো ক্রেডিট মুভমেন্ট থাকা উচিত। কিন্তু এর চেয়ে উন্নত ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বর্তমানে মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবস্থায় আমি মনে করি ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে, যদিও এতে কোনো সিকিউরিটি নেয়া হচ্ছে না। কিন্তু উন্নয়নের স্বার্থেই ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে, এটি পাঁচ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত হওয়া উচিত। এটি হবে শুধু আজকের দিনের হিসাবে। আবার যদি পাঁচ দশ বছর পরের কথা ধরা হয় সেখানে তখনকার মুদ্রাস্ফীতির হার ধরে টাকার পরিমাণ ঠিক করতে হবে।

আমি মনে করি, অল্প ঋণ দিয়ে এটি আশা করা ঠিক নয় যে, দারিদ্র্য দূর হবে। ঋণ গ্রহীতাকে টাকার উপর এতটা লাভ করতে হবে যাতে টাকা ফেরত দেয়া যায় এবং সে সাথে নিজেরাও চলতে পারে। কিন্তু অল্প টাকায় সুদসহ আসল টাকা ফেরত দেয়া এবং নিজের চলা বাস্তবে আমার কাছে অবাস্তবই মনে হচ্ছে। আর যদি এ পদ্ধতিই থাকে তাহলে টাকার পরিমাণ তিনগুণ হতে হবে এবং পাঁচ হাজারের জায়গায় কমপক্ষে পনের হাজার হতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, ঋণ পরিশোধের সময় বাড়াতে হবে। সেটি এক বছর নয় বরং তিন বছরে পরিশোধ করার সময় দিতে হবে। তাতে সে ন্যূনতম ঋণ ফেরত দিয়ে নিজে কিছুটা লাভবান হতে পারবে। এতে তারা নিজেরাও চলতে পারবে। এতে ১২ মাসের ১২ কিস্তির জায়গায় ৩৬ কিস্তি হবে; কিস্তির পরিমাণও কম হয়ে যাবে। অনেক দিন ধরে একটি প্রজেক্ট গড়ে তোলারও সুযোগ পাবে। এটি নিজের জীবনধারণেরও অবলম্বন হতে পারে। এটি যদিও এখন পর্যন্ত জটিল, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা দরকার যে এর মধ্যে পনের হাজার টাকা নিয়ে কিছু করা যায় কি না। না হলে টাকার পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে।

মুসলিম বিশ্বের দারিদ্র বিমোচনের জন্য সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে সুপারভাইজড যাকাত প্রদান ব্যবস্থা। কেন সুপারভাইজ করতে হবে? কারণ টাকা নিয়ে গরীবরা খরচ করে ফেলে। সুতরাং যাকাত ব্যবস্থায় টাকা দেয়ার পর সুপারভাইজ করতে হবে। যাকাত তো আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না। এখানে সুপারভাইজড যাকাতের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সরকারি পর্যায়ে এটি হতে

www.pathagar.com

পারে। এমনও হতে পারে যদি সরকার এটি না করে তাহলে যে সমস্ত মাইক্রো ক্রেডিট অর্গানাইজেশন ইসলামী নীতিমালা মেনে চলবে তাদেরকে যাকাত আদায় করার জন্য ভলান্ট্যারি ভিত্তিতে কর্তৃত্ব দিতে পারে। এটি গবেষণার বিষয়। কারণ আমাদের কাঠামোতে অনেক জিনিস কঠিন মনে হয়। কিন্তু কোনো একটি জিনিস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তখন তা সহজ হয়ে যায়। ইসলামী ব্যাংক যখন প্রতিষ্ঠা হয়নি তখন এটি একটি অসম্ভব কঠিন ব্যাপার বলে মনে হতো। কিন্তু এটি এখন কিছুই না বলে মনে হয়। এর থেকে বোঝা যায় প্রতিষ্ঠিত জিনিসের সুবিধা কত। কাজেই প্রাইভেট সেক্টর থেকেও যদি যাকাত আদায় হয় বা সরকার বড় বড় ইসলামী সংগঠনকে যাকাত আদায় করার কর্তৃত্ব দেয় তাহলে যারা মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম করতে চান তারা সেই সম্পদকে সুপারভাইজ যাকাত ব্যবস্থায় দিতে পারে। এতে এখানে সুপারভাইজড হবে, গ্রুপ থাকবে, সুপারভিশন থাকবে এবং সবই থাকবে।

এখানে প্রশাসনিক খরচ কীভাবে বহন করা হবে এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এজন্য ৫/১০ কিংবা ১৫% সার্ভিস চার্জ নেয়া যেতে পারে শুধু প্রতিষ্ঠান চালানোর খরচ হিসেবে। তাহলেই এটি করা যাবে আর এটিও বিধান আছে যে প্রশাসনিক খরচ যাকাতের অর্থ থেকে নেয়া যায়। সুতরাং এটি একটি পয়েন্ট যে, যে পরিমাণ যাকাত আদায় করা হবে তার ১০ ভাগ খরচের জন্য রাখা যাবে।

বর্তমানে মাইক্রো ক্রেডিটও থাকতে পারে কিন্তু এর দ্বারা সমস্যার সমাধান হবে না। এটি এভাবেই থাকবে। আর ইসলামী জনতার পক্ষ থেকে দেখতে গেলে এ ব্যবস্থা ঠিক নয়। এদেশের জনগণ মুসলিম। তারা সুদকে মনে প্রাণে চায় না। তাহলে এ ব্যবস্থা যদি থাকে তাহলে তিনটি পরিবর্তন আনতে হবে। এক. টাকার পরিমাণ বাড়ানো। দুই. টাকা ফেরত দেয়ার সময় বাড়ানো, কিস্তির সংখ্যা বাড়ানো। আর তৃতীয়ত এজন্য শুধু প্রশাসনিক ব্যয় আদায়, সার্ভিস চার্জ হিসেবে যা শরীয়াহ বিশেষজ্ঞগণ বৈধ বলেছেন। অর্থাৎ তারা যা নিয়েছে সেই প্রিন্সিপাল দেবে এবং প্রশাসনিক খরচও দেবে। এটিকে আমরা সার্ভিস চার্জ বলি। এর মধ্য থেকে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে ইসলামী ব্যবস্থায় সুপারভাইজ যাকাত ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যায়। সরকার যে টাকা যাকাত আদায় করে তা ১০/১৫ কোটি যাই হোক না কেন তা সুপারভাইজ মাইক্রো ক্রেডিট ফরমে অর্থাৎ সুপারভাইজ যাকাত ব্যবস্থায় করতে পারে। এখানে মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবস্থা ছিল কিন্তু সুপারভাইজও করল।

আর যদি সরকার খুব বড় আকারে করতে চায় যে, তারা এটিকে ফাউন্ডেশন করে দেবে তাহলে এটিও করা যায় বিরাট আকারে। আর যদি সরকার তা না করে তাহলে অন্তত যেসব এনজিও বা সংগঠন প্রমাণ করতে পারবে যে তারা ইসলামী নিয়ম মেনে চলবে তাদেরকে কর্তৃত্ব দেয়া উচিত। তাদেরকে সে অর্থ যাকাতের খাতসমূহে ব্যয় করতে হবে। সে সাথে সুপারভাইজ করতে হবে। অর্থাৎ যাকাত ফেরত নেয়া হবে না। শুধু তাদের উপর একটি ব্যয় ধার্য করতে হবে যা শুধুমাত্র খরচের জন্য হবে। সেটি তারা যাকাতের অর্থ থেকে নয় গ্রাহকের নিকট থেকে নিবে। যাকাতের অন্যান্য শরীয়তসম্মত ব্যবহার অবশ্য অব্যাহত থাকবে।

প্রশ্ন : মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো এবং মুদ্রানীতিকে বিকল করার ক্ষেত্রে সুদের কি কোনো ভূমিকা রয়েছে?

উত্তর : অর্থনীতিতে সুদ ফ্যাক্টর কি না এটি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। আমি যা দেখছি এবং নিজেও এ বিষয়ে লিখেছি যে, এটি একটি ফ্যাক্টর। আমি এভাবে বলেছি যে, আমি সুদী ব্যবস্থায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে আমাকে সুদ দিতে হবে। এটি হতে পারে ১০ ভাগ। আবার এর উপর ব্যবসাস্বরূপ আমি ১০ ভাগ লাভ করবো। তাহলে ১০+১০=২০ ভাগ আমি চাপিয়ে দিলাম টাকার উপরে। অর্থাৎ এক লক্ষ টাকা নিয়েছিলাম তারপর ১০

www.pathagar.com

ভাগ কষ্ট অব ফান্ড বলে কাটলাম আর কমপক্ষে দশভাগ আমি লাভ করবো - এ বিশ ভাগ চাপিয়ে দিলাম। ইসলামী ব্যবস্থায় সেখানে শুধু দশভাগ করা হতো। কষ্ট অব ফান্ডের সাথে ঐ দশ ভাগ যোগ করা হতো না। কাজেই এটিকে আমি কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর বলে মনে করি।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রচলিত কৃষি কাঠামো কৃষির ত্বরিত উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে কৃষি কাঠামো কোন পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানো যায়?

উত্তর : এজন্য সাবেক কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে। তিনি তার মন্ত্রণালয় ভালো করে চালিয়েছেন। একথা সবাই বলেন। আমিও সবার সাথে একমত যে, তিনি ভালোই চালিয়েছেন। উনার ব্যাপক অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

আমাদের কৃষি কাঠামোর মধ্যে ক্ষুদ্র কৃষক একটি দল। এখানে অনেক পুরনো পদ্ধতির চাষাবাদ ব্যবস্থা চালু আছে। তারপরও বলতে হয়, আমাদের জাতীয় উন্নয়নের যা কিছু হচ্ছে অনেকটাই কৃষিতে হচ্ছে। আমাদের গত ৭/৮ বছরের জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির পিছনে বিরাট কন্ট্রিবিউশন হলো কৃষির আর সার্ভিস সেক্টরের। শিল্প সে তুলনায় কম।

কৃষিতে আমাদের পুরানো চাষ পদ্ধতি আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। এটি আরো উঠে যাবে। ট্রাক্টর চাষ ব্যাপক হচ্ছে। বপনটা হচ্ছে না, কিন্তু মাড়াইটা মেশিনের সাহায্যে হচ্ছে। এখন জমি ভাগের প্রশ্ন আসে। ইসলামের বিরুদ্ধে এ জমি ভাগ নিয়েই অভিযোগ করা হয়ে থাকে। বলা হয়, এখানে শুধু ভাগই হতে থাকে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন এ অভিযোগটি অনেক বড় ছিল। আমরা নানা উত্তর দিতাম। কিন্তু আজকে বলা হয়, ইরি চাষের জন্য ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। পানি আটকে রাখার জন্য এ ধরনের আইল করতে হয়। কাজেই আইল সিস্টেম উচ্চ চাষাবাদের বিরুদ্ধে নয়, কিংবা উন্নয়নের বিরুদ্ধে নয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইল তুলে দেয়া কি সম্ভব? যদি সমবায় ব্যবস্থা থাকত তাহলে জমির বিষয়টি চিন্তা করা যেত। কিন্তু আমার তো মনে হয় বর্তমানে কো-অপারেটিভ সিস্টেম প্রায় উঠে গেছে। আমি এ মুহূর্তে আইল তুলে দেয়ার পক্ষপাতি নই। এতে অনেক অসুবিধা আছে। মারামারি, হাঙ্গামার ব্যাপারও আছে। জমিকে আমাদের দেশের মানুষ জানের চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে করে। এটি স্বাভাবিকও এবং এজন্য সে গণ্ডগোল, মারামারিও করে। হাইব্রিড বীজ কিংবা ইনটেনসিভ কালটিভেশনে এটি কোনো প্রতিবন্ধক নয়। কাজেই আমি বলব, কৃষির বিষয়টিকে কোনোমতেই হালকাভাবে নেয়া উচিত নয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট কৃষিবিদদের সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে, এমন একজন কৃষিবিদ যিনি কৃষি নিয়ে গভীরভাবে ভাবেন। কাজেই এ বিষয়টি তাদের কাছ থেকেই নেয়া উচিত। আর ঢেলে সাজানোর প্রশ্নে বলা যায়, একেবারে ঢেলে সাজাতে হবে না। শুধু সাজাতে পারলেই হবে। আমরা বলি একেবারে ভেঙে ফেলতে হবে, উল্টাতে হবে ইত্যাদি। এরকম নয় বিষয়টি। আমার মনে হয় বর্তমানে আমাদের যে সিস্টেম আছে জমির ব্যাপারে সেটি থাকা বাঞ্ছনীয়। বর্গা সিস্টেম যেটি আছে সেটিও ঠিক আছে। কেবল সার্বিক স্টাডির ভিত্তিতেই পরিবর্তন করা উচিত হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ওমর বিশ্বাস
প্রকাশকাল : জুলাই ২০০৩, অর্থনীতি গবেষণা

www.pathagar.com

দারিদ্র্য দূর করার প্রধান উপায় হলো উন্নয়ন

প্রশ্ন : দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা ও সরকার কাজ করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য বিমোচনে কতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে?

উত্তর : সাফল্য লাভ করেনি এ কথা বলা ঠিক হবে না। এখানে পরিসংখ্যানের একটি ব্যাপার আছে যা আমি এ মুহূর্তে দিতে পারবো না। যদি আমরা চারিদিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে সার্বিক দারিদ্র্য কিছুটা হলেও কমেছে। গ্রামে গেলে দেখা যায় মানুষ পূর্বের তুলনায় ভালো কাপড় চোপড় পরছে। আজ থেকে পনের-বিশ বছর আগে এরকম অবস্থা ছিল না। এটি সম্ভব হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি নীতির কারণে। এ নীতিতে মূলত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এটি ভালো দিক। দেশের উন্নয়ন যদি আমরা করতে পারি তাহলে দারিদ্র্য কমে যাবে। আর এটিই প্রকৃত নীতি হওয়া দরকার। এ উন্নয়ন হওয়া উচিত শিক্ষা, কৃষি ও সেবাখাতসহ সার্বিক ক্ষেত্রে। একই সাথে অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ উন্নয়ন হলে কর্মসংস্থান হবে। এর ফলে মানুষের আয় বাড়বে। একজন ব্যক্তি দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসবে। আমি ইসলামপন্থীদেরকেও বলবো আমরা যেন এটি মনে না করি শুধুমাত্র যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। এ ধারণা ঠিক নয়। যাকাত দারিদ্র্য দূর করতে পারে এমন জনসমাজে যেখানে অধিকাংশ ধনী, অল্প সংখ্যক দরিদ্র। মনে রাখতে হবে সব চেষ্টা করার পর যে দারিদ্র্য থেকে যাবে তা দূর করতে যাকাত হবে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু দারিদ্র্য দূর করার প্রধান উপায় হলো উন্নয়ন। যে কোনো দেশের ইসলামী সরকারকেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রশ্ন : দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করছে তাতে অনেক বেশি সুদ আদায়ের অভিযোগ উঠছে, এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর : দেখুন, অভিযোগ তো আছে। আমরা অনেক কথা অভিযোগ বা ধারণার ভিত্তিতে বলে থাকি। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, তোমরা ধারণার পেছনে দৌড়িও না। তাই সত্যিকার ভিত্তি ছাড়া কোনো কথা বলা ঠিক হবে না। আমি কিছু লেখা বিভিন্ন সময় পড়েছি তাতে পেয়েছি বেশিমাত্রায় সুদ নেয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ বা ক্ষুদ্র ফাইনান্সেরও দরকার আছে। তবে এক্ষেত্রে আমি এ আবেদন করতে পারি, যে এনজিওগুলো সুদের ভিত্তিতে চলে তাদের উচিত প্রশাসনিক ব্যয় কমানো। বড় গাড়ি ব্যবহার কম করা। যে সংস্থার এক গাড়িতে কাজ হয় তাদের দুটি গাড়ি ব্যবহার না করা। এক্ষেত্রে এনজিও ব্যুরো একটি বিধি করতে পারে। তাতে এনজিও ব্যুরোর প্রতিটি এনজিও, বিশেষ করে যারা ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা করে তাদের প্রশাসনিক ব্যয় পরীক্ষা করার অধিকার থাকবে। এ বিধিতে যেসব এনজিও ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা করে তাদের ব্যয়ের সমান তারা সার্ভিস চার্জ নিতে পারে। অথবা মুদারাবা মুশারাকার ভিত্তিতে পরিচালনা করতে পারে। রিস্ক ফান্ড অবশ্য আলাদা থাকবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের নিজস্ব সম্পদকে কি আমরা যথার্থভাবে ব্যবহার করতে পারছি?

উত্তর : আমাদের সম্পদ আছে। আবার সম্পদের সীমাবদ্ধতাও আছে। আমি আগেই বলেছি উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের নীতির মধ্যে একটি সমস্যা চোখে পড়ছে, সেটি হচ্ছে কঠিন দারিদ্র্য দূর করতে কিছু করা হচ্ছে না। রাস্তায় বা ফুটপাতে যারা অমানবিক জীবনযাপন করছে তাদের দরিদ্রতা দূর করতে আমরা কিছু করছি না। উদাহরণ হিসেবে বলি, ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে টঙ্গী পর্যন্ত দু'পাশের বস্তিতে যে লোকগুলো বাস করে তাদের দেখলে মনে হয় কুকুর-বেড়ালও এভাবে থাকে না। এগুলো দেখলে মনে হয়, আমার কি অধিকার আছে এ দেশে বাস করার, কি অধিকার আছে গাড়ি চড়ার? আমাদের বাজেটে দারিদ্র্য বিমোচনে ১০/১২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, সেখান থেকে ১ বা ২ হাজার কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে কঠিন দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এদেরকে ঋণ প্রদান বা ফাইন্যান্স করা সম্ভব নয়। এ দারিদ্রতা দূর করতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। কিছু কিছু বস্তিতে যারা অমানবিক জীবনযাপন করে তাদের ক্যাম্পে সরিয়ে নিতে হবে। এরপর এদের পুনর্বাসন করতে হবে। রেললাইনের পাশে বা এরকম স্থানে রেখে তাদের পুনর্বাসন সম্ভব নয়। এ ধরনের দারিদ্র্য উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দূর করা সম্ভব নয়। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। আমাদের যে সমাজ তাতে এ সমাজের আলোকে বাস্তব চিন্তা করতে হবে। আমাদের সিভিল সার্ভিস দুর্নীতিগ্রস্ত। ইউরোপ-আমেরিকায় সাধারণ মানুষ বা সাধারণ কর্মচারীরা এতটা দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। এজন্য দারিদ্র্য বিমোচনে যে কর্মসূচি নেয়া হবে তার ২০/৩০ ভাগ অপচয় হয়। আর যদি ইসলামী সরকার হয় বা সৎ সরকার হয় তবে দুর্নীতি অনেক কমে আসবে - এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

প্রশ্ন : দারিদ্র্য বিমোচনে রাজনৈতিক দলগুলো কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে?

উত্তর : অবশ্যই ভূমিকা নিতে পারে। তারা সমাজের নেতা। তারা সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সাধারণভাবে আমাদের রাজনীতিকরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। রাজনীতিকে ব্যবহার করে কে কতটা আর্থিকভাবে লাভবান হবে তা নিয়ে তারা ব্যস্ত। সত্যিকার অর্থে, রাজনীতিকরা এ দেশে মানবসেবার চিন্তা করে বলে মনে করতে পারি না। আসলে আমাদের যে কোনো পরিকল্পনা বাস্তবতার ভিত্তিতে নিতে হবে। বর্তমানে যে রাজনৈতিক দুর্নীতি চলছে তাতে রাজিনৈতিক দলগুলো দারিদ্র্য বিমোচনে তেমন কিছু করতে পারবে না। তারা বহু ভাগে বিভক্ত। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাই আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাতিষ্ঠানিক যে ব্যবস্থা আছে তাকে ব্যবহার করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগসমূহ, প্রাইভেট সেক্টর ও উদ্যোক্তাদের ব্যবহার করতে হবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সম্ভব হলে এক্ষেত্রে বেশি বেশি প্রচার মাধ্যম বা টেলিভিশনকে ব্যবহার করতে হবে।

সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশে সার্বিক উন্নয়নের জন্য ও কঠিন দারিদ্র্য দূর করতে সবাইকে আন্তরিক মনোভাব দেখাতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আলফাজ আনাম
প্রকাশকাল : ১৯ ডিসেম্বর ২০০৩, দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

ইসলামের সৌন্দর্যকে তুলে ধরতে ব্যাংকগুলোকে ভীতি কাটিয়ে মুদারাবা-মুশারাকায় যেতে হবে

প্রশ্ন : ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য আরবি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য আরবি ভাষার অবশ্যই প্রয়োজন একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। যদিও অনুবাদের মাধ্যমে আরবি-সাহিত্য ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি, ফ্রেঞ্চ, বাংলাসহ অন্যান্য অনেক ভাষাতেই হয়ে গেছে। সে হিসেবে অনুবাদ দ্বারা একজন ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। তারপরেও মানতে হবে আরবি ভাষা কিছু না কিছু জানা থাকলে স্টাডিতে সুবিধা, বুঝতে সুবিধা। বিশেষ করে আরবি ভাষা যদি মাঝামাঝি একটি পর্যায়েও জানা থাকে তাহলে কুরআন বোঝা সহজ। এতে কুরআনের স্পিরিট নেয়া যায়। ইসলামের মূল গ্রন্থ আল-কুরআনের স্পিরিট আরবিতেই একশ ভাগ নেয়া সম্ভব।

তবে আরবি ভাষার পূর্ণ পণ্ডিত না হয়েও একজন ইসলামিক স্কলার হতে পারেন। ইসলামিক ইকোনোমিস্ট কিংবা পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট হওয়া যায়। কিন্তু যদি মুজতাহিদ হতে হয় অর্থাৎ যিনি ইসলামিক কোর্টগুলোতে বসবেন, আলেম হবেন তাকে আরবি অবশ্যই জানতে হবে। ইসলামের অনেক বড় পণ্ডিত হতে হলে, ফতোয়া বা মতামত দিতে সক্ষম হতে হলে বিভিন্ন টেকনিক্যাল অথবা শরীয়তের মূল বিষয়গুলোতে, তাদের জন্য আরবি জানা একেবারে জরুরী।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান শরীয়াহর নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত তাদের উন্নয়নে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি) কি ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে?

উত্তর : আইডিবি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক ব্যাংক। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পরেই এটি। এর ক্যাপিটাল বেস অনেক বড়, প্রায় দশ বিলিয়ন ইউএস ডলার। তারা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা নিচ্ছে। বিশেষ করে আফ্রিকান দেশগুলোতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে আমরা ততটা ব্যবহার করতে পারছি না। এর কারণ কি তা আমার জানা নেই। আমার মনে হয় সরকারকেই এর উদ্যোগ নিতে হবে এবং আমাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রকল্প সাবমিট করতে হবে। প্রকল্প দেখিয়েই আইডিবির সহায়তা চাইতে হবে। সেটি না করে শুধু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের দিকে চেয়ে থাকা ঠিক হবে না।

আইডিবি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেক ইসলামী ব্যাংকের অংশীদার। কিন্তু আইডিবি সরাসরি কোনো ব্যাংকের সাথে ডিল করতে পারে না। তারা কান্ট্রি গভর্নমেন্টের মাধ্যমে কাজ করে যেমনটি করে থাকে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। কাজেই

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকগুলো সরাসরি আইডিবির কাছ থেকে ফান্ড চাইতে পারে না। এ ব্যাপারে তাদের করণীয়ও কিছু নেই। তারা শুধু দেখে সার্বিকভাবে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকগুলো যেন শক্তিশালী হয়। প্রতিবছর আইডিবির সম্মেলনে সকল ইসলামী ব্যাংকগুলোকে তারা পর্যবেক্ষক হিসেবে ডাকে। ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে আমি আলজিয়ার্স, বৈরুত ও জেদ্দার তিনটি সম্মেলনে গিয়েছি।

আইডিবির কাছে কোনো পার্টিকে সে দেশের সরকারের অনুমতি নিয়েই প্রকল্প সাবমিট করতে হয়। কিন্তু আমরা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেটি এখনো কাজে লাগাতে পারছি না। এ সিস্টেম গড়ে তুলতে সরকারের ভূমিকাই মুখ্য হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আফ্রিকাতে যেভাবে আইডিবির কাজ হচ্ছে তার থেকে আমরা জ্ঞান নিতে পারি।

প্রশ্ন : অর্থাৎ আইডিবির ভূমিকাকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারলে আমাদেরই উপকার হবে।

উত্তর : হ্যাঁ। তবে যে কোনোভাবেই হোক এটি বাংলাদেশ সরকারের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে। আইডিবিকে আমাদের প্রয়োজনেই আরো বেশি করে ব্যবহার করা দরকার। আর এতে সরকারের ভূমিকাই আসল।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (আইএফএসবি) কি ভূমিকা পালন করছে?

উত্তর : গত বছর নভেম্বর মাসে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালামপুরে আইএফএসবি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর হেডকোয়ার্টারও সেখানে। এর উদ্বোধনী দিনে যে চার্টার (দলিল) সাইন হয় সেখানে আমি ছিলাম। এর উদ্দেশ্য হলো ইসলামিক ব্যাংকগুলোর একটি আলাদা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। বিশ্বের সকল আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং অপারেশনের ব্যাপারে একটি নীতিমালা ঠিক করার দায়িত্ব একটি সংগঠনের উপরে আছে। ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর সেটেলমেন্ট (আইবিএস) নামে এ সংগঠন ইউরোপের এক শহর বাজেলে (Basle) অবস্থিত। তাদের ঠিক করা আন্তর্জাতিক নীতিমালাই সারা বিশ্বের ব্যাংকগুলো ফলো করে। দু'য়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। কাজেই ইসলামিক ব্যাংকগুলোর জন্য আলাদা আরেকটি রেগুলেটরি বডি হওয়া দরকার। তাতে শুধু কমন বিষয়গুলোতেই তারা বাজেলকে ফলো করবে। এ উদ্যোগটি প্রথম নিয়েছে আইডিবি। পরে পাকিস্তান, সুদান, মালয়েশিয়াসহ মোট সাতটি দেশকে এর দায়িত্ব দেয়া হয়। তারা একটি পরিকল্পনা তৈরি করে। তার ভিত্তিতেই ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (আইএফএসবি) গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এটি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী রেগুলেটরি বডি হিসেবে বাজেলের ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর সেটেলমেন্টের মতোই দায়িত্ব পালন করবে। এটি শুধু ইসলামিক ব্যাংকগুলোর জন্যই নয় ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনিস্টিটিউটের জন্যও ওয়ান স্টেপ এহেড। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এটি বিরাট ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

আইএফএসবি মালয়েশিয়ায় হওয়াতে ভালোই হয়েছে। কারণ, আমি লক্ষ্য করেছি সেখানে ইসলামিক স্কলারের সংখ্যা অনেক বেশি। তারা ইকোনোমিক্সসহ আধুনিক বিষয়গুলো ভালো বোঝে। সবদেশেই কিন্তু আধুনিক ইস্যু বোঝে এরকম এক্সপার্ট বেশি নেই। সে হিসেবে তারা অনেক এগিয়ে। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়াও হয়তো এর একটি কারণ। কেননা হয়তো এজন্যই বিশ্বের বড় বড় স্কলাররা এসে এখানে জড়ো হয়েছে। অবশ্য আমি আশা করি আগামীতে মালয়েশিয়াসহ পাকিস্তান, মিশর, তুরস্ক একটি বিরাট ভূমিকা রাখবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড কিছুদিন পূর্বে ইসলামিক মানি মার্কেট সংক্রান্ত একটি নীতিমালা অনুমোদন করে। এতে ইসলামিক ব্যাংকগুলো কীভাবে লাভবান হবে?

উত্তর : ইসলামিক মানি মার্কেট খুবই জরুরী ছিল। কোনোরকম বিধান ছাড়াই এক ব্যাংক আরেক ব্যাংক থেকে ফাইন্যান্সিয়াল সাহায্য নিচ্ছিল। কিন্তু তার কোনো ফরমাল রূপ ছিল না। তাই ইসলামিক ব্যাংকগুলো ফরমাল গ্রুপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল। তার জন্য ইসলামিক ব্যাংক কনসালটেটিভ ফোরাম (আইবিসিএফ) গঠনের প্রস্তাব আসে। আমি এর বর্তমান সভাপতি। তখন সকল ব্যাংকের মতামত নিয়ে একটি খসড়া দাঁড় করানো হয়। যদিও আইবিসিএফ এর শরীয়াহ জ্ঞান সম্পন্ন লোক আছে তা সত্ত্বেও আমরা মনে করলাম এজন্য সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ডের অনুমতি নেয়া দরকার। সেখানে অভিজ্ঞ আলেম, মুফতি, ফকিহগণসহ ব্যাংকগুলোর চেয়ারম্যান ও এমডিরা রয়েছেন। এটি খুবই ভালো যে ব্যাংকিং সেক্টরের ওনাররা (Owners) এখানে আছেন। আবার যারা এমডি, যারা টেকনিক্যালি ভালো জানেন তারাও এখানে আছেন। আবার সকল ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারিগণ এতে আছেন। ফলে এটি একটি খুবই ব্যালান্সড বডি হয়েছে। এর বর্তমান সভাপতি হচ্ছেন খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেব। সেই শরীয়াহ বোর্ড মানি মার্কেটের প্রস্তাবনা কিছুটা পরিবর্তন করে অনুমোদন করে। সেটি সকল ব্যাংকে কার্যকর করার জন্য ইতোমধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এ প্রস্তাবনার ভিত্তিতেই এখন কাজ হবে।

যে কোনো ব্যাংক সাময়িকভাবে বিপদে পড়তে পারে। এক ব্যাংকের টাকা লাগলে অন্য ব্যাংকের কাছ থেকে কিসের ভিত্তিতে নেবে? এসবের জন্য মানি মার্কেটের প্রয়োজন। মুদারাবার ভিত্তিতেই সে লেনদেন হবে। এর লাভ-লোকসান, সময়ের প্রয়োজনীয়তা, কেন নেয়া হবে, সবকিছুই এখানে ঠিক করে দেয়া হয়েছে। তবে এজন্য আলাদা কোনো অর্গানাইজেশনের দরকার নেই। এগুলো হচ্ছে কতগুলো নীতিমালা। এটি একটি প্রাকটিসের ব্যাপার। এর ভিত্তিতেই ব্যাংকগুলো এখন ওয়ান টু ওয়ান ডিল করবে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। ইসলামী ব্যাংকগুলো যদি সমস্যায় পড়ে, প্রয়োজনীয় নীতিমালা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে কি হবে? তার জন্য শরীয়তের যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা আছে সেগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে। বিষয়টি সে আলোকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

প্রশ্ন : প্রত্যেক ব্যাংকের নিজস্ব শরীয়াহ বোর্ড থাকা সত্ত্বেও সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড গঠনের প্রয়োজন হলো কেন?

উত্তর : প্রত্যেকটি ইসলামিক ব্যাংকের মতো কেন্দ্রীয় ব্যাংকও আমাদেরকে আলাদা একটি কেন্দ্রীয় শরীয়াহ বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। এর উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন শরীয়াহ বোর্ডের মতামতের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা দেয় তাতে সামঞ্জস্যতা বিধান করা। কারণ, একেক জায়গায় একেক রকম শরীয়তের বিধান হওয়ায় অন্যেরা ভুল বুঝতে পারে। শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ ও মতের অবকাশ থাকা সত্ত্বেও এটিই ভালো হবে যদি আমরা এ উঠতি সময়ে একমতে পৌছাতে পারি। এ একমতে পৌছানোর জন্য একটি সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ডের প্রয়োজন ছিল। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, যদি কোনো কারণে ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট মনে করে তাদের স্থানীয় শরীয়াহ কাউন্সিল যে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তা তাদের মনঃপুত হচ্ছে না বা তার জন্য তাদের অসুবিধা হচ্ছে তাহলে তার বিরুদ্ধে তাদের আপিল করার একটি জায়গা থাকা দরকার। এজন্য যেসব নীতিমালা নেয়া হয়েছে তার মধ্যে

www.pathagar.com

একটি কথা বলা আছে - প্রত্যেক শরীয়াহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ডেই চূড়ান্ত হবে সাবজেক্ট টু আপিল। অর্থাৎ ম্যানেজমেন্টের আপিলের অধিকার থাকবে।
এটি ভালোই হয়েছে। এতে প্রত্যেক শরীয়াহ বোর্ডই সাবধান হবে। সে সাথে সেন্ট্রাল বোর্ডও অত্যন্ত সতর্ক হবে যে তারা অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করছে। খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে শরীয়তের মূল ও মান মর্যাদা রক্ষা পায়। একদিকে মূল্যবোধ রক্ষা পায় অন্যদিকে মানুষের প্রয়োজন পূরণ হয়।

প্রশ্ন : কিন্তু প্রত্যেক ব্যাংকের চেয়ারম্যান, এমডি এবং ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ডের সভাপতি ও সেক্রেটারিরাই তো সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ডের সদস্য। তাহলে কি তাতে স্থানীয় শরীয়াহ বোর্ডের ক্ষমতা ও অধিকার ক্ষুণ্ন হয় না?

উত্তর : এটি মনে করা ঠিক নয়। জজ কোর্ট থেকে হাইকোর্ট মামলার রায় বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়, আর এখানে প্রত্যেক ব্যাংকের (ছয়টি ব্যাংকের) চারজনকে নিয়ে সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ডের ধরলাম চব্বিশ জন সদস্য। সেখানে কোনো ব্যাংকের ম্যানেজমেন্ট শরীয়াহর রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করল। অর্থাৎ বিষয়টি হলো চেয়ারম্যান ও এমডি শরীয়াহ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করল মানে বাকি ২২জন বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবে। এখানে একটি বিষয় এরকম করা যেতে পারে যে, যে শরীয়াহ বোর্ডের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে তারা ভোট দিতে পারবে না। শুধু মতামত জানাতে পারবে।
আসলে আমরা নিজেরাই বুঝি কোন কোন বিষয়ে আপিল থাকা প্রয়োজন। কোনো কোনো জায়গায় তিন-চারটাও আপিল থাকে। সেখানে আমরা একটি আপিলের ব্যবস্থা রেখেছি। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, এরপরও ওআইসির ফিকাহ একাডেমীতে আপিল করার অধিকার থাকা দরকার। তখন সেটি একটি আন্তর্জাতিক কোর্টের মতো হবে। আর এটি হতেই পারে। যেমন ইন্টারন্যাশনাল একটি কোর্ট আছে। রাষ্ট্র সেখানে বিচার চাইতে পারে। যদিও সেটি একটিভভাবে কার্যকর হচ্ছে না। এদিকে ওআইসির ফিকাহ একাডেমীতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বড় আলেমরা আছেন। এগুলো সবই আমার ব্যক্তিগত মত, সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড বা ইসলামিক ব্যাংক কনসালটেটিভ ফোরামের নয়।

প্রশ্ন : আপনার এ আপিল স্তর তো সময়ের বিচারে একটি প্রলম্বিত প্রক্রিয়া?

উত্তর : আসলে প্রথম সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই একশন চলবে। পরে অবৈধ হলে তা করবো না। আপিলের রায় ওভারটার্ণ হলে তখন সেটিই বাস্তবায়ন করা হবে। এতে সত্যিকার অর্থে তেমন কোনো সমস্যা হবে না। আপিলের ব্যবস্থা রাখতেই হবে। এখানে দেরি বড় কথা নয়। এখানে শরীয়াহর মূলনীতি বোঝার প্রশ্ন। শরীয়তের গভীরতা বোঝার প্রশ্ন। শরীয়তকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করার প্রশ্ন। এ বিষয়গুলোকে তো আর আমরা সাদামাটাভাবে দেখতে পারি না। আমরা যেন শরীয়তের ভিফিকাল্ট ব্যাখ্যা না দেই, ন্যারো না করি। শরীয়তের স্বার্থেই এর উদারতাকে যেন আমরা ভুলে না যাই।

প্রশ্ন : একথা সত্য যে বিভিন্ন ব্যাংকের শরীয়াহ কাউন্সিলের ফকিহগণের আধুনিক ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা যেমন কম অন্যদিকে ব্যাংকগুলোর নির্বাহী বা কর্মকর্তাদের শরীয়াহ সম্পর্কিত ধারণাও কম। এটি শরীয়াহ সম্মত ব্যাংকিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে আপনি কি বলবেন?

উত্তর : আমার মতে এজন্য দু'টি কোর্স চালু করা যেতে পারে। একটি শরীয়াহ সংক্রান্ত, অন্যটি ব্যাংকিং সংক্রান্ত। শরীয়াহর মূলনীতি, লক্ষ্য, এর বিভিন্ন দিক যেসব ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন বাই সংক্রান্ত নীতিমালা, চুক্তি সংক্রান্ত নীতিমালা - এসব বিষয়ের

www.pathagar.com

উপর ব্যাংকের পরিচালকসহ এমডি লেবেলে একটি কোর্স হওয়া দরকার। সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড এর আউট লাইন তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে মুফতি বা ফকিহ সাহেবদের জন্য আরেকটি কোর্স হওয়া দরকার। এখানে ইকোনোমিক্স (জেনারেল ও ইসলামিক), ফাইন্যান্স, ব্যাংকিং থাকবে। এসব বিষয় যদি তারা ভালো করে জানে তাহলে নীতিমালা তৈরিতে সহায়ক হবে। আধুনিক অর্থনীতি সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকতে হবে। উভয় কোর্সই প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে হতে পারে। এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, এক মাস কিংবা তিনমাস। এতে এমডি, মুফতি কিংবা ডাইরেক্টরদের কষ্ট হবে কিন্তু তা ইসলামের স্বার্থে করা প্রয়োজন। কেননা উভয়ের জ্ঞানই অর্ধেক, পুরা হবে যদি দুই জ্ঞান এক হয়। এর সমন্বয় এখনই জরুরী।

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংকগুলো মুদারাবা-মুশারাকা বিনিয়োগে মোটেই আগ্রহ দেখাচ্ছে না কেন?

উত্তর : আমার যেটি মনে হয় তারা ভয় পায়। এতে ব্যাংকের তেমন লাভ আসে না। কারণ যারা ব্যবসা বাণিজ্য করছে তারা লাভ ঘোষণা করবে না। তাতে ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু আমি মনে করি এ ভয় ইসলামী ব্যাংকের বেনিফিট থেকে জনগণকে বঞ্চিত করছে। সে সাথে ইসলামী অর্থনীতির বেনিফিট মানুষ বুঝতে পারছে না। এর থেকে উত্তরণের জন্য ব্যাংকগুলোর মুদারাবা, মুশারাকায় যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। যারা দীর্ঘদিন ব্যাংকিং করছে, যাদের অবস্থা মোটামুটি ভালো তাদেরকে মুদারাবা, মুশারাকায় যাওয়া উচিত।

বর্তমানে আমাদের ইনকাম ট্যাক্স আইনে কোনো সমস্যা নেই। তাই ব্যবসায়িদের লাভ ঘোষণা করা উচিত। আমাদের ইনকাম ট্যাক্স রেট খুব হাইও নয়। এছাড়া অনেক শিল্প আছে যারা ট্যাক্স হলিডে পায়। তাদের তো লাভ ঘোষণা করলেও ক্ষতি নেই। ট্যাক্স হলিডের পরে যে রেট সেটিও বেশি নয়। বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের ট্যাক্স রেট কম। কাজেই শিল্পপতিদেরও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে যা ট্যাক্স হয় তা জনগণের খেদমতে দিয়ে দিতে হবে।

কাজেই ব্যাংকগুলোকে ভীতি কাটিয়ে মুদারাবা, মুশারাকায় যেতে হবে। ইসলামের প্রতি আমাদের যদি কমিটমেন্ট থাকে, আমাদের উচিত ইসলামের সৌন্দর্যকে তুলে ধরা। কিন্তু ব্যাংকের ক্ষেত্রে শুধু বাই-মুয়াজ্জল আর বাই-মুরাবাহা দিয়ে তা বোঝানো সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাফল্য আশাতীত। প্রতিনিয়তই তারা তাদের শাখা বৃদ্ধি করে চলছে। কিন্তু ব্যাংকগুলো বিদেশে শাখা খোলার মাধ্যমে তাদের মিশন নিয়ে যাচ্ছে না কেন?

উত্তর : বিদেশে শাখা খোলা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সেসব দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংক কঠোর নীতিমালা ফলো করে। সেখানে বিরাট ক্যাপিটাল নিয়ে যেতে হয়। যেমন নিউইয়র্কে শাখা খুলতে যে ক্যাপিটাল লাগে বাংলাদেশের কোনো ব্যাংকের পক্ষে তা সম্ভব নয়। ঐসব সেন্ট্রাল ব্যাংক কথায় কথায় মিলিয়নস অব ডলার ফাইন করে। তাতে আমরা বিপদে পড়ে যাব। কাজেই আমি এ মুহূর্তে মনে করি না ইসলামী ব্যাংকগুলোর বাইরে শাখা খুলতে হবে। আমাদের উচিত বাইরের বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। প্রত্যেক দেশেই যেন ইসলামী ব্যাংক চালু করা যায় তার প্রচেষ্টা চালানো। এটি পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে করা সহজ। সুতরাং শাখা খোলা সবার জন্যই প্রব্লেমেটিক। একসেপ্ট ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, কারো এত শক্তি নেই যে তারা বাইরে গিয়ে শাখা খোলে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : মালয়েশিয়া, সুদান, ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, তানজানিয়াসহ আরো কয়েকটি দেশে ইসলামী ব্যাংক কোম্পানী আইন হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো তা হয়নি। আইবিসিএফ এর চেয়ারম্যান হিসেবে আপনার ভাবনা কি?

উত্তর : আইবিসিএফ-এর অফিসিয়াল পজিশন হচ্ছে 'ইসলামিক ব্যাংক এ্যাক্ট' হওয়া দরকার। সে চিন্তাতেই আইবিসিএফ একটি এ্যাক্ট করে সকল ব্যাংকের সম্মতির ভিত্তিতে সেন্ট্রাল ব্যাংকে পাঠায়। এদিকে সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড গঠিত হওয়ার পর তারা সে এ্যাক্ট দেখতে চায়। তারা সেটিকে আরো ইমপ্রুভ করে। আমরা আশা করি, সেন্ট্রাল ব্যাংক এটি পাস করতে উদ্যোগ নেবে। এটি লম্বা সময়ের ব্যাপার। সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে মিনিস্ট্রি অব ফাইন্যান্স, সেখান থেকে মিনিস্ট্রি অব ল' হয়ে পার্লামেন্ট পর্যন্ত, এজন্য আবার কেবিনেটের সম্মতি লাগবে। ইতোমধ্যে বর্তমান আইনে আমাদের কি অসুবিধা হচ্ছে তা সেন্ট্রাল ব্যাংক জানতে চেয়েছে। আমি সেটি প্রত্যেক ব্যাংকের নিকট পাঠিয়েছি।

প্রশ্ন : বর্তমানে ব্যাংকের পাশাপাশি ইন্সুরেন্স কোম্পানীগুলো শরীয়াহ বোর্ড গঠন করছে। শরীয়াহ বোর্ড সম্পর্কে আপনার সার্বিক মূল্যায়ন কি?

উত্তর : আমার কাছে কোনো কোনো ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ডকে যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে হয়। তবে প্রত্যেক ব্যাংকেই যথেষ্ট যোগ্য লোকের নিয়োগ জরুরী। সেখানে আমরা যেন শুধু পছন্দের লোক নিয়োগ না করি। আমি আশা করছি সেন্ট্রাল ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ড হওয়ায় এর অগ্রগতি হবে। তারাও দেখবে কোনো ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ড দুর্বল আছে কিনা। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক নতুন। এর শরীয়াহ কাউন্সিলও নতুন। সার্বিক বিবেচনায় সবই মহৎ উদ্যোগ এবং অগ্রগতি। এর গুরুত্ব ধীরে ধীরে বাড়ছে। ইতোমধ্যে তা জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

অন্যদিকে ইন্সুরেন্স কোম্পানীগুলোর যদি আলাদা একটি সেন্ট্রাল বোর্ড হয় তাহলে তা ভালো হবে। কেননা ব্যাংক ও ইন্সুরেন্সের সমস্যার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। পরবর্তীকালে, বলা যায় আরো পাঁচ থেকে সাত বছর পরে উভয়ের মধ্যে একটি ওভারঅল কোর্ডিনেটিং বডি হতে হবে সমস্ত ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট সহ। এর সম্ভাবনাও আছে। সময়ই বলবে কোনটি ঠিক আর কোনটি প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন : অভিযোগ রয়েছে ঋণ খেলাপী ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার পিছনে ব্যাংকগুলোর অনেক পরিচালক দায়ী। তারা প্রভাব খাটিয়ে নামে বেনামে অযোগ্য লোকদের ঋণের ব্যবস্থা করে থাকেন। আবার ব্যাংকের নিয়োগের ক্ষেত্রেও দক্ষতা, যোগ্যতার পরিবর্তে স্বজনপ্রীতি ও আঞ্চলিকতার প্রাধান্য দেয়া হয় বলে ব্যাংকগুলো কাঙ্ক্ষিতমানের সাফল্য পাচ্ছে না। এ অভিযোগ কি ঠিক?

উত্তর : আমি বলব, ঢালাওভাবে কোনো কথা বলা ঠিক নয়। কাউকে দায়ী করাও ঠিক নয়। তবে আশা করি ইসলামী ব্যাংকগুলোর পরিচালকগণ এ ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। তারা কোনো অন্যায়ে জড়িত হবেন না। এজন্য কোনো অসুবিধা হলে স্বাভাবিকভাবে সেন্ট্রাল ব্যাংক একশন নেবে।

দ্বিতীয়ত, নিয়োগের ক্ষেত্রে আমি নিজেও মনে করি যোগ্যতার ভিত্তিতেই নিয়োগ হওয়া উচিত, অন্য কোনো কনসিডারেশনে নয়। ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে বলব, এ ব্যাংকে যোগ্যতার ভিত্তির সাথে ইসলামিক জ্ঞান বিবেচনা করেই নিয়োগ দেয়া হয়। এখানে কোনো আঞ্চলিকতা কিংবা স্বজনপ্রীতি দেখানো হয় না। আর এটিকে প্রশ্রয় দেয়া একেবারেই সঙ্গত নয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংকগুলোতে অধিক সময় ধরে কাজ করার অভিযোগ রয়েছে। ফলে পড়াশুনা, ব্যক্তিগত মান উন্নয়ন, পরিবার ও সামাজিকতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তারা দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে।

উত্তর : এত দেরি হবার কারণ আমি বুঝতে পারি না। আমি মনে করি সকলের কাজ পাঁচটার মধ্যেই শেষ করা উচিত। দু'একটি ক্ষেত্রে জরুরী কিছু থাকলে দু'একদিন দেরি এমনিতেই হতে পারে। সেটি সবাই মেনেও নেবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না প্রত্যেকদিন কেন এমন হবে। রুটিন কাজ থাকবে তবে ইমার্জেসি কাজ তো আর সবার টেবিলে থাকবে না। রুটিন কাজ পরেরদিন করলেও চলে। ইমার্জেন্সি কাজ সেদিনই করে ফেলা উচিত।

প্রশ্ন : আপনি ইসলামী ব্যাংকস কনসালটেটিভ ফোরামের চেয়ারম্যান। সে হিসেবে ব্যাংকগুলোর দায়িত্বও আপনার উপর। ব্যাংকগুলোর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তর : সার্বিকভাবে বলা যায় কোনো ব্যাংকই ক্রাইসিসে নেই। কোনো কোনো ব্যাংক খুব ভালো করছে। দু'একটি ব্যাংকের অবস্থা ভালো না হলেও তারা ক্রাইসিসে নেই। আশা করি ভবিষ্যতে সব ব্যাংকই ভালো করবে। সেন্ট্রাল ব্যাংক সবসময়ই নজরদারি করছে। সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড, আইবিসিএফ এ ব্যাপারে সহায়তা করছে। ভবিষ্যতেও করবে। তাদের উচিত যাদের যেসব সমস্যা আছে সেক্ষেত্রে সাহায্য করা। আইবিসিএফ-এর চেয়ারম্যান হিসেবে কয়েকটি ব্যাংক ভিজিট করে তাদের সমস্যা জেনেছি। পরামর্শ দিয়েছি। আশা করি তারা ঐসব পরামর্শ মেনে চললে তাদের সমস্যা দূর করতে পারবে।

প্রশ্ন : এ কথা সত্য যে ইসলামী ব্যাংকগুলো সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা এখনো পুরোপুরি পরিস্কার নয়। এদেশের সাধারণ জনগণের উপর ইমামদের বিরাট প্রভাব রয়েছে। ইমামদের ইসলামী ব্যাংক তথা ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে?

উত্তর : এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হচ্ছে। বিষয়টিকে আমরা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে পারি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমামদের যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আছে তাতে ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের উপর কোর্স থাকা উচিত। এজন্য একজন ইসলামী অর্থনীতিবিদের বই লাগবে। আধুনিক অর্থনীতির বই যেমন, মরহুম আবদুল হামিদ সাহেবের ইসলামী অর্থনীতির বইটিকে ভিত্তি করে কোর্স করানো যেতে পারে। এরকম আরো অনেক বই আছে। এটি করতে পারলে আমরা লাভবান হবো। এমনিভাবে যারাই ইমামদের প্রশিক্ষণ দেয় সেখানে অর্থনীতি, ব্যাংকিং কোর্স চালু করলে ফল পাওয়া যাবে। অন্যদিকে ইমাম সাহেবদেরকে বলব, আপনারা ইসলামী অর্থনীতির বইগুলো পড়ুন। আপনাদেরকে সালাত, সিয়ামের বইয়ের পাশাপাশি অর্থনীতি, রাজনীতি, ইসলামী সমাজতত্ত্বের বইও পড়তে হবে। এটি অত্যন্ত জরুরী। অর্থনীতি এত বড় বিষয় এটি যদি না পড়েন তাহলে আপনাদের জ্ঞান খুবই অসম্পূর্ণ থাকবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ মোখলেছুর রহমান ও ওমর বিশ্বাস
প্রকাশকাল ঃ মার্চ ২০০৪, ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড জার্নাল

www.pathagar.com

ঘুষ বন্ধে নানা পদক্ষেপের সাথে রাজনীতিকেও সুস্থ করতে হবে

প্রশ্ন : ঘুষ বলতে আমরা কি বুঝি? ঘুষ কত ধরনের হতে পারে?

উত্তর : ঘুষ বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি, কোনো সরকারি কর্মচারী কোনো কাজ করে দিলো, তার স্বাভাবিক দায়িত্ব ছিল বৈধভাবে কাজ করে দেয়া, কিন্তু যখন ঐ ব্যক্তি বৈধ কাজ করে না যতক্ষণ না তাকে কোনো অর্থনৈতিক সুবিধা অথবা অন্য কোনো সুবিধা দেয়া হয়। প্রচলিত ধারায় তাকে আমরা ঘুষ বলবো।

এটি রাজনৈতিক পর্যায়েও হতে পারে। কোনো রাজনীতিবিদ কোনো কাজ করে দিলেন, বিনিময়ে অর্থনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করলেন, এটিকেও আমরা ঘুষ বলি। কোনো সরকারি কর্মচারী যদি কোনো অবৈধ কাজ সুবিধার বিনিময়ে করে দেয় তাও ঘুষ পর্যায়ে পড়বে। তবে এটি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যারা এ ধরনের কাজ করেন কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এ ধরনের আরো অনেক ক্ষেত্রে ঘুষ হতে পারে যেমন যারা ঠিক রাজনীতিবিদ নয়, সরকারি কর্মচারীও নয়, যেমন গ্রামের মাতব্বর সাহেবরা যদি অবৈধ কাজ অর্থের বিনিময়ে করেন তবে তা ঘুষ পর্যায়ে গণ্য হবে।

প্রশ্ন : মানুষ কেন ঘুষ খায়? এর কারণ ব্যাখ্যা করবেন কি?

উত্তর : আমার কাছে এর প্রধান দুটি কারণ রয়েছে। আরো কারণ থাকতে পারে। লোভ একটি বড় ফ্যাক্টর। বিশেষ করে যখন কোনো অর্থশালী ব্যক্তি অর্থনৈতিক সুবিধা নেয়। যারা অভাবী নয় তারা ঘুষ নেয় লোভের কারণে। দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণে তারা এটি করে। এ মানসিকতাও কাজ করে যে, যদি টাকা থাকে মানুষ আমাকে সম্মান করবে, যা আদৌ সত্য নয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে অভাব। আমাদের নিম্ন পর্যায়ের কর্মচারীরা বিশেষ করে গার্ড, পিয়ন, ক্লার্ক, নিম্নপর্যায়ের অফিসারদের ঘুষ খাওয়ার বড় কারণ হচ্ছে অভাব। তারা হয়তো প্রথমে ঘুষ খেতে চান না, পরে আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যায়। তাদের দ্বিধা ভেঙে যায়, বিবেক মরে যায়। আমাদের নিম্নবিত্তদের বেতন আসলেই প্রাইস লেভেলের তুলনায় খুব কম। টাকার অংকে হয়তো বেতন বাড়ছে। দ্রব্যমূল্যের দামও সাথে সাথে বাড়ছে। জিডিপির গ্রোথ প্রপারলি ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে না। বেশিরভাগ উচ্চশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর লোকজন পাচ্ছে, নিম্নশ্রেণীর লোকজন পাচ্ছে না।

আমাদের দেশে সোস্যাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা নেই। এটি একটি বড় ফ্যাক্টর। সরকারি কর্মচারীদের জন্য সোস্যাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হবে। ঘুষ কমাতে হলে এটি

www.pathagar.com

প্রয়োজন। সিকিউরিটির ব্যবস্থা না থাকার কারণে যার ঘুষ খাওয়ার দরকার নেই, সেও ঘুষ খায়। সে মনে করে আজ হয়তো বেতনের টাকায় চলছে, যখন চাকরি থাকবে না তখন কী হবে?

গোটা জাতির যদি সোস্যাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা হয় তবে ঘুষ খাওয়ার প্রবণতা কমে যাবে। ইউনাইটেড স্টেটসের একটি ভালো দিকের কথা বলতে হয়, তাদের কেউ চাকরি হারালে শীঘ্রই সে অন্য কোথাও চাকরি পেয়ে যায়। চাকরি না পেলে সোস্যাল সিকিউরিটির আওতায় চলে যায়। অথচ এটি আমাদেরই হওয়া উচিত ছিল। যে জাতির সালাতের পর দ্বিতীয় ইনস্টিটিশন হচ্ছে যাকাত, তাদের এটি আগেই হওয়া উচিত ছিল। যাকাতের মাধ্যমে আমরা সোশ্যাল সিকিউরিটি ফর দি মুসলিম করতে পারতাম। তেমনিভাবে, নন-মুসলিমদের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। সোশ্যাল সিকিউরিটি না থাকার কারণে ঘুষ হচ্ছে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন কারণের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা। শিক্ষার মধ্যে নৈতিক উপাদান কম। নৈতিক উপাদান থাকলে যারা শিক্ষিত তাদের মধ্যে ঘুষের প্রবণতা কম হতো।

প্রশ্ন : ঘুষ আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে?

উত্তর : ঘুষের প্রভাব নানা ধরনের। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সব কাজে ডিলে (বিলম্ব) হচ্ছে। টাকা না দিলে কাজ হয় না। রুটিন কাজগুলো হতে দেরি হচ্ছে। প্রতিটি কাজেই একই অবস্থা। আমাদের উন্নয়নের গতি শ্লথ হয়ে পড়ছে। গোটা জাতির উন্নয়নকে পিছিয়ে দিচ্ছে। এজন্য উন্নয়নে একটি বিরাট ক্ষতি হচ্ছে। যে ধরনের কোয়ালিটি হওয়া দরকার ঘুষের কারণে সেটি হচ্ছে না। আবার ঘুষের কারণে বাজে কাজ করেও বিল নিয়ে নিচ্ছে। একদল অফিসার ঘুষ নিয়ে প্রজেক্ট পাস করিয়ে দিচ্ছে। গোটা জাতি বিলম্ব-চক্রের (Delay Trape) হাতে পড়েছে ঘুষের কারণে। আবার গোটা জাতির উন্নয়ন মানসম্পন্ন হচ্ছে না। মানুষের উপর নির্যাতন হচ্ছে, যারা টাকা দিতে পারে না তাদের কাজ হচ্ছে না। তাদের হক নষ্ট হচ্ছে। সুতরাং এর প্রভাব সার্বিক।

প্রশ্ন : ঘুষ এখন অনেকটা সিস্টেমে পরিণত হয়েছে। এজন্য কি কেবল নৈতিক অবক্ষয়ই দায়ী, না অন্য কিছু?

উত্তর : এটি ঠিক, ঘুষ অনেকটা সিস্টেমে পরিণত হয়েছে। এটি আমাদের দুর্ভাগ্য। ঘুষ ছাড়া কাজ হচ্ছে না বা কম হচ্ছে। এসব কথাও আসছে ওমুক জায়গায় না গেলে, ওমুক জায়গায় টাকা না দিলে, ওমুক জায়গার ক্লিয়ারেন্স না পেলে কাজ পাওয়া যাবে না। এটি একটি খারাপ দিক। এটি ভেঙে ফেলা ছোটখাট ব্যাপার নয়। এজন্য শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজন। প্রথমে কেবিনেট দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। তারপর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। সরকারের সেক্রেটারি পর্যায়েও সৎ হতে হবে। এ পর্যায়ে যারা আছেন তাদের আগে দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। সরকারের উপরের লেভেলে প্রথম তিন-চার জনকে অবশ্যই দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। তারা যদি আগে দুর্নীতিমুক্ত হন তবে শীঘ্রই পরিবর্তন আসবে।

ঘুষের জন্য নৈতিক অবক্ষয়ই শুধু দায়ী এটি ঠিক নয়। চাইলে সবকিছু নৈতিক অবক্ষয়ের সাথে সংযুক্ত করা যায়। চাইলে সবকিছু অভাবের সাথে সংযুক্ত করা যায়। চাইলে সবকিছুকে সোস্যাল সিকিউরিটির সাথে যুক্ত করা যায়। কিন্তু সবকিছুকে এক বাস্কেটে না রেখে আলাদা আলাদা রাখা ভালো। শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি, নৈতিকতা না থাকা একটি ফ্যাক্টর, দারিদ্র্য একটি ফ্যাক্টর, সোস্যাল সিকিউরিটি একটি ফ্যাক্টর। যে কোনো একটি ফ্যাক্টরকে ওভার এমথেসিস বা অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া ঠিক হবে না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ঘুষ বন্ধে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি?

উত্তর : এজন্য আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। আমরা বলতে পারি শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা আনতে হবে, সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিম চালু করতে হবে, দারিদ্র্য দূর করতে হবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে হবে। আমাদের রাজনীতিকে সুস্থ করতে হবে। আমাদের কোনো কিছুই ঠিক হবে না যদি আমাদের রাজনীতি সুস্থ না হয়। বর্তমানে ইংল্যান্ডে তাদের অন্যান্য দুর্বলতা, অন্যায় অবিচার সত্ত্বেও তাদের লিডারশিপ অনেস্ট। পলিটিক্স অনেস্ট। এটি জার্মানীর বেলায় যেমন সত্য, ফ্রান্সের ব্যাপারেও সত্য। আমাদের এটির উপর জোর দিতে হবে। জাতি যদি কিছু করতে চায় তবে একটি অনেস্ট পার্টিকে ক্ষমতায় আনতে হবে। অনেস্ট গভর্মেন্ট প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সামছুল আরেফীন
প্রকাশকাল : ৮ মে ২০০৪, দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

খুচরা পর্যায়ে যেভাবে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে তা বিকৃতির নামান্তর

প্রশ্ন : ভ্যাট সেলের চেয়ারম্যান হিসেবে আপনি ভ্যাট পদ্ধতি চালুর ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছেন। এখন যেভাবে অংক নির্ধারণ করে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে তা ভ্যাট প্রচলনের মূল চেতনার সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ?

উত্তর : ভ্যাটের ফলে বাংলাদেশের রাজস্ব অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এখনো এর পুরোপুরি সুফল পাইনি। এর কারণ প্রধানত দু'টি। প্রথমত, এ বৈজ্ঞানিক কর পদ্ধতিকে যেভাবে খুচরা পর্যায়ে (রিটেইল) নিয়ে যাওয়া দরকার ছিল, সেভাবে আমরা নিয়ে যেতে পারিনি। ১৯৯১ সালে ভ্যাট ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। তারপর ১৩/১৪ বছর পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা ভ্যাটকে সেভাবে রিটেইল পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারিনি। এর কোন সদুত্তর নেই। গত ৪/৫ বছরে এটি করা উচিত ছিল। তার পরিবর্তে যেটি করা হয়েছে খুচরা পর্যায়ের দোকানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভ্যাট ধরা হচ্ছে। এটি মূলত ভ্যাট নয়, এটি হচ্ছে এক ধরনের বিকৃতি। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অন্য সব দেশে যেভাবে খুচরা পর্যায়ে ভ্যাট ধার্য করা হয়, সেভাবেই করতে হবে। এ ব্যাপারে পুনরায় আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ভ্যাট বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেয়া যায়। দ্বিতীয়ত, ভ্যাটের সুফল পুরোপুরি পেতে হলে অডিট ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে গড়ে তুলতে হবে। ইনপুট-আউটপুট অনুপাত এবং ক্রাইটিরিয়ার ভিত্তিতে আউটপুট পূর্ণরূপে নির্ধারণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। যাতে ভ্যাট ফাঁকিরোধ করা যায়।

প্রশ্ন : বিকৃতভাবে ভ্যাট আদায়ের মাধ্যমে সরকার কি বেশি রাজস্ব পাচ্ছে?

উত্তর : অধিক রাজস্ব পাবার দাবী মোটেও সত্য নয়। বরং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ না করার ফলে রিটেইল পর্যায় থেকে আশানুরূপ ভ্যাট আদায় হচ্ছে না। আমার মতে, রিটেইল পর্যায় ভ্যাট উপখাত থেকে এখন মাত্র ১০ শতাংশ রাজস্ব আদায় হচ্ছে। বাকি ৯০ শতাংশ ভোক্তারা পরিশোধ করলেও অনাদায়ী থেকে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : রাজস্ব জিডিপি অনুপাত বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার পক্ষ থেকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার?

উত্তর : এ অনুপাত বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে করহার বৃদ্ধি করতে হবে। যারা বলেন, দুর্নীতি বন্ধ করে কর বৃদ্ধি করা সম্ভব, তারা একটি মৌলিক সত্যকে বুঝতে পারছেন না। তা হচ্ছে, হঠাৎ করে বাংলাদেশের দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। এমনকি স্বল্পমেয়াদেও সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

আমাদের যে নৈতিক পতন হয়েছে, তা ঠিক করতে বা শোধরাতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা লাগবে। স্বল্পমেয়াদে আমাদের রাজস্ব বৃদ্ধি করতে হলে করহার যেখানে-যেখানে সম্ভব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আমাদের ভ্যাটহার হ্রাস করা সম্ভব নয়। আমদানী শুল্ক হচ্ছে দেশের শিল্পকে প্রটেকশন দেয়ার জন্য। সুতরাং প্রটেকশন ও রাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে করহার বৃদ্ধি করতে হবে। বিগত ১৫ বছর ভ্যাটহার একইহারে রয়েছে। এটিকে কিছুটা হলেও বৃদ্ধি করা সঙ্গত হবে। তবে রাজস্ব ব্যাপক বৃদ্ধি পেতে পারে যদি পূর্বের আলোচনা মতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভ্যাটকে রিটেইল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে আমাদের বেশি কর দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাছাড়া অপচয়রোধ করাও প্রয়োজন। জনপ্রশাসন (পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) ছোট করে আনতে হবে। এসব ব্যাপারে জাতীয়ভাবে বিশেষ করে, প্রধান দলসমূহের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা দরকার। তা না করা হলে এসব ইস্যুকে রাজনৈতিক বিবেচনায় বিচার করা হবে। তা জাতির জন্য সুখকর হবে না।

প্রশ্ন : আমদানী খাতের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আভ্যন্তরীন খাত থেকে রাজস্ব বাড়ানো হলে স্থানীয় খাতের প্রতিযোগিতাশীলতা হ্রাস পাবে বলে মনে করা হচ্ছে - এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : আমি তা মনে করি না। আমদানী শুল্ক প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় শিল্পকে প্রটেকশন দেবে। আমদানী শুল্কের ফলে বিদেশী পণ্য দেশী পণ্যের তুলনায় অধিকমূল্যের হয়ে যায়। এর ফলে দেশীয় শিল্পের টিকে থাকার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেহেতু কাঁচামালের ওপর শুল্ক সবসময় ফিনিশড গুডসের তুলনায় কম হয়। সুতরাং কোন অবস্থাতেই আমদানী শুল্ক দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতাশীলকে নষ্ট করে না, বরং বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন : শুল্কস্তর তিনটিতে নেমে আসলে স্থানীয় শিল্প প্রটেকশন পাবে কি?

উত্তর : স্তরের ব্যাপারগুলো কর ব্যবস্থার জন্য এত মৌলিক নয়। বর্তমানে চার স্তর নির্দ্বিধায় অব্যাহত থাকতে পারে। এমনকি প্রয়োজনে পাঁচ স্তর করা যেতে পারে। এসব বিতর্ক হচ্ছে মূল সমস্যা বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে নজর সরিয়ে নেয়া।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সাজ্জাদ আলম খান
প্রকাশকাল : ৮ জুন ২০০৪, দৈনিক ইনকিলাব

www.pathagar.com

সঠিকভাবে কর সংগ্রহ করা হলে দেশীয় সম্পদ দিয়েই উন্নয়ন বাজেট তৈরি করা সম্ভব

প্রশ্ন : ২০০৪-০৫ সালের অর্থবাজেটসহ জাতীয় সংসদে এ পর্যন্ত দশটি বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। জাতীয় স্বার্থ এবং জনস্বার্থের গুরুত্ব বিবেচনায় কোন বাজেটটি সর্বাপেক্ষা উত্তম বলে মনে হয়েছে আপনার?

উত্তর : এটি অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে অর্থমন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে জাতীয় সংসদে ১০টি বাজেট উপস্থাপন করা যেমনি অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় তেমনি একই সঙ্গে কঠিন। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় থেকে বিএনপি সরকারের বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্থমন্ত্রণালয়ের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে টিকে থাকা অবশ্যই সৌভাগ্যের। তবে আমি এটিও বলবো কোনো ব্যক্তি কিংবা কোনো জাতির কল্যাণের জন্য এটি কোনো বিচার্য বিষয় নয় যে কে কয়টি বাজেট পেশ করেছেন। বাজেটের সংখ্যা দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে বিচার করা যায় না; সে কারণে আমি সেটি করতেও চাই না। দেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় যে কোনো রাজনৈতিক সরকারের প্রদত্ত বাজেটকে আমি জাতীয় স্বার্থ ও জনস্বার্থের বাজেট বলেই মনে করি। আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রধান দলগুলো দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধ। তাই বিএনপি সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে এম সাইফুর রহমান কর্তৃক পেশকৃত বাজেটের প্রত্যেকটিকেই আমি সময়ের বিবেচনায় যথার্থ বলে মনে করি। ৮০ দশক থেকে দেয়া এ সকল বাজেটের প্রতিটিই সে সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে উত্তীর্ণ। এ বিষয়ে তিনিও নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, প্রত্যেকটি বাজেটেই তৈরি হয়েছিল সময়ের প্রয়োজনে এবং বাস্তব চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে।

প্রশ্ন : ২০০৪-০৫ সালের পেশকৃত বাজেটকে গ্রামমুখী বাজেট হিসেবে উল্লেখ করেন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান। আপনি কি বলবেন, এ বাজেট গ্রামীণ জনজীবনে কতটা অর্থবহ হবে?

উত্তর : আমি শুধু একথা বলবো যে গ্রামের উন্নয়ন এক বছরে হয় না। একটি বাজেটের মেয়াদ হলো এক বছরের জন্য। এর মাধ্যমে সামগ্রিক পরিবর্তন আশা করা যায় না এবং তা হবেও না। আমরা একটি ধারাবাহিকতায় চলছি বা চলবো। এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করেই তিনি চেষ্টা করেছেন আগের তুলনায় সম্পদকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে আরেকটু বেশি প্রবাহিত করার। এজন্য তিনি কৃষিতে ৫শ' কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করেছেন, যাতে গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা অধিক লাভবান হতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচনে এমন পদক্ষেপই

www.pathagar.com

তিনি নিয়েছেন, যাতে সারা দেশের মানুষই লাভবান হতে পারে। শিক্ষাখাতে যে বরাদ্দের প্রস্তাব তিনি করেছেন এ থেকেও গ্রামীণ জনগণই অধিক লাভবান হবে। আমি বলবো তার সরকারের আমলে দেয়া দশটি বাজেটের প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য বিমোচন, এটিও তাই। তবে এ বাজেটে গ্রামমুখী সম্পদ প্রবাহ একটু বেশি। একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, এর সবকিছু নির্ভর করছে উন্নয়নের ওপর। সরকারি উন্নয়ন বাজেটে যে বরাদ্দ রাখা হয়; তার চেয়েও কয়েকগুণ বেশি অর্থের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয় বেসরকারি খাতে। বেসরকারি খাত শিল্পোন্নয়নে হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তরা যে অর্থ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যয় করবে সেটির হিসাব তো এ বাজেটে নেই; কিংবা গ্রামীণ উদ্যোক্তারা কৃষিতে যে বিনিয়োগ করবে সেটিও এ হিসাবে নেই। তাই উন্নয়ন নির্ভর করবে বেসরকারি খাত কতটা সঠিক, প্রাণবন্ত, চঞ্চল তার ওপর। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়নে সরকারি বরাদ্দের কয়েকগুণ বেশি অর্থ ব্যয় করছে বেসরকারি খাত। আমরা যাতে এটি মনে না করি যে, দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এডিপির ২২ হাজার কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

প্রশ্ন : ২০০৪-০৫ অর্থবছরের পেশকৃত বাজেটকে প্রতারণার বাজেট হিসেবে উল্লেখ করেছেন সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া; বিগত সরকারের অর্থমন্ত্রীর এ বক্তব্যকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

উত্তর : সাবেক অর্থমন্ত্রীর অধীনে সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলাম আমি। তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই, সাবেক অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যটি যুক্তিযুক্ত হয়নি। এটি আসলে বাজেটের রাজনৈতিক মূল্যায়ন, অর্থনৈতিক নয়। মন্তব্যটি শুধু পলিটিক্যাল নয়; বলতে হবে ওভার পলিটিক্যাল। আমার মতে এ ধরনের মন্তব্য না করাটাই বাঞ্ছনীয় ছিল। গত ২৩ বছরের মধ্যে পেশকৃত ভালো বাজেটগুলোর অন্যতম এটি। সেখানে এ ধরনের নেতিবাচক মূল্যায়ন আমার মতে সঠিক নয়। তার চেয়ে ভালো হতো বাজেটের কোনটি ভালো এবং কোনটি মন্দ তা যদি তিনি উল্লেখ করতেন। আমরা আশা করবো সংসদে তিনি তা করবেন।

প্রশ্ন : অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান নিজেও উল্লেখ করেছেন যে, মোট দেশজ উৎপাদনে কর রাজস্বের অবদান অত্যন্ত কম। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান হিসেবে আপনি কি আমাদের বলবেন মোট দেশজ উৎপাদনে কর রাজস্বের অবদান বাড়াতে কী করণীয় রয়েছে?

উত্তর : আমরা বুঝতে পারি কর রাজস্ব হঠাৎ করে বাড়ানো সম্ভব নয়। অর্থমন্ত্রী নিজেও তা বোঝেন। যে কারণে ধীরে কর রাজস্ব বাড়ানোর পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি। করের আওতা সম্প্রসারণের কথা বলেছেন। এখন হয়তো জিডিপিতে কর রাজস্বের অবদান ১০.৫ অথবা ১০.৬ রয়েছে। এটিকে তিনি দশমিক ৫ ভাগে উত্তীর্ণ করে ধাপে ধাপে ১৫ শতাংশে পৌঁছানোর যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন তা অবশ্যই সঠিক পদক্ষেপ। মোট দেশজ উৎপাদনে কর রাজস্বের অবদান কম হওয়ার অন্যতম কারণ জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশ কর প্রদানে মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়। স্বল্পহারে কর প্রদান অথবা কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতাই এখনো সমাজে বিদ্যমান। জনগণকে বুঝতে হবে, আমরা যদি বিদেশী ঋণমুক্ত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অগ্রসর করতে চাই, বিদেশী ঋণ থেকে মুক্তি চাই, তাহলে আমাদেরকে নিয়মিত কর পরিশোধ করে দেশজ উৎসের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। এ উপলব্ধি এখন কিছুটা হলেও গড়ে উঠছে এবং সম্প্রসারিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের কথা বিবেচনা করে জনগণ যেভাবে পলিথিন বর্জন করতে সম্মত হয়েছে,

www.pathagar.com

টু'স্ট্রোকের গাড়ি বর্জনে সম্মত হয়েছে তেমনি জাতীয় সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের কথা বিবেচনা করে কর প্রদানেও এগিয়ে আসবে মানুষ। এ বিশ্বাস আমার রয়েছে। বিদেশী ঋণ এবং সাহায্যের কারণে বিদেশী সংস্থাগুলো যেভাবে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করছে তাতে দেশের মানুষও অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। দেশীয় সম্পদে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এগিয়ে আসার মানসিকতা রয়েছে জনগণের। যেটি পূর্বে ছিল না। বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর অনবরত হস্তক্ষেপ এবং চাপের কারণে জনগণ বিরক্ত। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। দেশের উন্নয়নের জন্য দেশের মানুষকেই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এটি এজন্যও বলা যে, মাননীয় অথমন্ত্রী কাস্টম ডিউটি যে হারে কমিয়ে এনেছেন এটি না কমালেও পারতেন। বিশ্বব্যাংক আইএমএফ-এর সুপারিশ রক্ষা করতে গিয়েই চার স্তরের স্থলে তিন স্তরের শুল্ক কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। এক সময়ে আরো অধিক স্তরে শুল্ক দেয়ার ব্যবস্থা ছিল তাতে জাতির ক্ষতি হয়ে যায়নি। আমদানি পর্যায়ে ৩০ শতাংশ ডিউটি অক্ষুণ্ন থাকলে রাজস্ব অনেক বাড়তো। আমাদের দেশীয় শিল্প কারখানা প্রোটেকশন পেতো। চোরাচালানের কারণে এমনিতেই দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে, তার ওপরে আমদানি শুল্ক হ্রাস দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নিরপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দিল। ২-৩ বা ৪ স্তর শুল্ক বাজেটের মূল ইস্যু নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে আমি নিজেও এ ধরনের বিদেশী চাপের মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমার সময়ে সাত স্তরে আমদানি শুল্ক ব্যবস্থা চালুর কথা বলা হয়েছিল। বর্তমানে তিন স্তরের শুল্ক ব্যবস্থা চালুর পর এক সময় প্রস্তাব আসবে এক স্তরে শুল্ক আরোপের। তারা চাপ দিয়ে যায় এবং বাধ্য করার চেষ্টা করে। এটি হচ্ছে তাদের কায়দা। যারা দুর্নীতি কমানোর মাধ্যমে কর রাজস্বের অবদান বাড়ানোর কথা বলেন, তাদের মতামতের প্রেক্ষিতে বলতে হয় যে, বর্তমান অবস্থায় সহসা দুর্নীতি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা দরকার যে, কর রাজস্ব বাড়ানোর জন্য আমাদের ভিএটি (ভ্যাট) রেটকে ১৫ থেকে ১৭ ভাগে উন্নীত করতে হবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শতকরা ২০-২৫ ভাগ পর্যন্ত ভিএটি ট্যাক্স রয়েছে। এক ভাগ বাড়ালেই কয়েক হাজার কোটি টাকা বেড়ে যায়। প্রয়োজনে কাস্টম ডিউটি বাড়াতে হবে। আয়কর দিচ্ছে না অনেকেই। আয়কর ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন : অর্থমন্ত্রী একদিকে জিডিপি বৃদ্ধির কথা বলেছেন, উন্নয়ন বাজেটে দেশীয় সম্পদের অবদান বৃদ্ধির কথা বলেছেন, অন্যদিকে আমদানি কর হ্রাস করে দেশীয় শিল্প-কারখানা ও দেশজ-সম্পদ সৃষ্টির উৎসকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছেন বলে অনেকের অভিমত; আপনি কী বলবেন?

উত্তর : আমি জানি না প্রোটেকশনের কি হবে। বিশ্বব্যাংক আইএমএফ তো চার স্তরের শুল্ক কাঠামো তিন স্তরে আনতে বলেছিল। ৩০ শতাংশ কাস্টমস ডিউটিতো কমাতে বলেনি। আর তারা বললেই বা আমরা মানবো কেন? আমাদের তো রাজস্বও দরকার। তিন স্তরের যুক্তিটা না হয় বুঝলাম; কাঁচামাল, মধ্যবর্তী মাল এবং তৈরি পণ্য। কিন্তু ৩০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে আমদানি শুল্কহার কমানোর যুক্তি কি? এটি মেনে নেয়ার প্রয়োজন না থাকলেও অর্থমন্ত্রী তা মেনে নিয়েছেন।

প্রশ্ন : জিডিপিতে-এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে অবশ্যই। আপনি কি বলেন?

উত্তর : নেতিবাচক প্রভাব বলতে রাজস্ব তো কমলোই। এটি থাকলে কর-জিডিপি হার হয়তো দশমিক এক শতাংশ বৃদ্ধি পেতো।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ২০০৪-০৫ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত উন্নয়ন বাজেটের ৫৬ শতাংশই বিদেশী ঋণের ওপর নির্ভরশীল। দেশীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিদেশী ঋণ সাহায্যের নির্ভরতা কমাতে আপনার পরামর্শ কী?

উত্তর : আমরা মনে হয় দু'টি কাজ করলে এ নির্ভরতা কমতে পারে। প্রথমত, এডিপির আকার কমিয়ে আনা এবং দ্বিতীয়ত কর রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা। আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুপাতে এডিপির আকার নির্ধারণ করলে বিদেশী ঋণ এবং সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে যাবে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২২ হাজার কোটি টাকার স্থলে ১৭-১৮ হাজার কোটি টাকা হলেই পর নির্ভরশীলতা কমে আসবে। আমি ইতোপূর্বেই হিসাব দিয়েছি। ১ শতাংশ ভিএটি বাড়ালেই রাজস্ব দেড় থেকে দু'হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে। কাস্টমস ডিউটি না কমালে আরো ৫শ' থেকে ১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পেতো। এ হিসাব থেকে মিলিয়ে দেখলেই তো বোঝা যাবে দেশীয় উৎস নির্ভর উন্নয়ন বাজেট কীভাবে সম্ভব। যেভাবে আমি বললাম এভাবে সরকার অগ্রসর হলে আগামী এক দশক পরে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণমুক্ত উন্নয়ন বাজেট তৈরি সম্ভব। তখনও আমরা ঋণ নেব; কিন্তু সেটি আমাদের বিশেষ প্রয়োজনকে সামনে রেখে। কোনো শর্ত মেনে অবশ্যই নয়। যেমন ভারত বর্তমানে শর্ত মেনে ঋণ গ্রহণ বন্ধ করেছে।

প্রশ্ন : কর প্রদানে অনাগ্রহ এবং কর ফাঁকির প্রবণতা প্রায় আলোচিত হয়; সাধারণ জনগণ তো বিভিন্ন স্তরে কর দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করছে। আপনার মতে কর ফাঁকি দিচ্ছে কারা?

উত্তর : আয়কর ফাঁকি দেয়ার কথা বলা হয়ে থাকে মূলত। লাখ লাখ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আয়কর দিচ্ছে না। আমাদের দেশের অসংখ্য লোক আয়কর ফাঁকি দিচ্ছে। এটি মানতে হবে। কর না দেয়ার অজুহাত হিসেবে কর বিভাগের দুর্নীতির কথা বলা হয়ে থাকে; কিন্তু এটি হলো নিজের অন্যায় মনোভাবকে সমর্থন করার কথা। কর না দেয়া বা ফাঁকি দেয়ার যুক্তি। কর না দেয়ার অজুহাতে বলা হয় ট্যাক্সের লোক চোর। ওদের খাতায় নাম উঠলে বিপদ হবে। ট্যাক্সের আওতায় থাকা হাজার হাজার লোক যদি সবকিছু মেনে নিয়ে ট্যাক্স দিতে পারে তাহলে, অন্যরা দিবে না কেন?

প্রশ্ন : বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতি, বেকারত্ব, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাকে বিবেচনায় রেখে ২০০৪-০৫ সালের বাজেট সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন আশা করছি?

উত্তর : একটি ভালো বাজেট। বিভিন্ন খাতের বরাদ্দ অত্যন্ত ভালো। দু'টি ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে বলে আমার মনে হয়, এর একটি হলো এডিপির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না, অন্যটি হলো রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা কঠিন হবে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে বাজেট ভালো। চারদিকের চাপের মধ্যে অবস্থান করেও অর্থমন্ত্রী যে বাজেট উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন তার জন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : রিয়াজ রহমান ও কামাল আহসান
প্রকাশকাল : জুন ২০০৪, এশিয়া ডাইজেস্ট

www.pathagar.com

ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংক শুরুর কাহিনী সম্পর্কে কিছু বলুন। কীভাবে এর যাত্রা শুরু হয়?

উত্তর : ইসলামী ব্যাংকের বিশ্বব্যাপী শুরুর ব্যাপারটা এক ইতিহাস আর বাংলাদেশে এর শুরু অন্য ইতিহাস। এখানে একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। এটি একটি গবেষণার বিষয় যে, রাসূল (স)-এর যুগে বা খোলাফায়ে রাশেদার কিংবা আব্বাসী, উমাইয়া যুগে কোনো ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ছিল কি না। কারণ এটি তো ঠিক যে ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল এবং এ প্রেক্ষিতে প্রয়োজন মিটানোর জন্য, আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য ব্যবস্থা ছিল। বর্তমান সময়ে আধুনিক ধারণায় মোটামুটিভাবে মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী ব্যাংকিং শুরু হয় অপারেশনাল ফর্মে অর্থাৎ বাস্তবে। এ সম্পর্কিত পেপারস, যার ভিত্তিতে আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং শুরু হয়েছে তা আরো আগে তৈরি হয়েছে। এ তো গেল শুরুর কথা।

আমরা জানি গত ৫০ বছরে ইসলামী ব্যাংকিং বিশ্বব্যাপী ক্রমেই অগ্রসর হয়েছে। ব্যাংকিং জগতে বড় শাখায়, বড় স্রোতে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের শুরুর কথা বলতে হলে আমি বলবো যারা ইসলামকে বিশ্বাস করে, ভালোবাসে এমন প্রতিটি লোক ভাবছিল যে, আধুনিক ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্ভব হবে না, আধুনিককালে ইসলামী অর্থনীতি সম্ভব হবে না, যদি না আমরা ইসলামিক ব্যাংকিং শুরু করতে পারি। এ চিন্তা সবার মনেই ছিল। এ প্রসঙ্গে অনেকেই লিখেছেন, তার মধ্যে ড. আনোয়ার ইকবাল কোরেশী ও সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী অন্যতম। এসব লেখা শুরুর দিকে।

বাংলাদেশে এ ব্যাপারে প্রথম কার্যকর উদ্যোগ নেন জনাব আজিজুল হক সাহেব। তিনি এ বিষয়ে যোগাযোগ শুরু করেন, পাশাপাশি ট্রেনিং শুরু করেন ভবিষ্যৎ ব্যাংককে সামনে রেখে। অন্যদিকে ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো গড়ে ওঠে। তারাও এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে। আজিজুল হক সাহেব, ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো ও অন্যদের উদ্যোগে শিল্পপতি বা যারা মূলধন দিতে পারেন তাদের নিয়ে একটি গ্রুপ গঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনেক চেষ্টার পর লাইসেন্স পাওয়া যায়। প্রথম শাখা মতিঝিলে শুরু করা হয়। যেখানে এখনো লোকাল অফিস আছে। আমরা যারা এ ব্যাংক শুরু করেছিলাম, এ ব্যাপারে মোটেও নিশ্চিত ছিলাম না যে এই ব্যাংকটি কী সাকসেসফুল হবে, না হবে না।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে, যেটা হলো যে, প্রতিটি ফর্মকে নতুন করে ডিজাইন করতে হলো। ব্যাংকিং-এর মূল কাঠামোটি আধুনিক ব্যাংকিং থেকে নিয়ে নেয়া হলো। তবে এটিকে ইসলামাইজ করার দরকার ছিল। এর একটি দিক হলো ব্যাংকিং-এর যে ফরম (কাগজ) ব্যবহার করা হয়, ফরম শতশত, এগুলোকে ইসলামাইজ করা প্রয়োজন ছিল, নতুন করে লেখার দরকার ছিল। সে কাজগুলো করা হয়। যেহেতু ওই সময় পর্যন্ত (যখন আমরা ব্যাংকিং শুরু করি) কি ধরনের ডিপোজিট হবে, কি ধরণের ইনভেস্টমেন্ট হবে, মোটামুটি আরব বিশ্বে চালু হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাই। আমরা যেটা করি, শুরুতে ব্যাংকারদের মধ্যে যারা ইসলামের ব্যাপারে আগ্রহী, তাদেরকে মোটামুটিভাবে ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং-এর নীতিমালার উপর ট্রেনিং দিয়ে কাজে নেই। এভাবে ইসলামী ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে এটি সাকসেসফুল হয়।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলামী ব্যাংকের বর্তমান অবস্থান কোথায়?

উত্তর : একটি হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের অবস্থান অপরটি হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবস্থান। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ একটি বড় ব্যাংক হয়েছে। ১৪০-এর উপর তার শাখা, ৭ হাজার কোটি টাকার উপর ডিপোজিট, এসব মিলে ইসলামী ব্যাংকের অবস্থান বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে সবার শীর্ষে। সুতরাং বলতেই হয় ইসলামী ব্যাংকের অবস্থান ভালো।
আবার আরো চারটি ইসলামী ব্যাংক আছে, অনেকগুলো ব্যাংকের শাখা হয়েছে, এসবগুলো মিলে ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টরের অবস্থাও ভালো। ইসলামী ব্যাংকিং সেক্টর এগিয়ে যাচ্ছে। তার ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হচ্ছে, তার সমস্যা কমছে।

প্রশ্ন : আধুনিক অর্থনীতিতে ইসলামী ব্যাংক একটি নতুন নিরীক্ষা। নীরিক্ষার সমস্যা ও সাফল্য সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : অবশ্যই ইসলামী ব্যাংকিং একটি নতুন নিরীক্ষা। আর সাফল্য বিশ্বব্যাপী। বলা হচ্ছে, প্রতিবছর ২০ থেকে ৩০ ভাগ প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। যদি সফল না হতো তবে এটি সম্ভব হতো না।
মাল্টিন্যাশনাল ব্যাংকগুলো যেমন এইচএসবিসি, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক তারা ইসলামী ব্যাংকিং-এর শাখা খুলছে। কেউ কেউ বলবেন তারা লাভের জন্য করছে। যাই হোক না কেন তারা কিন্তু ওই শাখাগুলো ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক চালানোর চেষ্টা করছে। এজন্য শরীয়াহ কাউন্সিলও গঠন করছে। এতে অনেক বড় বড় আলেম আছেন। এ সবকিছুই সাফল্যের ইঙ্গিত বহন করে।
এতোদিন এ প্রশ্নটি ছিল, সুদ ছাড়া ইসলামী অর্থনীতি কীভাবে চলবে? তাই বলা হতো ইসলামী রাষ্ট্রও সম্ভব নয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাফল্যে এ প্রশ্ন এখন উঠে গেছে। এ সাফল্য আগামী দিনে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। রাজনৈতিক সরকার চাইলে এখন ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে পারবে। ব্যাংক হয়েছে। মনিটরিং পলিসির মূলনীতি কি হবে তা আমরা জানি। ওমর চাপড়াও গবেষণা করেছেন। করনীতি, ব্যয়নীতি সুস্পষ্ট হচ্ছে। আমি বলবো ইসলামী অর্থনীতির বিষয়গুলো ক্রমেই সুস্পষ্ট হচ্ছে।
বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সাথে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সম্পর্ক ভালো হয়েছে, জনমনে অস্পষ্টতা দূর হয়েছে, রাজনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর স্বাভাবিক গতিধারাকে তা ব্যাহত করতে পারবে না।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বিনিয়োগ ও ব্যবসার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের সাফল্যের কারণ কি কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে বলা হলে হয়তো নানাকারণ বেরিয়ে আসবে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাফল্য বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর সাফল্যের কারণ কি? কেননা সকল ইসলামী ব্যাংক সমানভাবে সফল নয়। আমি সেদিকে না গিয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর সাফল্যের কারণ বলবো। এর কারণ হচ্ছে এর উদ্যোক্তারা সৎ ছিলেন, সচেতন ছিলেন। এর অফিসাররা সৎ ও ইফিসিয়েন্ট ছিলেন। পাশাপাশি তারা ইসলামী জনগোষ্ঠীর সমর্থন পেয়েছেন। তারা মানসিকভাবে তৈরি ছিলেন একটি ইসলামী ব্যাংকের জন্য। ইসলামী ব্যাংকের পদ্ধতিগুলো উন্নত, সহজ, কল্যাণমূলক এবং ব্যবসা-বানিজ্যে সহযোগী কার্যক্রমও অসুবিধাজনক নয়। ফলে বিনিয়োগ ও ব্যবসার ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। আর একই কথা সবগুলো সফল ইসলামী ব্যাংকের বেলায়ও প্রয়োজ্য। ২/১টি ব্যাংকের কথা আলাদা যারা সাময়িক অব্যবস্থাপনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রশ্ন : গ্রাহক সেবার ক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকের স্বতন্ত্র কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কি?

উত্তর : আমার মনে হয় ব্যাংকিং সেবার ক্ষেত্রে আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য আছে বলে আমি বলতে চাই না। সেবা মোটামুটি ধরনের। আরো উন্নত হওয়া দরকার। আমি চেয়ারম্যান হিসেবে বলতে পারি, লোকজন আমার কাছে অভিযোগ করে। তাই এ ক্ষেত্রে আমাদের আরো ভালো কিছু করতে হবে এবং ইসলামের যে শিক্ষা-ইহসান করবে, ভালো ব্যবহার করবে, এটি মূলনীতি হওয়া উচিত। সকলের সাথে ভদ্র আচরণ করা, ইফিসিয়েন্সি দেখানো, সেগুলো ইসলামী ব্যাংক করার চেষ্টা করে বলে আমি মনে করি। কিন্তু আরো ভালো করা উচিত। এজন্য বিশেষ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দাবি করছি না।

প্রশ্ন : ইসলামী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক পরিচালনায় জনশক্তিকেও ইসলামী আদর্শে অনুসারী হওয়া প্রয়োজন বলে কি আপনি মনে করেন?

উত্তর : হওয়া উচিত। যেহেতু ব্যাংক একটি আদর্শভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং তাদের ইসলামী আদর্শের অনুসারী হওয়া উচিত। যতটুকু বাহ্যিকভাবে বুঝি আমাদের জনশক্তি ইসলামের অনুসরণ করে। আর মনের ব্যাপারে তো আল্লাহ জানেন। তার বিচার আল্লাহর হাতে। অন্যান্য ইসলামী বাংকে সাধ্যমতো চেষ্টা করা হয় যাতে জনশক্তি ইসলামকে মেনে চলে। মেয়েদের ক্ষেত্রে এটিও চেষ্টা করা হয় যাতে তারা হিজাব পালন করে। আর এগুলো আমরা চেষ্টা করি কোনোরকম জোরজবরদস্তি ছাড়াই উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে। অনেক ইসলামী ব্যাংকে অমুসলিম কর্মচারী আছে যারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। তাদের কাছ থেকে আমরা আশা করছি, তারা ইসলামী ব্যাংকিং-এর নীতিমালা অনুসরণ করবে।

এটিও মনে রাখতে হবে ইসলামী ব্যাংকিং গোটা মানবজাতির জন্য। ইসলামী রাষ্ট্র গোটা মানবজাতির জন্য। তাই মনে রাখতে হবে, তাদের উপর ইসলাম চাপিয়ে দেয়া যাবে না। ইসলামী প্রতিষ্ঠানে তাদের কাজ করার সুযোগ থাকতে হবে, তাদের বেনিফিট পাওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। যদি না থাকে তাহলে ইসলামের সামগ্রিকতা হারাবে। আল্লাহর বাতাস, পানি, যেমন সবাই পায়, এখানে মুসলিম-অমুসলিম দেখা হয় না। তেমনি ইসলামী ব্যাংকিং-এর সেবা সবাইকে পেতে হবে। এটি মনে রাখা বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : আধুনিক জগতে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত এ ব্যাংকিং ব্যবস্থা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কতটুকু প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : অন্যান্য ব্যাংক যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে, ইসলামী ব্যাংকগুলোও রাখছে। উদাহরণ হিসেবে ইসলামী ব্যাংক লিঃ-এর সম্পর্কে বলা যায় এ ব্যাংক আমদানি-রফতানিতে মূল্যবান ভূমিকা রাখছে, শিল্প উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে, তাদের মেশিনারি কিনে দিচ্ছে, মেটেরিয়াল কিনে দিচ্ছে এবং স্থানীয় ব্যবসা উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখছে। গ্রাম উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। অন্যান্য ব্যাংকের সেবার তুলনায় ইসলামী ব্যাংক ভালো করছে। সুতরাং আমি বলবো অর্থনীতির ক্ষেত্রে এর প্রভাব ভালো, খুবই ভালো।

প্রশ্ন : ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইসলামী নীতির পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারছে কি?

উত্তর : পারছে। এক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। কারণ গত ৫০ বছরে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নীতিমালা ডেভেলপ হয়েছে। সমস্যা চিহ্নিত করা গেছে, সমাধানও তৈরি হয়েছে। ইসলামী ফিকাহবিদগণ যারা ব্যাংকিং বোঝেন তারা এর সমাধান বের করে ফেলেছেন। আস্তে আস্তে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো ইসলামী ব্যাংকগুলোর সমস্যা বোঝার চেষ্টা করছে। তাদেরও সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই সমস্যা নেই বললেই চলে। সামান্য ছোটখাট সমস্যা রয়ে গেছে। বড় ধরনের কোনো সমস্যা ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে নেই।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সনাতনী পদ্ধতির চেয়ে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৃহত্তর ভূমিকা রাখতে সক্ষম?

উত্তর : অবশ্যই। আমার তো বিশ্বাস তাই। আমি মনে করি ইসলামী ব্যাংকিং সুপিরিয়র, অন্যান্য ব্যাংকের তুলনায় উন্নত। কেননা ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিনিয়োগ পদ্ধতি অনেক রকম। যেখানে সনাতনী ব্যাংকের পদ্ধতি মূলত একটিই, সেটি হচ্ছে সুদ। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে আমরা ব্যবসায় শরিক হই। তাই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের সরাসরি সুপারভিশন থাকে। সেজন্য অর্থ ডাইভার্ট করা সম্ভব হয় না। যে পদ্ধতিগুলো এখন অনুসরণ করা হচ্ছে তার মধ্যে আছে বাইমুয়াজ্জাল ও মুরাবাহা। মাল কিনে বেচা হয়। এক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংক সুপিরিয়র। কেননা সনাতনী ব্যাংক টাকা দিয়ে দেয়। টাকা দিলে অনেক সময় টাকা ডাইভার্ট করা সম্ভব হয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক যেহেতু মাল কিনে দেয় তাই এটি সম্ভব হয় না। কম সম্ভব হয়। ফলে ইসলামী ব্যাংকে খারাপ ঋণ কম হয়। আরেকটা দিক আছে যা গ্রাহকদের কাজে লাগে তা হচ্ছে সুদ তো বছরে বছরে বাড়তে থাকে, কিন্তু মুরাবাহ বা বাই মুয়াজ্জাল মাল কিনে বেঁচে দেয়া হয়, যে মূল্য নির্ধারণ করা হয় তা আর বাড়ানো সম্ভব নয়। যেমন: ব্যাংক ১ কোটি টাকার মাল ১ কোটি দশ লাখ টাকায় বিক্রি করল, এ টাকা যদি সে নাও দিতে পারে আমি তা বাড়াতে পারি না। ফলে চক্রবৃদ্ধি সুদের যে জ্বালা-যন্ত্রণা তা ইসলামী ব্যাংকে হয় না। এজন্য সনাতনী ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংক মূলতই সুপিরিয়র। আর মুদারাবা ও মুশারাকার শ্রেষ্ঠত্ব আরো বেশি।

প্রশ্ন : বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ কি? ইতোমধ্যে বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ব্যবসায় যে সফলতা অর্জিত হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : ভবিষ্যৎ ভালো। বর্তমানে এর মূলধন ৬ হাজার বিলিয়ন ইউএস ডলারের চেয়েও বেশি। এটি অবশ্য এক বছর আগের কথা। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক একটি বড় ব্যাংক ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এটি আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক স্বীকার করেছে। এরা কখনোই ইসলামের পক্ষের

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠান নয়। তারপরও তারা ইসলামী ব্যাংকগুলোকে স্বীকার করছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রতিটি দেশে নিজ নিজ শিল্প উন্নয়নে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, আন্তর্জাতিক ব্যবসা উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। যদি সরকারগুলো আরো সহযোগিতা করে তবে এর ভূমিকা আরো বড় হতে পারে।

প্রশ্ন : ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত নেই, এ অবস্থায় ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা কি কোনো অসুবিধা মোকাবিলা করছে?

উত্তর : আমার মনে হয় এর উত্তর আমি দিয়েছি। তবে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত নেই এ কথাটা চিন্তা করে বলা উচিত। সমাজের তো অনেক উপাদান। তার মধ্যে কিছু নেই তাই বলে কি একে ইসলামী সমাজ বলবো না। আমার মনে হয় আমাদের সমাজ মৌলিকভাবে ইসলামী সমাজ। কিছু ইসলামী উপাদান নেই। আর রাষ্ট্র মানে কি শুধু সরকার? রাষ্ট্র বলতে একটি টেরিটোরি। আমাদের টেরিটোরি কি আনইসলামিক। রাষ্ট্রে জনগণ দরকার। আমাদের জনগণ কি ইসলামিক নয়। আর রইলো শুধু সরকার। মুসলিম দেশগুলোতে যে সরকার আছে সবগুলো ইসলামী সরকার আমি একথাও বলবো না। এগুলোকে সমন্বিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলা যায়। অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী পলিসি নেয় আবার অনেক ক্ষেত্রে নেয় না। কাজেই এভাবে বলা যায়, আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা নয়।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি বৃদ্ধি ব্যাংকিং কার্যক্রম স্বাধীনভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে?

উত্তর : তা আমি মনে করি না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি না থাকলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিপদের সম্মুখীন হবে তা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় হোক বা অন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থায় হোক। ব্যাংকগুলোর মালিকরা কিছু টাকা নিয়ে ব্যাংক শুরু করে। এরা আমানত নেয়। এ টাকা প্রটেক্ট করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। জনগণ কোনো ব্যক্তির কাছে টাকা রাখে না বিশ্বাসের কারণে। আর ব্যাংকে টাকা রাখে বিশ্বাসের জন্যই। কেননা ব্যাংকের গ্যারান্টি বা প্রটেক্টর হচ্ছে রাষ্ট্র। তাই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তদারকি করা দরকার এবং তা খুবই ভালো। তবে সবকিছুরই একটি সীমা আছে। খুব বেশি করা ঠিক হবে না। যেটুকু স্বাধীনতা ব্যাংকগুলোর থাকা দরকার তা দিতে হবে। আমার মনে হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক তা দেয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সব দেশেই খুব চিন্তা করে কাজ করে। এ ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই। আমাদের দেশেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক খুব চিন্তা করে কাজ করে। হয়তো কোনো কাজ আমাদের পছন্দ হয়, আবার কোনো কাজ পছন্দ হয় না। সেটি তো আলাদা ব্যাপার। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশ ও জাতির স্বার্থে কাজ করে।

প্রশ্ন : সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? আপনি কি মনে করেন দেশের গোটা ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামী শরীয়াহর ভিত্তিতে পরিচালনা করা সম্ভব?

উত্তর : মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে সুদকে বর্জন করা। প্রচলিত ব্যাংকিং-এর রূহ হচ্ছে সুদ। আর ইসলামী ব্যাংকিং-এ সে সুদ নেই। সুদ থাকা আর না থাকার মধ্যে সবক্ষেত্রেই প্রভাব পড়ে। ডিপোজিট, বিনিয়োগ, লাভের নেচার পরিবর্তন হয়। অন্যান্য ব্যাংকের লাভ আসে সুদ থেকে। আর ইসলামী ব্যাংকে লাভ থেকে লাভ। এভাবে অনেক ধরনের পার্থক্য আছে।

ইসলামের আর্থ-সামাজিক অবজেক্টিভ দুনিয়াতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা, এ কাজটা করতে হয়। করাটা উচিত। হয়ত অনেকে করতে পারছে না। অনেকে ব্যর্থ হচ্ছে। তবে এটি ঠিক, এটি করতে হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ব্যাংকের সুদভিত্তিক বিনিয়োগে ব্যাংকের লাভ নিশ্চিত থাকে, ঋণগ্রহীতার থাকে না। ইসলামী ব্যাংক তার স্বার্থ নিশ্চিত করার সাথে সাথে বিনিয়োগে গ্রহীতার স্বার্থও কি নিশ্চিত করে? কীভাবে?

উত্তর : এটি ঠিক। সুদভিত্তিক সিস্টেমে যিনি মূলধন দেন, তার লাভ নিশ্চিত হয় সুদের আলোকে। সেখানে বিনিয়োগ গ্রহীতা লাভবান হতে পারেন আবার একেবারে ক্ষতিগ্রস্তও হতে পারেন। এ সমস্যা থাকছে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং-এর মুদারাবা-মুশারাকায় লাভের সুষম বন্টন হয়। যেমন- এক লাখ টাকা বিনিয়োগ ৫ বছরে করে ৫০ হাজার টাকা লাভ করলে আধুনিক সিস্টেমে সুদ হচ্ছে শতকরা বার্ষিক ১০ ভাগ। ব্যাংক পাবে ১০ শতাংশ। গ্রহীতা পুরো ৪০ হাজার টাকাই পেয়ে যাবে। আর যদি ক্ষতি হয়, সে ক্ষেত্রে ব্যাংক ১০ হাজার টাকা পেয়ে গেল আর সে কিছুই পেল না।

কিন্তু মুদারাবা মুশারাকায় এটি নেই। লাভটা স্বীকৃত হারে ভাগ হয়। ব্যাংকের ১০ লাখ টাকা আর গ্রহীতার ১০ লাখ টাকা অথবা ব্যাংক টাকা দিলো গ্রহীতা শ্রম দিলো। লাভের বন্টনটা সুষ্ঠু হয়। একদিকে ঝুঁকে পড়ে না। ইসলামী ব্যাংক নিজের স্বার্থ নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিনিয়োগ গ্রহীতার স্বার্থও নিশ্চিত করে। গ্রহীতা যদি বাইমুয়াজ্জাল বা বাইমুরাবাহাতে যায়, সে নিশ্চিতভাবে পণ্য পেয়ে যাচ্ছে। সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। এটি ঠিক সে ১০ টাকার পণ্য ১১ টাকায় ব্যাংক থেকে কিনেছে। সাথে সাথে সে কিন্তু পণ্যটার মালিক হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন : ব্যাংকের বিনিয়োগ ব্যবসায়ের বাইরে ব্যাংক জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ করছে কি? সেসব কাজ কেমন?

উত্তর : এটি বলবো যে ব্যাংক ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সেবা দিচ্ছে। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংক সরাসরি না হলেও পার্শ্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। তা হচ্ছে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন। এর মধ্যে ইসলামী ব্যাংক তার মূলধনের যাকাত দিয়ে দেয়। আর এমন যা সন্দেহজনক, পুরোপুরি লাভ কি না তাও ফাউন্ডেশনে দিয়ে দেয়। এ টাকা দ্বারা কয়েকটি হাসপাতাল চালাচ্ছে, স্কুল, মেডিকেল কলেজ চালাচ্ছে। সেখানে ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা আছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। হাসপাতাল ছাড়াও প্রায় হাজার দশেক রোগীকে প্রতি বছর চিকিৎসা সাহায্য দেয়া হয়। এছাড়া এ ধরনের অনেক অনেক প্রকল্প আছে। এমন কোনো বৈধ প্রকল্প নেই যা ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন গ্রহণ করে না।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সামছুল আরেফীন
প্রকাশকাল : ২৩ জুলাই ২০০৪, দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

বাংলাদেশের দুর্নীতির অধিক প্রচার উদ্দেশ্যমূলক

প্রশ্ন : প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিবর্তনের কথা বলছে। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি?

উত্তর : তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি ১৯৯১ সাল থেকে শুরু হয়েছে। এ পদ্ধতিতে একটি জাতীয় ঐকমত্য রচিত হয়েছে। এখন এ ঐকমত্য সহজে ভাঙা ঠিক হবে না। এতে জাতীয় সমস্যা আরো বাড়বে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে ফর্মুলা আমাদের কনস্টিটিউশানে আছে তার যে ভুলত্রুটি নেই তা আমি বলব না। যেমন- নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তিন মাসের সময় দেয়া হয়েছে। অনেকেই মনে করেন এটি খুবই অল্প সময় এবং নির্বাচন করতে গিয়ে যদি বড় কোনো সমস্যা হয় তাহলে এ তিন মাস একটি জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। আমি মনে করি এ সময়টা বাড়ানো দরকার। তিন মাসের জায়গায় অন্তত চার মাস করা দরকার। খুব বেশি বাড়ানোর পক্ষে আমি নই। কেননা, আফটার অল এটি নির্বাচিত সরকার নয়। অনির্বাচিত সরকার। একে বেশি সময় দেয়া যাবে না। তবে এতটুকু সময় অবশ্যই দিতে হবে যাতে নির্বাচনটি সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। আমি মনে করি, সময় আরো এক মাস বাড়ানো উচিত। আরো পরিবর্তন করা দরকার হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে বিরাজ করছে একটি সংঘাতময় রাজনীতি। সংঘাতময় রাজনীতি থাকার কারণে আমাদের পক্ষে নতুন নতুন বিবাদ সৃষ্টি করা, বিভেদ সৃষ্টি করা, নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করা উচিত নয়। যদি অন্তত প্রধান দু'টি দলের বা প্রধান চারটি দলের মধ্যে জাতীয় ঐকমত্য হয়ে যায়, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার করা যেতে পারে। যদি তা না হয় তাহলে একে আর স্পর্শই করা উচিত নয়।

প্রশ্ন : পরপর চারবার বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এর মধ্যে চারদলীয় জোট সরকারের সময় তিনবার। জোট সরকারের সাথে জামায়াতে ইসলামী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর : আমি ধরে নিচ্ছি প্রশ্নটা এই যে, বাংলাদেশ পরপর চারবার দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকার মধ্যে এক নম্বরে আছে, আর এর মধ্যে তিন বছর জোট সরকারের আমলে, এক বছর আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে - প্রশ্নটা এভাবে ধরে নিয়ে আমি উত্তর দিচ্ছি। আমি স্বীকার করি বাংলাদেশে ব্যাপক দুর্নীতি আছে। আমি মনে করি রাজনৈতিক সরকার বা পলিটিক্যাল গভর্নমেন্টের মধ্যে দুর্নীতি রয়েছে, ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের মধ্যে দুর্নীতি রয়েছে। কিন্তু একথা সত্য, বাংলাদেশের বেশিভাগ লোকের সঙ্গে দুর্নীতির কোনো সম্পর্ক নেই। আমাদের কৃষক সমাজের মধ্যে উল্লেখ করার মতো কোনো দুর্নীতি নেই। শ্রমিক সমাজের

www.pathagar.com

মধ্যে উল্লেখ করার মত কোনো দুর্নীতি নেই। আমাদের গৃহিনীদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে এমন কোনো দুর্নীতি নেই। এটি প্রথম ভাবতে হবে যে, দুর্নীতি কিছু লোকের মধ্যে। বাংলাদেশের যদি তের কোটি পপুলেশন হয়ে থাকে এর মধ্যে ৮/১০ ভাগ লোকের মধ্যে দুর্নীতি আছে। কিন্তু বাংলাদেশকে এখন দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। আমি এগুলোকে সত্যিকার অর্থে সঠিক মনে করি না। এসব কোনো সঠিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। আমার ধারণার মধ্যে আফ্রিকার অনেক দেশ, নাইজেরিয়া ফর এক্সাম্পল, অন্য অনেক দেশে ব্যাপক দুর্নীতি আছে। দুর্নীতি ভারতেও কোনো অংশেই কম নয়। পাকিস্তানেও কম নয়। হতে পারে আরো অসংখ্য দেশের একই অবস্থা।

আমার মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের দুর্নীতি বেশি প্রচার পাচ্ছে। বেশি প্রচার করা হচ্ছে। এর যথার্থ কোনো ভিত্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। আমি মানি বাংলাদেশে দুর্নীতি আছে। কিন্তু এটি জাতিসংঘের কোনো স্বীকৃত মানদণ্ড বা এ পর্যায়ের কোনো প্রতিষ্ঠান যেমন জাতিসংঘ হতে পারে, ওআইসি হতে পারে, সার্ক হতে পারে, এমনকি ন্যাম হতে পারে - তাদের একটি ডেফিনেশনের আওতায় যদি একটি নিরপেক্ষ বডি এটি করে তাহলে একটি কথা ছিল। আমার ধারণা, এগুলো থেকে একটি আন্দাজ করা যায় মাত্র যে, বাংলাদেশে দুর্নীতি আছে। কে চ্যাম্পিয়ন অথবা কে চ্যাম্পিয়ন নয় এসব নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। কোনো বাংলাদেশীর এটি নিয়ে উল্লসিত হওয়ার কারণ নেই। অপজিশনদেরও একথা বলে উল্লসিত হওয়ার কারণ নেই এবং সরকারেরও উচিত হবে না এটিকে ইগনোর করা। এজন্য যে, আমাদের সমাজে দুর্নীতি আছে এটি আমাদের মানতে হবে। আজ উল্লসিত হয়ে বলা হচ্ছে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে। একটি দল চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে শুধু একটি দলই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বলা হচ্ছে না, সরকার চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন। এ অভিযোগ কিন্তু সবার উপরে। সুতরাং এটি নিয়ে আমাদের উল্লসিত হওয়ার কারণ নেই। তবে দুর্নীতি দমনেও ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

প্রশ্ন : দুর্নীতি সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেছেন বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য সাংবাদিকরা দায়ী। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর : আমি অত্যন্ত ফ্র্যাংকলি বলব, বাংলাদেশে সাংবাদিকতার উপর আমি নিজেও খুব সন্তুষ্ট নই। এটি আমার মনের কথা বলছি। মনের কথা বলা যদি অপরাধ না হয়ে থাকে তাহলে আশা করি সংবাদপত্রগুলো সেভাবেই দেখবে। কারণ, সংবাদপত্রে বাংলাদেশে সত্য তথ্য বের হয় আমি এটি মনে করতে পারছি না। রাজনৈতিক খবরে দলাদলির প্রভাব পড়ে। দুর্নীতিকে হাইলাইট করে দেয়া আমাদের একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশে সত্যিকার অর্থে ভালো কাজগুলো হাইলাইট হচ্ছে না, ফলে নেগেটিভ মেন্টালিটি নিয়ে আমরা তৈরি হচ্ছি। অনেক ভালো খবর থাকে, ভালো তথ্য থাকে, ভালো ডেভেলপমেন্ট থাকে সেগুলো সেভাবে হাইলাইট হয় না। কিন্তু দুর্নীতিকে অনেক হাইলাইট করা হয়। এর সুযোগ নিচ্ছে কারা? সুযোগ নিচ্ছে কিন্তু বিদেশীরা এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। বলছে তুমি দুর্নীতিগ্রস্ত, তোমাকে এটি দিব না, ওটি দিব না। সুযোগ নিচ্ছে আইএমএফ, সুযোগ নিচ্ছে বিদেশী সরকারগুলো, সুযোগ নিচ্ছে ডোনাররা। এ ব্যাপারে সাইফুর রহমান সাহেবের বক্তব্য একটু তিক্ত হতে পারে, কিন্তু তিক্ত কথাটাও তো হজম করতে হয়। সাইফুর রহমান সাহেব খোলামেলা কথা বলেন। ওনার গুণের মধ্যে এটি একটি। তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, পুরো কথাটা বলেন এবং এটিকে সাংবাদিকদের খারাপ নজরে দেখা উচিত নয়। তাদের

www.pathagar.com

ভাবা উচিত, এটিকে গোষ্ঠী চেতনা দিয়ে দেখা উচিত নয়, দেখতে হবে আমাদেরও ভুলত্রুটি আছে কিনা। আমরা সাংবাদিকরা সবাইকে সমালোচনা করবো, আমাদের সমালোচনা কেউ করতে পারবে না, এটি তো হতে পারে না। সাইফুর রহমান সাহেবের কথাটি যদি এ মনোভাব নিয়ে দেখা হয় এবং আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরা যদি ভাবেন আমরা দুর্নীতিকে অতিরিক্ত হাইলাইট করবো না, হাইলাইট করে আমাদের কি লাভ? আমরা হাইলাইট করবো যতটুকু হাইলাইট করা দরকার। অথচ তার চেয়েও বেশি হাইলাইট করছি।

ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, তারা বলছে সংবাদপত্রের খবরের ভিত্তিতে আমাদের এ রিপোর্ট। এটি কোনো এসেসমেন্টের ব্যাপার নয়। তারা সংবাদপত্রের খবরগুলোর কাটিং-এর উপর নির্ভর করে রিপোর্ট তৈরি করে। সংবাদপত্রের রিপোর্ট নির্ভর করে সাংবাদিকদের মানের উপরে, তাদের শিক্ষার উপরে, তাদের ট্রেনিং, তাদের চেতনার উপরে, তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপরে। সাইফুর রহমান সাহেব কি বলেছেন আমি জানি না। আমার মনে হয় তিনি যদি এ কথাই বলে থাকেন তাহলে সাংবাদিক ভাইদের তিক্ত সত্যটাকে বুঝার চেষ্টা করা উচিত।

প্রশ্ন : দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সাথে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট জড়িত বলে মনে করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে জোট সরকার কার্যত কিছুই করতে পারছে না।

উত্তর : আমি বিষয়টি একটু গভীরভাবে সাংবাদিকদের বলব। অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতাটা বুঝতে হবে। স্বাধীন অর্থনীতিতে সরকার সবকিছু করতে পারে না। আপনি যদি একটি পরাধীন অর্থনীতি চান বা কমান্ড ইকোনোমি বা সোসালিস্ট ইকোনোমি না চান সেখানে সরকার অনেক শক্তিশালী হয়ে যায়, সবকিছু সরকারের আওতায় থাকে। সেখানে যা করা সম্ভব একটি ফ্রি ইকোনোমি বা স্বাধীন অর্থনীতিতে সরকার তা করতে পারে না। যেমন - সরকার চাইলেই বাজারে বাজারে গিয়ে পাহারা বসাতে পারে না। সুতরাং স্বাধীন অর্থনীতিতে আমার মনে হয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি অবশ্যই আছে। তবে 'নিয়ন্ত্রণ' এ অর্থে নিয়ন্ত্রণ নয় যে, আমি প্রাইস ফিক্সড করে দিলাম। এ অর্থে নিয়ন্ত্রণ, প্রাইস কমিয়ে আনার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হয়। সরকার তা নেয়ার চেষ্টা করে। তা করা উচিত। যেমন - যেসব আইটেমে প্রাইস বেড়ে গেছে সেসব আইটেমে সরকারের অলওয়েজ উচিত ইম্পোর্টটা বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা। কারণ, বর্তমানে সরকারের ফরেন এক্সচেঞ্জ পজিশন ভালো। থ্রি বিলিয়নের উপর রিজার্ভ আছে। সুতরাং প্রয়োজনে সরকার কয়েকশ' মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে পারে ফর ইমিডিয়েট ইম্পোর্ট। দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমি সরকারকে বলতে চাই, সরকারের এ উপলক্ষে সবসময় ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (এফবিসিসিআই) সঙ্গে নেগোসিয়েশন থাকতে হবে। ডায়লগ থাকতে হবে। যখনই বিপদ বা জাতীয় সমস্যা, তখনই তাদের সাথে ডায়লগে বসতে হবে। এগুলো একা সরকারের সমস্যা নয়। এফবিসিসিআই-এর সাথে আলাপ করে তাদের বলতে হবে তোমরা দেশের ওয়াস্তে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদের যা করণীয় কর। দাম যেটুকু বাড়ার তা বাড়বে, কিন্তু যতটুকু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব প্রাইভেট সেক্টরের পক্ষে সেটি করতে হবে। এজন্য এফবিসিসিআই, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এবং অন্যান্য চেম্বার অব কমার্সের সাথে কন্টিনিউয়াস ডায়লগে থাকতে হবে।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় সরকার এসব পদক্ষেপ নেবে?

উত্তর : আমি মনে করি শুধু এ সরকার নয়, যে কোনো সরকারই কোনো না কোনো পদক্ষেপ নেয়। তবে সেক্ষেত্রে আইডিয়া দরকার হয়। আমি মনে করি ভালো আইডিয়া তারা নেবেন।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে দেশের বিভিন্ন স্থানে র‍্যাবের তৎপরতা বেশ সন্তোষজনক বলেই মনে হচ্ছিল। দ্রব্যমূল্যের দাম নিয়ন্ত্রণে র‍্যাব পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা র‍্যাবের কাজ নয়। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি?

উত্তর : স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সঠিক কথা বলেছেন। কখনো পুলিশের দায়িত্ব নয় পণ্যের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা। কখনো র‍্যাবের দায়িত্ব নয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা। তা করতে গেলে ইনফ্যাক্ট যেটি হবে তা হচ্ছে মার্কেটে মাল আরো কমে যাবে। তার ফলে অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মে ব্ল্যাক মার্কেট হবে। লোকেরা মাল সরিয়ে ফেলবে, বাজারে মাল আসবে না। দ্রব্যমূল্য আরো বেড়ে যাবে। সুতরাং এ ধরনের পদক্ষেপ অনেকটা বিষের মতো এবং র‍্যাব যে শুরুতেই মার্কেটে গেল, কার আদেশে গেল তা দেখা দরকার। যারা এ আদেশ দিয়েছে তারা ভুল করেছে। তারা জাতির ক্ষতি করেছে। তারা পরে উইদড্র করে নিয়েছে। কারণ, দুই দিনে বুঝেছে র‍্যাব সর্বনাশ করে দিচ্ছে, এ কারণেই উইদড্র করেছে। এটি কিন্তু তারা বাধ্য হয়েই করেছে। যারা মার্কেট ম্যাকানিজম বোঝে, ফ্রি মার্কেট বোঝে, তাদের বুঝতে হবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে সাপ্লাই বৃদ্ধি করা। তা ইম্পোর্টের মাধ্যমে করতে পারে, দেশের মধ্যে যদি যোগাযোগের প্রব্লেম থাকে তার সমাধান করে করতে পারে। যদি চাঁদাবাজি হয় তা দূর করতে পারে। এসবের মাধ্যমেই আমাদের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

প্রশ্ন : একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী দেশ এবং বিদেশে দেশবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। বিশেষ করে বইপুস্তক ও ভিডিও চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে তারা জোট সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আপনার মতামত কি?

উত্তর : আমি মনে করি, এটি শুধু জোট সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা নয়। এটি দেশের বিরুদ্ধে প্রচারণা। এমন কোনো কিছু করা বাংলাদেশীদের উচিত নয় যাতে জাতীয় সম্মান নষ্ট হয়। জাতীয় স্বার্থ নষ্ট হয়। বিশেষ করে তা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে তা ভয়াবহ অপরাধ হয়। এগুলো করা যেতে পারে না, এগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে না। এটি শুধু জোট সরকারের বিরুদ্ধে নয়, এটি বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে। ক্ষমতায় যখন যে সরকার থাকে সেটি কিন্তু বাংলাদেশের সরকার। জোট সরকার বাংলাদেশ সরকার, আওয়ামী লীগও যখন ক্ষমতায় ছিল তখন সেটি বাংলাদেশের সরকার ছিল। এটি আমাদের বলতে হবে। জাতীয় পার্টি যখন সরকারে ছিল সেটি আমাদের বাংলাদেশী সরকার ছিল। এ কাজগুলো জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে। এটিকে সবারই নিন্দা করা উচিত। আমিও নিন্দা করি। হ্যাঁ, তবে আমি স্বীকার করি, দেশে যদি কখনো ভয়াবহ রকমের অত্যাচার হয়, তা তো বিশ্ব জেনেই ফেলবে। সেজন্য ভিডিও দেখানোর দরকার নেই। কারণ, তাদের দূতাবাস এখানে আছে। তার মাধ্যমে তারা রিপোর্ট পাচ্ছে। এখানে সকল সাংবাদিক আছে। রয়টার্স আছে, এএফপি আছে, এপি আছে, ভারতের আছে, চীনের আছে, জাপানের আছে, ইউরোপের সাংবাদিক আছে। সুতরাং ভিডিও করে দেখাবার কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলো খুব খারাপ মোটিভেশন থেকে, খারাপ চিন্তা থেকে হচ্ছে। জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে হচ্ছে।

প্রশ্ন : দেশের কিছু পত্রিকা জোট সরকারের অংশীদার জামায়াতে ইসলামীকে তালেবান হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর : আমি শুধু এটুকু বলব যে, জামায়াতে ইসলামীকে আমি যতটুকু জানি এবং তালেবানকে যতটুকু জানি, যতটুকু পড়াশোনা করেছি তালেবান সম্পর্কে এবং যতটুকু

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে, তাতে আমি এতটুকু বলতে পারি জামায়াতে ইসলামী একটি ইসলামী পার্টি; তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, আইনসম্মত পদ্ধতিতে, কনস্টিটিউশনের মাধ্যমে দেশে তাদের প্রোগ্রামটি কার্যকর করতে চায়। তারা কোনো ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করে না। তাদের পলিটিক্যাল প্রোগ্রামে ভায়োলেন্স নেই। তাদের অবস্থান সবসময় ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে। আর তালেবানরা, তারা কোনো নির্বাচনে বিশ্বাস করে না। তারা চার-পাঁচ বছর আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এ সময়ে তারা কোনো নির্বাচনই করেনি। তারা ডেমোক্রেটিক রুটই (route) বিশ্বাস করেনি। ভুল বুঝেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক, তারা এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সিদ্ধান্তগুলোকে তারা ইসলামী মনে করে। যেমন- টিভি ভেঙে ফেলে টিভি দেখতে না দেয়া, মেয়েদের স্কুল বন্ধ করে দেয়া। এসব বিষয়ের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। অতি বাড়াবাড়িমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এসব হয়েছে। এটি তালেবানের দৃষ্টিভঙ্গি। এটি জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিভঙ্গি নয়। যাহোক আমি যতটুকু বুঝি জামায়াতে ইসলামীর পলিটিক্সের সাথে তালেবানদের পলিটিক্সের কোনো সংগতি আমি দেখতে পাই না।

প্রশ্ন : তারপরেও দেশের কিছু পত্রিকা কেন জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে এসব বলছে?

উত্তর : আমি এর পিছনে একটি কারণই পাই। হয় তারা জানে না, এটিই ভালো ব্যাখ্যা। আর মন্দ ব্যাখ্যা হচ্ছে তারা মোটিভেটেড, কারো স্বার্থ রক্ষা করছে। কারণ, এটি সত্য, সাংবাদিকদের উচিত প্রকৃত সত্যকে সমর্থন করা। এ সম্পর্কে আমি কুরআনের একটি আয়াত বলতে পারি। কুরআনের এ আয়াত সাংবাদিকতার মূল জিনিস হতে পারে। আল্লাহ সূরা বাকারাতে বলছেন, 'লা তালবেসুল হাক্কা বিল বাতিল' অর্থাৎ তোমরা সত্যকে মিথ্যা দ্বারা আবৃত করো না। এ আয়াতটি সাংবাদিকদের মূলনীতি হতে পারে। সাংবাদিকরা কখনো সত্যকে মিথ্যা দ্বারা আবৃত করবে না।

প্রশ্ন : বর্তমানে বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে। এটিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

উত্তর : হ্যাঁ, বর্তমানে বাংলাদেশ–ভারত সম্পর্কে টানাপড়েন চলছে। এটিকে আমি বলব আন এক্সপেক্টেবল, আন ওয়ান্টেড। এটি হওয়া উচিত নয়। ভারতে নতুন সরকার এসেছে, তাদের সাথে আমাদের সমঝোতা হওয়া দরকার, আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। কোনো অবস্থাতেই টানাপড়েন বৃদ্ধি পাওয়া ঠিক নয়। আমাদের দুই গভর্নমেন্টের মধ্যে ডায়ালগ দরকার। আমাদের যে কয়েকটি প্রবলেম আছে, তিন-চারটা প্রবলেম আছে এগুলোর সমাধান করা দরকার। আমি বিশ্বাস করি, এ গভর্নমেন্টের শুধু নয়, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট এবং ভারতের নতুন গভর্নমেন্টের মধ্যে স্বাভাবিক যোগাযোগের মাধ্যমে এটি কমিয়ে নেয়া উচিত। এ ধরনের টানাপড়েন আমাদের এ এলাকার জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়। এ সাবকন্টিনেন্টের জন্যই কল্যাণকর নয়। বাংলাদেশের জন্য কল্যাণকর নয়। এমনকি আমি ভারতের জন্যও কল্যাণকর মনে করি না।

প্রশ্ন : এ ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশ সরকারকেই আগে এগিয়ে আসা উচিত?

উত্তর : আমি এ সম্পর্কে বলতে চাই না। আমি মনে করি, যাদের গুডসেন্স আছে তাদের আগে এগিয়ে আসা উচিত। যে আগে পদক্ষেপ নেয় সে বেটার। যে আগে পদক্ষেপ নেয় সে ভালো ব্যক্তি।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : ভারতের বৃহৎ কোম্পানি টাটা বাংলাদেশে দুই বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে। তো এক সময় আমরা স্বাধীনতার কথা বলে আদমজীকে বাংলাদেশে ঢুকতে দেইনি। অথচ টাটাকে আমরা সে সুযোগ দিচ্ছি। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে আপনি কীভাবে দেখছেন?

উত্তর : আমি বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে দেখতে চাই না। এটি একটি ইকোনোমিক ব্যাপার। আজ আমরা আদমজীকে দেইনি যে বলা হচ্ছে সেটি আমি ভালো জানি না। যদি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর এমন ঘটনা ঘটেও থাকে সে পরিস্থিতি এখন নেই। ১৯৭১-এর পরিস্থিতি আর এখনকার পরিস্থিতি এক নয়। আমাদের এখন ফরেন ইনভেস্টমেন্ট দরকার সেটি যেখান থেকেই আসুক না কেন। সেটি জাপান থেকে আসুক, সেটি ইউরোপ থেকে আসুক, ভারত, পাকিস্তান যেখান থেকেই আসুক, আমাদের দেখতে হবে যে, আমরা যেন ইকোনোমিক দৃষ্টিতে বিষয়টা দেখি। এমন কোনো শর্ত আমাদের মানা উচিত নয় যে শর্ত বাংলাদেশের স্বার্থ ইমিডিয়েট ক্ষতি করবে বা মিডল টার্মে বা লংট্রার্মে ক্ষতি করবে। এটি করা উচিত নয়।

আমি মনে করি, আমাদের সবকিছু সন্দেহের চোখে দেখা উচিত নয়। বাংলাদেশের জনগণের বিরাট অংশের মানসিকতাই তৈরি হয়ে গেছে এরকম বিকজ অব ব্যাড পলিটিক্স। সবকিছু সন্দেহের চোখে দেখা, সবকিছুতে জুজুর ভয় এটি মনে করা ঠিক হবে না। আমি বলব, এ প্রস্তাবগুলো যেন বাংলাদেশ সরকার গভীরভাবে দেখেন। যেটি নেয়া উচিত নেবে, যেটি নেয়া উচিত নয় নেবে না। টেকনিক্যালি স্টাডি করতে হবে। কমপ্লিটলি স্বাধীনভাবে স্টাডি করতে হবে এবং দরকার হলে পার্লামেন্টে আলাপ করতে পারে। যেহেতু বিষয়টি সেনসেটিভ, পার্লামেন্টে আলাপ করে নেয়া ভালো। যে কোনো সেনসেটিভ বিষয় পার্লামেন্টে আলাপ করতে পারে। জাতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হওয়াটা কল্যাণকর। শুধু এ বিষয় নয়, অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা হতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন টাটার এ বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বেশ চাঙ্গা করবে?

উত্তর : দুই বিলিয়ন ডলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি এ প্রজেক্টগুলো ভালো হয়, আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে তেমন শর্ত যদি না থাকে, তাহলে হতে পারে। যেমন- আমাদের কমিটমেন্ট গ্যাস দিবই - এ বিষয়টি চিন্তা করতে হবে, গ্যাস থাকলে দেব, না হলে নয় - এমন হওয়া উচিত। অর্থাৎ শর্তগুলো ভালো করে দেখে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে আমাদের চুক্তি করতে হবে।

প্রশ্ন : শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক বলেছিলেন, বিধর্মীরা যখন আমাদের প্রশংসা করে তখন বুঝতে হবে যে, আমি ইসলামের ক্ষতি করছি। হ্যারি কে টমাস আমেরিকায় গিয়ে বাংলাদেশের সবগুলো ইসলামী দলকে মৌলবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তবে জামায়াতে ইসলামীকে গণতান্ত্রিক দল বলেছে। একে আমরা কিভাবে নেব?

উত্তর : ফজলুল হক সাহেব যে কনসেপ্টে কথাগুলো বলেছিলেন সে পরিস্থিতি যেন আমরা ভুলে না যাই। ওটা কোনো কালেমা হয়ে যায়নি। এটি কোনো চিরন্তন নীতি হয়ে যায়নি। শত্রুর ভালো জিনিসকে ভালোই বলতে হবে। শত্রু যদি ভালো কাজ করে তাকে ভালোই বলতে হবে। আর ভালো লোকেরা যদি মন্দ কাজ করে তাকে মন্দই বলতে হবে। আমি মনে করি হ্যারি কে টমাস বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন এটি সত্যের অর্ধেক মাত্র বলেছেন। তিনি বলেছেন, এটি একটি ডেমক্রেটিক পার্টি, জামায়াত সম্পর্কে এটি এমন কি বেশি বলেছেন। এ কথা যদি বলে

www.pathagar.com

থাকেন তাহলে বলব যে, সত্যের ওয়ান-ফোর্থ বলেছেন? এমন কিছু বেশি বলেননি। এ কারণে ফজলুল হক সাহেবের আগের নীতির সাথে কেন সব বিচার করতে হবে। ওটা কি আমাদের জন্য চিরন্তন কোনো নীতি হয়ে গেছে নাকি? এটি কোনো কথা নয়। এসব কথা তারাই বলতে পারেন, যাদের হয়তো বা জামায়াতে ইসলামীর প্রতি বিদ্বেষ আছে। হ্যারি কে টমাস যেটি বলেছেন, ভালো বলেছেন।

সারা ইউরোপের যেসব প্রপাগান্ডা নাইন্টি পার্সেন্ট জামায়াতে ইসলামী বিরোধী। তারা সে কারণে কিছু বলছে না। শুধু হ্যারি কে টমাসের একটি বিবৃতি নেয়া হলো এবং ফজলুল হক সাহেবের নীতি যদি ওই নাইন্টি পার্সেন্টের ওপর এ্যাপলাই করি তাহলে কি দাঁড়ায়। তাহলে জামায়াতকে অনেক ভালো বলতে হয়।

প্রশ্ন : জোট সরকারে জামায়াতে ইসলামীর দু'জন মন্ত্রী আছেন। কিন্তু গত তিন বছরে তাদের এমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য নেই যা দ্বারা জোট সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে বলে মনে করা যায়।

উত্তর : আমি শুধু এটুকু বলব যে, আমি যতটা লোকের মুখে শুনেছি, আমার ফ্রেন্ড সার্কেলে যে আলোচনা শুনি যারা জামায়াত ইসলামীর লোক নয়, তারা আমাকে বলেছে, এ সরকারের যেসব মন্ত্রী দেশের জন্য কাজ করছেন এবং দুর্নীতিমুক্তভাবে কাজ করছেন তাদের মধ্যে এ দু'জন। তাদের অফিসে পার্টির লোকদের ভিড় হয় না। তারা অফিস ঠিকমতো করেন। তারা টাইম মেনে চলেন এবং ডাইরেক্টলি তারা কোনোরকম দুর্নীতির সাথে জড়িত নন। প্রশ্রয়ও দেন না। এটি বলছে আমার বন্ধু-বান্ধব, যারা নাকি জামায়াত করেন না তাদের বক্তব্য। আমি যদি ভালো লোককে মন্দ বলি তাহলে জাতির কি কল্যাণ হবে? আমি যদি মন্দ লোককেই ভালো বলি তাতেই বা জাতির কি কল্যাণ হবে? এরা যদি কিছুটা ভালো করে থাকেন যদি তা আমি অস্বীকার করি, তাহলেই কি জাতির কল্যাণ করলাম? করলাম না। বিরোধীদের খারাপ বলতেই হবে, আর পক্ষের লোকদের ভালো বলতেই হবে, এ মানসিকতা আমাদের জন্ম নিয়েছে। আমাদের এর থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে গেলে পুরানো ঝগড়াগুলো দূর করতে হবে। পুরানো ঝগড়াগুলোকে অবশ্যই আমাদের বের করে দিতে হবে। শুধুমাত্র বর্তমান পলিটিক্সের যা ডিমান্ড বা সামাজিক পরিস্থিতির যা ডিমান্ড একে সামনে রেখে কাজ করতে হবে।

প্রশ্ন : নয়া দিগন্ত নামে একটি দৈনিক পত্রিকা বের হচ্ছে, বোঝা যায়, সেখানে ইসলামী ব্যাংকের বড় অংকের শেয়ার আছে। আপনার কি মনে হয় নয়া দিগন্ত আপনাদের লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করতে পারবে?

উত্তর : নয়া দিগন্তের আমি অ্যাডভারটাইজমেন্ট দেখেছি। নয়া দিগন্তে আমার ফ্রেন্ডরা আছে এবং অন্য লোকদের ফ্রেন্ডরাও আছে, এমন নয় যে, আমার ফ্রেন্ডরাই আছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আমি সাবেক চেয়ারম্যান হিসেবে বলতে পারি যে, এর সাথে ইসলামী ব্যাংকের কোনো সম্পর্ক নেই। এর মধ্যে অনেক শিল্পপতি আছেন। তারা বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করেন। এতে এমন সব লোক স্পন্সর করছেন যারা ইসলামী ব্যাংকের সাথেও ব্যবসা করেন, অন্যান্য ব্যাংকের সাথেও ব্যবসা করেন। সুতরাং এর সাথে ইসলামী ব্যাংকের কোনো সম্পর্ক নেই, আছে বলে আমার জানা নেই। আমি যতটা জানতে পেরেছি, এ পত্রিকা নিরপেক্ষতা ফলো করবে। শুধু এটি বলবে না, আমরা দলের নই। সত্যিকার অর্থে আমি যেটি জানতে পেরেছি, তারা কোনো দলের

www.pathagar.com

পক্ষেও যাবে না, বিপক্ষেও যাবে না। তাদের ভিউ হচ্ছে, চেষ্টা করবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট। হান্ডেড পার্সেন্ট তো হয় না। রেজাল্ট হবে নাইনটি বা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট। তাদের এ নিয়ত আছে। এটি আমি তাদের কিছু লোকের মুখে শুনেছি। বাকি সময়ই বলবে তারা কতটা সত্যবাদী। তারা যদি তাদের কথা রাখতে পারে তবে জাতীয় কল্যাণ হবে। সংবাদপত্র জগতে বিরাট কল্যাণ হবে। আমি আশা করি তখন তাদের লীড অন্যান্য সংবাদপত্র নেবে।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় দৈনিক সংগ্রাম এ কাজগুলো করছিল না?

উত্তর : দৈনিক সংগ্রাম সম্পর্কে আমি খুব ভালো ধারণা রাখি। আমি দৈনিক সংগ্রামের নিয়মিত পাঠক। আমি এর জন্ম থেকে এখন পর্যন্ত নিয়মিত পড়ি। কিনে পড়ি। তারপরও আমি বলব, তারা হয়তো বা হাই কোয়ালিটি সাংবাদিকতা আনতে পারেনি। তার পিছনে নিশ্চয় ততটা ম্যানেজমেন্ট প্রব্লেম ছিল বা আছে। একটি হাই কোয়ালিটির জার্নালিজম যাকে বলি আমরা, সেটি তারা দিতে পারেনি। আমি সকল সংবাদপত্রের কল্যাণ চাই, সংগ্রামেরও কল্যাণ চাই, নয়া দিগন্তেরও চাই, ইনকিলাবের চাই, আমি সবাইকে চাই।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আবু ইসা খান
প্রকাশকাল : ৩১ অক্টোবর ২০০৪, দৈনিক ইনকিলাব

www.pathagar.com

পোশাক শিল্পে কোটা প্রথা উঠে গেলেও আমরা তা ওভারকাম করতে পারবো

প্রশ্ন : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তর : বাংলাদেশের পোশাক শিল্প অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। গত ২০ বছর ধরে এর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। যদিও এর যাত্রা ৭০ এর দশকে। এটি অবশ্যই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নানাভাবে অগ্রগতি সাধনে সাহায্য করেছে। এক্সপোর্ট বেড়েছে। যদিও আমরা স্বীকার করছি যা এক্সপোর্ট করছি তার ৭০ ভাগই আমদানি নির্ভর। প্রকৃতপক্ষে আমদানি রফতানির পার্থক্য হচ্ছে মাত্র ২০/২৫ ভাগ। তারপরও বলা যায়, আমাদের সার্বিক রফতানি বেড়েছে। এটি আমাদের কর্মসংস্থানে বিরাট ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে নারীদের কর্মসংস্থানে। তবে এর কিছু দিক হয়তো অনেকেই পছন্দ করেন না। সার্বিকভাবে পোশাক শিল্প নারীদের কর্মসংস্থানের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে এবং আত্মনির্ভরশীলতায় সাহায্য করছে। সুতরাং এ শিল্পকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিতে হবে। সিদ্ধান্তগুলো আবেগ নির্ভর হলে চলবে না। অর্থনীতি ও জাতীয় স্বার্থের দিকে নজর রাখতে হবে। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থের অনুকূলে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে অভিভাবক হিসেবে সরকারকে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে।

প্রশ্ন : চলতি বছর কোটা প্রথা উঠে গেলে পোশাক শিল্প হুমকির মুখে পড়বে। এ হুমকিকে আপনি কোন ধরনের সমস্যা বলে আখ্যায়িত করছেন?

উত্তর : এটি সত্য বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে, ইউরোপের মার্কেটে যে এক্সপোর্ট হচ্ছে তার কোনো সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। সেখানে জিএসপি'র অধীনে রফতানি অব্যাহত থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে রফতানি হচ্ছে তা সমস্যায় পড়তে পারে। এমএফএ-এর ইতিহাস প্রথমত ১৯৪৭-৪৮ এর সময়ে জিএটিটি (গ্যাট) হয়। এটিই পরবর্তীকালে ডব্লিউটিও হয়ে যায়। গ্যাট-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যত বাধা আছে তা দূর করা। সে বাধা ট্যারিফ হতে পারে আবার নন-ট্যারিফ হতে পারে। যেমন আমরা কোটা করে দিলাম বা অন্যান্য শর্ত আরোপ করে দিলাম, বাচ্চাদের শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না, এসব শর্তে গ্যাট ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা তুলে দিতে চেয়েছিল। উন্নত দেশগুলোই এসব সংগঠন নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের স্বার্থই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। আমেরিকা বা ইউরোপের এক্সপোর্ট অব্যাহত গতিতে সবখানে যাবে। কিন্তু তারা একটি রেসট্রিকশন নিয়ে আসলো যেন তাদের দেশে অনুন্নত দেশের পণ্য যেতে না পরে। যেমন আমরা কম

www.pathagar.com

খরচে চাল উৎপাদন করলে তারা এমন একটি কিছু করবে যেন চাল সহজে ওই দেশে না যেতে পারে। আমাদের টেক্সটাইল অনেক সস্তা। তাদের দেশে রফতানি করার সময় তারা নানা ধরনের শর্তারোপ করে। যেন তাদের দেশের ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস না হয়ে যায়। কিন্তু তাদের স্বার্থ যেখানে সেখানে তারা কোনো রেসট্রিকশন হতে দেয়নি।

গ্যাটের প্রথম দিকে মত ছিল বাধা থাকবে না। কিন্তু পরে তারা বলল, বাধা থাকতে পারবে মাল্টিফাইবারের ক্ষেত্রে। সে আলোকেই কতগুলো উন্নত দেশ রেসট্রিকশন আরোপ করলো। ইউএসএ আমাদের পণ্যের প্রবেশের জন্য একটি কোটা দিল। কোটা না থাকলে হয়তো আমরা বড় ধরনের রফতানি করতে পারতাম অথবা নাও করতে পারতাম। এ প্রতিযোগিতায় হার জিত দু'টোর সম্ভাবনা ছিল। কোটা আমাদের সাহায্য করলো। অন্যের তুলনায় আমরা বড় কোটা পেলাম। হয়তো রাজনৈতিক বিবেচনায়।

এখন এ কোঠা উঠে যাবে। এমএফএ শেষ হয়ে যাবে। এই এমএফএ'তে প্রত্যেক দেশের সাথে বাইলেটারাল চুক্তির সুযোগ ছিল। এখন এ কোটা থাকবে না। কারো কারো মত হচ্ছে, এতে আমরা মার্কেট হারাবো। আমাদের চেয়ে কমে অনেকে পণ্য দিতে পারে। তবে এটি ঠিক আমাদের চেয়ে কম খরচে পণ্য দিতে পারে এমন দেশ কমই আছে। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দেশেই সবচেয়ে কম মূল্যে শ্রম পাওয়া যায়।

সম্প্রতি আমি একজন এক্সপোর্টারের সাথে কথা বলেছি। তার মতে, ক্যারিবিয়ান দেশগুলো আমেরিকাতে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুযোগ পায়। এ নিয়ে চুক্তি আছে। আমরা কিন্তু কোটা পাই, শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুযোগ পাই না। এতে তারা শতকরা ১২/১৩ ভাগ মূল্য সুযোগ পেয়ে যায়। এছাড়া তাদের ট্রান্সপোর্ট খরচও কম। লিডটাইমও কম। তবে আমাদের ওয়েজ এডভান্টেজ তাদের এডভান্টেজের চেয়ে বেশি। আমরা যদি সতর্ক হই তবে কোটা ছাড়াই আমাদের মার্কেট নাও হারাতে পারি। যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তা হলে আমরা কিছুটা ভর্তুকি দিতে পারি হয়তো শতকরা পাঁচ ভাগ।

এ কথাটি ইউরোপীয়ান মার্কেটের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। জিএসপির অধীনে সেখানে আমাদের সুবিধা অব্যাহত থাকবে। সেখানে আরো পরিশ্রম করে মার্কেট সম্প্রসারণ করা যাবে। ইউরোপ আমাদেরকে ভালো জানে। তারা এদেশকে মধ্যপন্থি, গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে মনে করে। এটি মুসলিম দেশ হলেও এখানকার রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে না। এছাড়া জাপানের মার্কেট আমাদের বোঝা দরকার। এক সময় জাপানের একটি বিমান ছিনতাই হয়েছিল, তখন বাংলাদেশ জাপানীদের অনেক সাহায্য করেছিল। তারা তা মনে রেখেছে। পলিটিক্যাল ডিপ্লোমেসির সাথে সাথে যদি আমরা ট্রেড ডিপ্লোমেসি করি তবে আমরা জাপানের মার্কেটে প্রবেশ করতে পারবো। এমনকি ভারতের মার্কেটে প্রবেশের চেষ্টা করতে হবে। যদি সাফটা হয়ে যায়। আমাদের চেষ্টা করতে হবে, কষ্ট করতে হবে। যদিও ভারত অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বাধা দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, ভারত যাই বলুক না কেন, তারা বাস্তবে নন ট্যারিফ বেরিয়ার দাঁড় করিয়ে ফেলে। আমার মতে ভারতের বর্তমান সরকারকে বোঝানো উচিত। এতে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। তাদের চেয়ে আমাদের খরচ কম, ওয়েজেজ কম। বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজের উপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হাফিজ জিএ সিদ্দিকী। তিনি তার বইতে ভারতের বাজারে প্রবেশের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

আমি কোনো বড় ধরনের সংকট দেখছি না। সংকট যে নেই তা নয়, এগুলো আমরা ওভারকাম করতে পারবো। আমার ব্যক্তিগত ধারণা বিজিএমইএ এ নিয়ে পরিশ্রম করছে।

www.pathagar.com

সরকার করছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় করছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আগের সচিব ড. শোয়েব আহমেদ অত্যন্ত সৎ ও যোগ্য অফিসার ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'I hope it will be managed'. তিনি এমন একজন অফিসার ছিলেন যিনি অত্যন্ত গভীর ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। আমি ঘাবড়ানোর পক্ষে নই।

প্রশ্ন : কোটা প্রথা উঠে গেলে প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ কোন পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে পারে?

উত্তর : আমি ইতোমধ্যেই বলেছি, কোটা প্রথা যদি উঠে যায় তাহলে ইউএসএ-এর মার্কেটে আমরা প্রতিযোগিতার মুখে পড়বো। আমাদের কিছু এডভান্টেজ আছে। আমাদের লেবার এফিশিয়েন্সি বাড়ানো দরকার। যন্ত্রপাতিকে উন্নত করতে হবে। তবে এটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ও বড় ইনভেস্টমেন্টের বিষয়।

ট্রেড ডিপ্লোমেসি খুব গুরুত্বপূর্ণ। ট্রেড কীভাবে সম্প্রসারণ করা যায় এটি নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও নজর রাখতে হবে। আমাদের পলিটিক্যাল ডিপ্লোমেসির চেয়ে ট্রেড ডিপ্লোমেসির প্রতি গুরুত্ব বেশি দিতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেশে পলিটিক্যাল ডিপ্লোমেসির দরকার আছে। যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ আমাদের পণ্যের বিষয় জেনে গেছে। ব্রান্ড নেম (Brand name) মনে রেখেছে। তাই এতো সহজে মার্কেট হারাবো না। সে দেশের বায়ারদের উপর আমরা অনেকটা নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্রের যারা মার্কেট নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ বাড়াতে হবে। আমি যতদূর জানি বিজিএমই এসব চিন্তা করছে।

প্রশ্ন : বিশ্বে কোটা ও শুল্কমুক্ত বাণিজ্য চালু বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে যাবে, বিশ্ব ব্যাংকের এ বিশ্লেষণকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : বিশ্ব ব্যাংক সম্পর্কে আমার ধারণা ভালো নয়। তারা এতটা বিশ্ব নিয়ে চিন্তা করে না। তাদের যারা নিয়ন্ত্রণ করে, যাদের মূল ভোটিং পাওয়ার রয়েছে, যাদের মূলধন বেশি, বিশ্ব ব্যাংক তাদের স্বার্থটাই বেশি দেখে। বিশ্বায়নের যে শ্লোগান এটিও তারা তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে। দুনিয়াটা সমান জায়গা নয়। সেখানে কীভাবে ইকোয়েল কমপিটিশনে ইন্ডাস্ট্রি টিকে থাকতে পারে? আমরা জানি, লেভেল ফিল্ড হলে বল সমানভাবে যাবে। কিন্তু উঁচু নিচু হলে বল উপর থেকে দ্রুত নেমে যাবে।

যেহেতু দুনিয়াটা লেভেল ফিল্ড নয়, যেহেতু বিশ্বায়নের নামে বাধা তুলে দেয়ার ফলে বাংলাদেশে আমরা দেখলাম অনেক মিল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, অনেক জুট মিল, স্টিল মিল বন্ধ হয়ে গেছে। চিনি শিল্প বন্ধের পথে। নিউজপ্রিন্ট শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। এটি তথাকথিত বিশ্বায়নের ফলে হয়েছে। তাই আমি বিশ্ব ব্যাংক সম্পর্কে সুধারণা রাখি না। তারা না থাকলে দুনিয়ায় কল্যাণই হতো বলে মনে হয়।

এটি ঠিক, বিশ্বে কোটা ও শুল্কমুক্ত বাণিজ্য চালু হলে বিশ্ব বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে যাবে। কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্যের শতকরা ৯০ ভাগই তাদের হাতে থেকে গেলে আমাদের কি লাভ হবে? আবার এটি তাদের জনগণের হাতে থাকবে না। তাদের কিছু করপোরেশনের বা গ্রুপের হাতে থাকবে। তারাই তো দুনিয়াটা কন্ট্রোল করবে। ডিক্টেট করবে। তখন সরকার অন্য সরকারকে কন্ট্রোল না করে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলো আমাদের মতো দেশের সরকারকে কন্ট্রোল করবে। যেটি হতে যাচ্ছে। এখন তারা ব্যক্তিকে কেনে, তখন সরকারকে কিনবে।

www.pathagar.com

তাই বিশ্ব বাণিজ্য বাড়লে আমদের কিছু হবে না। কেননা আমাদের শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদের এখানে এমন ইন্ডাস্ট্রি থাকবে যেগুলো তারা করবে না। টেইলারিং, গার্মেন্টস, বিস্কুট, জুতা শিল্প থাকতে পারে। জনগণ তখন কীভাবে বাঁচবে সেটি প্রশ্নসাপেক্ষ।

আমি সত্যিই দুনিয়ার জন্য খারাপ দেখতে পাচ্ছি। আর এ মন্দের নেতৃত্ব দিচ্ছে আমেরিকা ও তার মিত্ররা। আর আছে কিছু অর্থনীতিবিদ, এর মধ্যে অনেকে নোবেল প্রাইজও পেয়েছে। তারা থিউরি আকারে মূল্যায়ন করছেন বিশ্বায়নকে। তারা ত্রুটিগুলো দেখাচ্ছেন না। তারা একটি হাতের একদিক দেখাচ্ছেন, অন্যদিকে দেখাচ্ছেন না। এটি ভালো করছেন না। অন্যায় করছেন। আসলে দুনিয়ায় উচিত হবে বিশ্বায়নকে পুরোপুরি পুনর্মূল্যায়ন করা। বিশ্ব ব্যাংকের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আইএমএফ, আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত - এটি মনে রাখতে হবে। জাতিসংঘ আমেরিকা কর্তৃক ডিক্টেটেড। আমি এগুলোর ধ্বংস চাচ্ছি না। তবে এটিও জানতে হবে, তারা শতকরা ৯০ ভাগ আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করে।

প্রশ্ন : আজকে সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ পোশাক শিল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। এ সমস্যা সমাধান কতটা যৌক্তিক বলে মনে করেন?

উত্তর : এটিতো সরকার রিজেক্ট করে দিয়েছে। এটি এখন রাজনৈতিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'টি পক্ষ হয়েছে। একদল বলছে সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ হলে স্থানীয় ইন্ডাস্ট্রিগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। আরেক দল বলছে পোশাক শিল্পকে রক্ষা করতে হলে সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ হতে হবে। প্রয়োজনে কিনতে পারবো। লিডটাইম কমে যাবে।

সরকার সার্বিক বিবেচনায় এটি রিজেক্ট করে দিয়েছে। আমার নিজের মত হচ্ছে সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ হলে ভালো হতো। তবে এমন একটি ম্যাকানিজম থাকতে হবে যাতে এখানকার স্থানীয় উৎপাদকরা সার্টিফিকেট দেবে তাদের কাছে কাপড় নেই। তাহলেই কেবল বন্ডেড হাউজ থেকে কেনা যেতে পারে। সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যার হাউজ থেকে অবাধভাবে ফ্রি করে দেয়া হলে স্থানীয় শিল্পের ক্ষতি হতে পারে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সামছুল আরেফীন
প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০০৪, অর্থনীতি গবেষণা

www.pathagar.com

ভারতের সাথে অমীমাংসিত ইস্যুর ব্যাপারে আলোচনার মাধ্যমে প্যাকেজ ডিল করা উচিত

প্রশ্ন : বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার অমীমাংসিত ইস্যুগুলো কীভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : এটি দুঃখজনক যে, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অনেক ইস্যু রয়ে গেছে যেটি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। এগুলো আরো অনেক আগেই নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। যাহোক যত দ্রুত সম্ভব এগুলোর নিষ্পত্তি হওয়া উচিত বলে দুই দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ মনে করে। এজন্য দুই দেশের মধ্যে যদি মুক্তমনে আলোচনা হয় তাহলে এগুলোর নিষ্পত্তি সম্ভব। আমাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলব, নিষ্পত্তির জন্য দুই দেশের সরকারের নিয়মিত যোগাযোগ ও আলোচনা অব্যাহত থাকতে হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়গুলো অমীমাংসিত থাকার কারণে আমার মনে হয় আরেকটি ট্র্যাকে আলোচনা হওয়া দরকার এবং তা হতে হবে দুই দেশের জনগণের সাথে জনগণের বা সিভিল সোসাইটির মধ্যে। আজকাল এ 'টু ট্র্যাক ডিপ্লোম্যাসি' জনপ্রিয় হচ্ছে। একটি হচ্ছে সরকারি পর্যায়ে ডিপ্লোম্যাসি, আরেকটি হচ্ছে পাবলিক লেবেলে বা জনগণের সাথে জনগণের ডিপ্লোম্যাসি। জনগণের সাথে জনগণের ডিপ্লোম্যাসির প্রয়োজন দেখা দেয় যখন দু'দেশের সরকার সমাধান করতে পারে না। আরেকটি কারণ হচ্ছে যখন দু'দেশের মধ্যে নানাকারণে উগ্রমহল থাকে। এ উগ্রমহল সাধারণত জনগণকে নানা কৌশলে শান্তির বিপক্ষে প্রভাবিত করে।

সমস্যা সমধানে যদি দু'দেশের চিন্তাবিদ বা বুদ্ধিজীবীরা আলোচনা করেন তাহলে তা দু'দেশের জনগণের মধ্যকার অবিশ্বাস দূর করতে সাহায্য করে। এটি শুধু ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে তা নয়; এটি অন্যান্য দেশেও এখন অনুসরণ করা হচ্ছে।

আলোচনা হতে হবে ঢাকা-দিল্লির সাথে। ঢাকা-কলকাতা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হতে পারে। কিন্তু যেহেতু দিল্লি ভারতের রাজধানী ও সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, তাই আলোচনা হতে হবে ঢাকা-দিল্লি বা রাজধানীর সাথে রাজধানীর। ভারতের জনগণের মূল মতামত গঠিত হচ্ছে দিল্লিতে। তাই ঢাকা-দিল্লির দু'দেশের সরকার, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকদের মধ্যে আলোচনা হতে হবে। যা হোক আমি বলব, সমস্যা সমাধানের জন্য 'টু ট্র্যাক ডিপ্লোম্যাসি' দরকার।

প্রশ্ন : আপনার দৃষ্টিতে দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে বাধা কোনটি এবং তা কীভাবে দূর করা যায়?

উত্তর : ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যেসব সমস্যা রয়েছে বা যেসব বিষয় নিষ্পত্তি হয়নি এগুলো নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্য আমি কাউকে দায়ী করতে চাই না। এই যে দায়ী করা, যাকে বলে 'ব্লেম গেম' - দায়ী করে কখনো সমাধান হয় না। আমি বিয়য়টির গভীরে যেতে চাই। আমি মনে করি, ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি যদি আরো বড় হয় এবং প্রসার লাভ করে, পাশের ক্ষুদ্র

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের প্রতি যদি তাদের মনোভাব আন্তরিক হয়, তাহলে সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যাবে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিষয়ে আমার যে অবজারভেশন তা হলো ভারতের গণমাধ্যম বা পত্র-পত্রিকার একাংশ খুবই এগ্রেসিভ লেখে। এতে ভারতের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় প্রতিটি রাষ্ট্রই যে সমান বা বাংলাদেশের অধিকার ও মর্যাদাও যে ভারতের সমান তা ভারতের জনগণের একাংশ মনে করতে চায় না, বুঝতে চায় না। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের অপপ্রচারের জন্যই এমনটি হচ্ছে। যেমন বহুদিন থেকেই অপপ্রচার রয়েছে বাংলাদেশে ১৯৫টি ভারত বিরোধী ক্যাম্প রয়েছে। এটি স্পষ্ট মিথ্যা কথা। কিন্তু তারা এটি ব্যাপকভাবে প্রচার করছে। ভারতের থিংক-ট্যাংকগুলো অবলীলায় এ মিথ্যা প্রচার করায় ভারতের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশ বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়েছে। এরপর যেমন 'পুশইন'-এর মতো ঘটনা নিত্যদিন ঘটছে। এগুলো তো ঠিক হচ্ছে না। যদি বাংলাদেশ থেকে কেউ অবৈধভাবে ভারতে গিয়েই থাকে তাদের ফেরত দেয়ার বিষয় তো জটিল নয়। ভারত তাদের গ্রেফতার করে বাংলাদেশ সরকারকে জানাতে পারে। সমস্যা সমাধান করা যায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে যেসব লিডিং পত্র-পত্রিকা রয়েছে সেগুলোর রিডিং থেকেও আমি বলতে পারি এদেশেও ভারতবিরোধী প্রচারণা রয়েছে যা না থাকা ভালো।

প্রশ্ন : অনেকেই বলে থাকেন বাংলাদেশের প্রতিকূলে বিপুল বাণিজ্য ঘাটতির জন্য নয়াদিল্লির রক্ষণশীল মনোভাব দায়ী; আপনি কি মনে করেন?

উত্তর : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এক দেশের সাথে আরেক দেশের বাণিজ্য ঘাটতি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটি বিভিন্ন দেশের সাথেই রয়েছে। আমাদের সাথে সৌদি আরব, কুয়েত বা যেসব দেশের কাছ থেকে আমরা তেল কিনি সেসব দেশের সাথেও বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। আরেকটি দিক হচ্ছে ভারত বিরাট অর্থনীতির দেশ। তাদের দেয়ার মতো পণ্য অনেক বেশি, তাই তাদের রপ্তানি করার মতো পণ্যও অনেক বেশি এবং করছেও। সার্কের যে অ্যাগ্রিমেন্ট রয়েছে তার মাধ্যমে আমাদের রপ্তানি বাড়ানোর চেষ্টা রয়েছে। কিন্তু তারপরও তো ইম্ব্যালান্স রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেব একটি ভালো কথা বলেছেন তা হলো 'ভারত একটি বড় রাষ্ট্র, তাকেই তার অর্থনীতিকে ওপেন করতে হবে, তাহলেই শুধু ইম্ব্যালান্স কমে যাবে।'

ভারত যদি এক্সপেরিমেন্টালিও তাদের মার্কেট ওপেন করে আর এতে যদি দেখা যায় আমারা এক বা দুই বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করি তাতেও ভারতের কোনো উদ্বেগের কারণ নেই। এসবই হতে হবে সাফটার অধীনে। আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেছেন তিনি যখন দিল্লি গেলেন, 'সেখানে কেউ এফটিএ'র কথা বলেনি।' এখানে আমি বিষয়টি ভিন্নভাবে দেখছি - সার্ক এর রিজিয়নে সাফটার অধীনে বাণিজ্য হওয়া বাস্তবসম্মত। কিন্তু ভারতের সমস্যা হচ্ছে তারা তাদের ইকোনোমিকে অতটা ওপেন করতে পারবে না, কারণ পাকিস্তান তাদের বড় কম্পিটিটর। পাকিস্তানও একটি বড় ইকোনোমিক পাওয়ার। তাই এটি সামনে রেখেই ভারত চিন্তা করবে। তবে বাংলাদেশ যা সাপ্লাই করতে পারে সেগুলো যদি ভারত ফ্রি করে দেয়, অন্তত ১০টি আইটেম, তাহলেই এ বাণিজ্য ঘাটতি দূর করা সহজ হবে। এটি ভারত বিবেচনা করতে পারে। সাফটার জায়গায় সাফটা থাকবে আবার আমাদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। এতে যদি বাংলাদেশ দুই বিলিয়ন ডলারও এক্সপোর্ট করার সুযোগ পায় তাতে ভারতের একটি রেভিনিউ লস হবে কিন্তু বড় কোনো ক্ষতি হবে না। তারা তো অন্যান্য দেশ থেকে প্রডাক্ট নিচ্ছে, সেটি বাংলাদেশ থেকে নিল; তাহলেই তো এ ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত, এ বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ে বাংলাদেশের এত চিন্তা

www.pathagar.com

করার দরকার নেই। চিন্তা করতে হবে যে, আমাদের এক্সপোর্ট অ্যাজ এ হোল টু দ্য ওয়ার্ল্ড বাড়াতে হবে। আমদানির চেয়ে রপ্তানি বাড়াতে হবে। বিশ্ব লেবেলে সার্বিকভাবে যদি আমাদের এক্সপোর্ট বৃদ্ধি পায় এবং ভারতে যদি তা নাও বাড়ে তাহলেও উদ্বেগের কিছু নেই। আর আমাদের এক্সপোর্ট করার মতো ক্যাপাসিটিও অত নেই। দুনিয়ার সব মাল আমরা প্রডিউস করি এমন তো নয়। আমাদের সারপ্লাসের পরিমাণই বা কত? সুতরাং আমি ভারতের বিষয় নিয়ে অত ভাবি না। হ্যাঁ, যদি সাফটার মাধ্যমে হয় ভালো কথা, ভারত যদি এফটিএ'র মাধ্যমে করতে রাজি হয় খুব ভালো কথা। আর তা না হলে সারা দুনিয়া খোলা আছে - তার মাধ্যমেই চিন্তা করতে হবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের উপর দিয়ে মূল ভূখণ্ড থেকে সাত রাজ্যে যাতায়াতের জন্য ট্রানজিট প্রদান ভারতের দাবি। এ বিষয়টি বিবেচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ইস্যু - কোনটি প্রধান বিবেচনায় রাখা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : এ বিষয়টি খুবই সেনসিটিভ। অর্থাৎ এ নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সেনসিটিভ হয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নানাধরনের বক্তব্যের কারণেই এ সেনসিটিভিটি তৈরি হয়েছে। তারা এ সাবজেক্টটিকে একাডেমিক রাখেননি। এটিকে রাজনৈতিক ইস্যু বানিয়ে ফেলেছেন। এ পরিস্থিতিতে আমি আবার বলব, আমাদের অর্থমন্ত্রী ভারতে লাস্ট ভিজিটের আগে-পরে যেসব কথা বলেছেন তা খুবই সিগনিফিকেন্ট। এ ধরনের কথাবার্তা আগে আসেনি। বাংলাদেশ-মায়ানমার ও ভারতের মধ্যে পাইপ লাইনের যে কথা উঠে এসেছে এ বিষয়ে তিনি প্যাকেজ ডিলের কথা বলেছেন। যত সময়ই লাগুক না কেন, সামগ্রিক আলোচনার মাধ্যমে এ প্যাকেজ ডিল করে ফেলা উচিত। প্যাকেজ ডিলের একদিকে থাকবে ট্রানজিট প্রসঙ্গ, আরেক দিকে থাকবে পাইপ লাইন প্রশ্ন, থাকবে সীমান্তে সীমানা নির্ধারণ (এখনো ১৫ কিলোমিটার এলাকা অমীমাংসিত রয়ে গেছে), থাকবে তালপট্টি, ছিটমহল সমস্যা, নেপালে আমাদের ট্রানজিটের দাবি - এ সবকিছু নিয়েই একটি প্যাকেজ ডিল করতে হবে। প্যাকেজ ডিল নিয়ে আলোচনা হলে সবগুলো না হলেও প্রধান বিষয়গুলো সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব। বিশেষ করে ভারতের ট্রানজিট, আমাদের জন্য নেপালের ট্রানজিট, বর্ডার নির্দিষ্টকরণ - এসব বিষয় একত্রে করা উচিত। আর তা করার সময় রাজনীতিকে প্রাধান্য দেয়া উচিত নয়। রাজনীতিকে প্রধান্য দেয়া ক্ষতি হবে। দু'দেশের লং টার্ম সম্পর্ক, দু'দেশের জেনুইন নিড এবং পারস্পারিকতা - এসবের ভিত্তিতে সমাধান হওয়া উচিত। সাইফুর রহমান সাহেব দীর্ঘদিন পর যে স্পষ্ট কমেন্ট করেছেন তা এতদিন আসেনি। এখন বিষয়টি সামনে এসে যাওয়ায় ভালো হয়েছে।

প্রশ্ন : সাফটা কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়ার পর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বা এফটিএ করার প্রয়োজন আছে কি না?

উত্তর : আমি ইতোমধ্যেই এর জবাব দিয়েছি। সাফটাই ভারত চাইবে, এফটিএ চাইবে না এবং সেটিই আগে হওয়া উচিত। ভারত যদি এফটিএতে রাজি হয় ভালো কথা, না হলে এ নিয়ে এগুনোর দরকার নেই।

প্রশ্ন : ছিটমহল সমস্যা দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ তিক্ত প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। এর সমাধান কীভাবে করা যায়?

উত্তর : আমাদের প্যাকেজ ডিলের আওতায়ই সবকিছু করতে হবে। তবে তা ফেজ-ওয়ান, ফেজ-টু এভাবে হতে পারে। এতদিন ছিটমহলগুলো নিয়ে সমস্যার সমাধান না হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। এসব সমাধান ডিপ্লোম্যাটিক্যালি করতে হবে। আর তো

www.pathagar.com

কোনো ওয়েও নেই। তবে সেকেন্ড ট্র্যাকে বা সিভিল সোসাইটির মাধ্যমে আলোচনা হলে আমরা বুঝতে পারব কোনটি ভারতের জন্য সেনসিটিভ আর ভারত বুঝবে কোনটি বাংলাদেশের জন্য সেনসিটিভ। আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি হবে। এখন তো রাজনৈতিক উত্তেজনা দ্বারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যখন দু'দেশের বুদ্ধিমান লোক কোনো বিষয়ে একমত হয়ে যায় তখন সরকারের পক্ষে সে বিষয়ে এগিয়ে যাওয়া সহজ হয়ে যায়।

প্রশ্ন : অভিন্ন নদীর পানি বন্টন সমস্যা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে কাজ করছে। এ ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কি? এক্ষেত্রে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

উত্তর : আন্তঃনদী সংযোগের বিষয়ে আমার মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এটি নদী বিশেষজ্ঞরা করবেন। কিন্তু আমি যা বলব তা হচ্ছে এই - অভিন্ন নদী, পানি বন্টন সমস্যা, আন্তঃনদী সংযোগ এসব বিষয়ে সরকারের এবং থিংক-ট্যাংকগুলোর স্টাডি থাকতে হবে। দ্বিতীয় কথা, এটি মানতেই হবে এসব বিষয়ে কিছু কাজ হয়েছে। যেমন, পানি বন্টন নিয়ে চুক্তি হয়েছে। এসব চুক্তির বাস্তবায়ন হওয়া দরকার। নতুন সমস্যাও আসছে, যেমন - নদী সংযোগের বিষয়। এসব বিষয়ে আমাদের স্টাডি করতে হবে। সরকারকে তার পজিশন, পেপার খুব ভালো করে তৈরি করতে হবে। আমি মনে করি, পানি বাংলাদেশের জন্য জীবন-মরণের ব্যাপার অর্থাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এসব বিষয় সমাধান করতে হবে। আমি তো আগেই বলেছি সেকেন্ড ট্র্যাক ডিপ্লোম্যাসি এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। এটিও অব্যাহত রাখতে হবে। ফিলিস্তিনের বিষয়ে, পাক-ভারত সম্পর্কের বিষয়ে এখন সেকেন্ড ট্র্যাক ডিপ্লোম্যাসি চলছে। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও চলছে। আমাদের ক্ষেত্রেও তা কার্যকর হতে পারে। আসলে আমাদের প্রবলেম তো বেশি নেই। আমাদের দু'দেশের মধ্যে তো কাশ্মির, ফিলিস্তিনের মতো কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ভারতের নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশের নেতৃত্ব যদি তাদের জাতির স্বার্থে ধৈর্যের সাথে পজিটিভ মাইন্ডে আলোচনা করে তাহলেই সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব।

প্রশ্ন : ভারতের সাত রাজ্যের বিদ্রোহীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দানের বিষয়ে নয়াদিল্লি নিয়মিত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছে। একইভাবে স্বাধীন বঙ্গভূমি নামে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনকে প্রশ্রয় দিচ্ছে ভারত - এ অভিযোগ বাংলাদেশের। এ বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

উত্তর : বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় দেয়ার বিষয়ে কিছু ঐতিহাসিক দিক আছে। পাকিস্তান আমলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় দেয়া হতো বলে ভারতের অভিযোগ ছিল। কিন্তু এটিও আমরা জানি- পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন শান্তি বাহিনীর আন্দোলন হতো তখন ভারত শান্তিবাহিনীকে সব ধরনের সহযোগিতা করতো। এটি ওপেন সিক্রেট, না সিক্রেট নয়, পুরোটাই ওপেন। এখন যে পরিস্থিতি এটি একদম পরিষ্কার কথা - বাংলাদেশ কোনো ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয় না। কোনো ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করে না। আমি বলতে চাই, ভারত যে ১৯৫টি ক্যাম্পের কথা বলছে তা সুস্পষ্ট করে বলতে হবে অমুক গ্রামের অমুক জায়গায়, অমুক শহরের অমুক মহল্লায় বা অমুক জঙ্গলের অমুক স্থানে রয়েছে। আবার আমাদেরকেও সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলতে হবে। আমি মনে করি, দু'পক্ষ যদি এ বিষয়ে আলোচনায় বসে তাহলে সমাধান সম্ভব। এগুলো তো স্মল ব্যাপার। এদেশ থেকে যদি কিছু লোক পালিয়ে ভারতে গিয়ে কিছু লিফলেট ছাপায় তাতে তেমন কিছু হবে না। আবার ভারতকে বুঝতে হবে এদেশে তাদের বিরোধী কোনো ক্যাম্প নেই। উদ্বেগের কিছু নেই। এসব নিয়ে উত্তেজনার কিছু নেই এবং থাকা উচিত নয়।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : বাংলাদেশের সীমান্তে ভারত পুশইন করছে যা দু'দেশের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করছে, এর সমাধানের উপায় কি?

উত্তর : এটি একটি অহেতুক প্রবলেম। ভারতের এটি মোটেই করা উচিত নয়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে বলে দেয়া উচিত কাউকে পুশইন করা যাবে না। যদি কেউ বেআইনিভাবে গিয়ে থাকে তাকে গ্রেফতার করে কোথাও রাখবে । তারপর বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করে ফেরত দিবে বা ব্যবস্থা নিবে। আর এই যে বলা হয় বাংলাদেশ থেকে মিলিয়নস অব পিপলস্ আসামে-পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছে; এসব কথার মধ্যে কোনো সত্যতা নেই।

বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের কেউ ভারতে গিয়ে থাকতে চায় না। ত্রিশ বছর পর যদি ভারত বলে বিশ বছর আগে এরা এসেছিল তাহলে এসব তো মানা যায় না। কারণ এসব কথা সত্যি নয়। যদি সুনির্দিষ্ট লোকের বিষয়ে ভারত প্রমাণ দিতে পারে তাহলে বাংলাদেশের উচিত তাদেরকে মেনে নেয়া। তবে তা প্রমাণের মাধ্যমে হতে হবে, পুশইনের মাধ্যমে নয়।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন সার্ক অর্থনৈতিক ইউনিয়ন ও সার্ক অভিন্ন মুদ্রা প্রবর্তনের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের সহযোগিতা বাড়বে?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি এটি মনে করি। যদি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাহলে সাব-কন্টিনেন্টে উত্তেজনার বড় কারণ আর থাকবে না। যদি কাশ্মির সমস্যা জাতিসংঘের প্রস্তাব মোতাবেক ১৯৪৯ সালে সমাধান হয়ে যেত অর্থাৎ গণভোটের মাধ্যমে যদি কাশ্মির সমস্যার সমাধান হয়ে যেত তাহলে এ উপমহাদেশে আর কোনো উত্তেজনাই থাকতো না। আর তাহলে বহু আগেই এ সাব-কন্টিনেন্ট একটি ইকোনোমিক ইউনিয়ন হয়ে যেত এবং হয়তো এতদিন অভিন্ন মুদ্রাও চালু হয়ে যেত। ইউরোপের মতো আলাদা রাষ্ট্র আবার ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং ইউরো হতে পারতো। এখন মনে হচ্ছে পাক-ভারত সমস্যা মিটে যেতে পারে। যদি এখানে ইকোনোমিক ইউনিয়ন হয় তা অবশ্যই ইউরোপীয় স্টাইলে হতে হবে, অন্য কোনো স্টাইলে নয়। আর এ ইকোনোমিক ইউনিয়ন হলে কল্যাণ হবে বলেই আমি মনে করি।

প্রশ্ন : সার্ককে অধিকতর কার্যকর করার ব্যাপারে আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনে কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : অর্থনৈতিক বিষয়গুলো প্রাধান্য পাওয়া উচিত হবে। আর সার্কে তো রাজনৈতিক আলোচনা খুব কমই হয়। এছাড়া সার্কে তো বাইলেটারাল বিষয় আলাপ হয় না, মাল্টিলেটারাল বিষয়ে আলোচনা হয়। এখানে তো কাশ্মির, আমাদের পানি বন্টন নিয়ে আলোচনা করতে পারব না; তাহলে তো সার্কের চার্টার চেঞ্জ করতে হবে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ সংস্কার করতে পারলে ভালো হতো। তা হয়তো সম্ভব নয়, তাই সেদিকে আমি যেতে চাচ্ছি না। আমি বলব, অর্থনৈতিক বিষয় বা উপমহাদেশের জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন 'ফার্স্ট প্রায়োরিটি' হওয়া উচিত। এজন্য সাহায্য যদি করা দরকার হয় তা ট্রেড দিয়ে করতে হবে। এজন্য সাফটার আওতায় যদি বাংলাদেশে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয় তাহলে ভালো কথা। এটি বড় সাহায্য হবে। সার্ক সম্মেলন যাতে নিয়মিত হয় তার ব্যবস্থা নেয়া উচিত। আমরা দেখি ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা প্রত্যেক বছর কয়েকবার বসেন। গত দু'বছরে তারা ৫/৭ বার বসেছেন। আমাদের ইউনিয়নের নেতারা যদি ছয় মাসে একবার হলেও বসেন তাহলে ভালো হয়। এতে উত্তেজনা কমে আসবে এবং কল্যাণই হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শাহীন হাসনাত

প্রকাশকাল : ২৫ ডিসেম্বর ২০০৪, দৈনিক নয়া দিগন্ত

www.pathagar.com

জনগণকে মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে

প্রশ্ন : আমরা নানারকম ঋণের কথা শুনে থাকি, ক্ষুদ্রঋণের (মাইক্রো ক্রেডিট) বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তর : ২০/৩০ বছর আগে যখন এ আন্দোলন শুরু হয় তখন ১/২ হাজার টাকা দিয়ে শুরু হয়েছিল। এখন তা ৫, ১০, ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দেয়া হয়। ক্ষুদ্রঋণের ব্যাপারে একটি কনসেপ্ট দাঁড়িয়েছে যে, একটি গ্রুপ করতে হবে। যাতে তারা একে অপরের কাছে দায়বদ্ধ হয়। কেউ ঋণের টাকা দিতে না চাইলেও অন্যরা দিতে যেন বাধ্য করে। এখানে নিয়মিত সুপারভিশনেরও ব্যবস্থা আছে। এছাড়া আমাদের দেশে আরেকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, যদিও এটি নারীদের জন্য করা হয়নি, কিন্তু নারীদের মধ্যে বেশি প্রসার লাভ করেছে। এতে নিশ্চয়ই কোনো ঐতিহাসিক বা সামাজিক কারণ থাকতে পারে। পুরুষরা মাঠে একটু ব্যস্ত, নারীরা ঘরের কাজও করলো আবার এ কাজও করলো। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের যে প্রকল্প এখানেও ৯০ ভাগ নারী।

প্রশ্ন : ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে বাংলাদেশে কারা কাজ করছে? তাদের কাজের ধরন কেমন?

উত্তর : ক্ষুদ্রঋণের কিছু কিছু কর্মসূচি সরকারেরও আছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ছাড়াও কিছু কিছু সংস্থার এ ধরনের কাজ আছে। ক্ষুদ্রঋণের ব্যাপারে প্রাইভেট সেক্টর তথা এনজিওদের কাজ আছে। কিছু কিছু ব্যাংকও এ ধরনের কাজ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশও ইসলামী পদ্ধতিতে এ ধরনের কাজ করে থাকে। ক্ষুদ্রঋণের এ কর্মসূচি বাংলাদেশ ছাড়া এত বেশি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি নিয়ে অনেক কথা আছে। এর পক্ষে বিপক্ষে কথা আছে। উচ্চহারে সুদ নেয়ার কথাও আসে। কারো কারো ব্যাপারে রাজনৈতিক স্বার্থে কাজ করার অভিযোগও আছে। তারপরও বলতে হয়, ক্ষুদ্রঋণ বা মাইক্রোফাইন্যান্স থাকতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এটিকে বাদ দেয়া যাবে না। কেননা তখন মানুষ আরো বেশি করে মহাজনদের হাতে পড়বে, কাবলিওয়ালাদের মতো যারা চক্রবৃদ্ধি হারে জনগণের কাছ থেকে সুদ নেয়।

আমি বিশ্বাস করি উন্নয়ন ক্ষুদ্রঋণ দ্বারা হয় না। দারিদ্র্য বিমোচনও ক্ষুদ্রঋণ দ্বারা হতে পারে না। এজন্য উন্নয়ন কার্যক্রম চালাতে হবে। অবকাঠামোসহ প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়ন করতে হবে। এর মাধ্যমেই গোটা জাতির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু এটিও ঠিক যে, উন্নয়ন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সরকার হয়তো সব সেক্টর টাচ করতে পারবে না। এক্ষেত্রে বেসরকারিভাবে এ ধরনের কর্মসূচি থাকতে হবে সহযোগী হিসেবে। আমাদের লক্ষ্য হতে হবে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সংস্কার বা সংশোধন। এর মধ্যে দেশী ও বিদেশী রাজনীতি যদি ঢুকে

www.pathagar.com

যায় তবে তা সংশোধন করতে হবে। সম্ভাব্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। এনজিও সংগঠনগুলোকেও বুঝতে হবে। তাদের কাজ রাজনীতি নয়, জনসেবা। সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক খরচ কমানো দরকার যেখানে কমাতে হবে। যেখানে সুদের হার কমানো সম্ভব সেখানে কমাতে হবে। এ ধরনের সংস্কার করতে হবে। যদি কোনো এনজিও চেষ্টা করে ধর্মীয় ভিত্তিকে নষ্ট করার, এটিকে বাদ দিতে হবে। এটি তাদের কাজ নয়।

প্রশ্ন : বহু বছর থেকে চলে আসা এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণের প্রকল্পের ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কি?
উত্তর : পজিটিভলি আমি বলবো, এটি বহু মানুষকে টিকিয়ে রেখেছে। তাদের একটি অবলম্বন হয়েছে। এর মাধ্যমে কিছু না কিছু অর্থ পেয়েছে। কিন্তু এত আয় করতে পারেনি যাতে সে স্বাবলম্বী হয়ে যায়। মহাজনদের হাত থেকে বাঁচতে তাদের সাহায্য করেছে। আমরা যেন এনজিওর ব্যাপারে খারাপ ধারণা থেকে তাদের ইতিবাচক অবদান ভুলে না যাই। তারা কিছু না কিছু মানুষের কর্মসংস্থান করেছে। কিছু না কিছু নারীদের জাগিয়েছে। এটি অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এর মাধ্যমে যে কিছু মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনবে সেটি হয়নি। দারিদ্র্য থেকে মানুষকে বের করে আনবে এ ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়নি।

প্রশ্ন : ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রসঙ্গে আপনার বিশেষ কোনো পরামর্শ আছে কি?
উত্তর : ৫/১০ হাজার টাকা নিয়ে একটি লোক দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। সুতরাং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যেটি দরকার তা হলো, একটি অনুদানভিত্তিক ব্যবস্থা করতে হবে। একটি লোক ৫/১০ হাজার টাকা ব্যবহার করে টাকাও শোধ করবে আবার তাকে আয়ও করতে হবে এটি সম্ভব নয়। ইসলামে কেন যাকাতের কথা বলা হয়েছে? এটি দেখলে আমরা বুঝবো এটি একটি পূর্ণ অনুদান। এর মাধ্যমে একটি লোককে ৫/১০ হাজার টাকা পাওয়ার পর যেহেতু সে অর্থ তাকে ফিরিয়ে দিতে হয় না, ফলে সে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য আমাদের দেশে পরিকল্পিত যাকাত ব্যবস্থা নেই। এভাবে যাকাত দেয় না। তারা খুব সামান্য সামান্য যাকাত দেয়। এটি যদি সামাজিকভাবে দেয়া যেত, আর সবাই যাকাত দিত এ চিন্তা থেকে যে, কিছু লোকের কর্মসংস্থান করা হবে অহলে সমাজ উপকৃত হতো।
কোনো দেশ যদি যাকাত ব্যবস্থা চালু করতে না চায় তবে সেখানে আংশিক বা পূর্ণ দানভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন স্কিম দাঁড় করাতে হবে। এনজিওদের পক্ষে এটি সম্ভব ছিল না আমি তা বলবো না। তাদের যত টাকা বাইরে থেকে আসছে তাতো দান হিসেবেই আসছে। তারা এটিকে দান আকারেও করতে পারতো। অথবা ঋণের সাথে দান মিলাতে পারতো। এসব ব্যাপারে এনজিও সংগঠনগুলোকে চিন্তা করতে হবে। শুধু ক্ষুদ্রঋণের আকারে খুবই কঠিন দারিদ্র্যকে বের করে আনা। একে যদি পূর্ণ বা আংশিক অনুদানে পরিবর্তন করা যায় তাহলে ভালো হতো। বিশেষ করে যে টাকাটা অনুদান হিসেবে আসে তা কেন আমরা অনুদান বা আংশিক অনুদান হিসেবে দিবো না। এসব ব্যাপারে এনজিও ব্যুরো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও এনজিও সংগঠনগুলোকে চিন্তা করতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সামছুল আরেফীন
প্রকাশকাল : ১৯ মার্চ ২০০৫, দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

কোনো বাজেটই গণবিরোধী নয়, সব সরকার জনগণকে সামনে রেখেই বাজেট তৈরি করে

প্রশ্ন : ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কালো টাকাকে সাদা করার যে সুযোগ রাখা হয়েছে সেটিকে কিভাবে দেখছেন?

উত্তর : ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের বাজেটে কালো টাকা সাদা করার যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে নতুন করে সুযোগ দেয়া নয়, এটি আগে থেকেই ছিল। এ সময়কে আরেক বছর বাড়ানো হয়েছে বলা যেতে পারে। আমি মনে করি, নীতিগতভাবে এটিকে কেউ ভালো বলছেন না। কালো টাকাকে সাদা করার জন্য কম ট্যাক্স দিয়ে বা ট্যাক্স না দিয়ে এ সুযোগ মানুষ চায় না। চাচ্ছে না - নীতিগতভাবে। আমাদের দেশে এ সুযোগ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার দিয়েছে। এ সুযোগ আশির দশকের সরকার দিয়েছে। নব্বুইয়ের দশকের সরকারও দিয়েছে। এ দশকের সরকারও দিচ্ছে। আমার জানা মতে, এ ধরনের সুযোগ পাকিস্তানে দেয়া হয়েছে, ভারতেও দেয়া হয়েছে। অন্যান্য দেশের কথা আমি বলতে পারব না। আমি মনে করি, এ বিষয়টি নিয়ে যে সমালোচনা তা সঠিক, কিন্তু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। এটি যদি একেবারে নতুন কিছু হতো তাহলে হৈ চৈ করার মতো কিছু বলা যেত। যেহেতু বিষয়টি অতীতেও ছিল তাহলে কেনইবা এ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের ঘোষণাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি হচ্ছে। প্রস্তাবিত বাজেটে আলোচনা-সমালোচনার অনেক বিষয় আছে। কিন্তু শুধু কালো টাকা সাদা করার বিষয়টি নিয়ে পত্র-পত্রিকাগুলোও যেন একটু বেশি হৈ চৈ করছে। কয়েকটি পত্রিকা এসএমএস জরিপেও বিষয়টি নিয়ে এসেছে, যা সঠিক বলে আমি মনে করছি না। এটি প্রমাণ করে, আমরা বাজেটের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে কতো হালকাভাবে পর্যালোচনা করি। কখনো মূল বিষয়গুলো গভীরভাবে দেখি না। ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি না। দল-মতের স্বার্থের বাইরে এসে বিবেচনা করতে পারি না। একটি কথা বলা হচ্ছে, অর্থমন্ত্রী গত বছর বলেছিলেন এ ধরনের সুযোগ আর রাখা হবে না। তবু তিনি এ বছর এ ধরনের প্রস্তাব রেখেছেন ঘোষিত বাজেটে। পরিস্থিতির কারণে বা চাপের কারণে অর্থমন্ত্রী তার মত বদলাতে পারেন - এটিই স্বাভাবিক বলে ধরে নেব আমি। অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার, ব্যবসায়ীদের একটি অংশের চাপের কারণে অর্থমন্ত্রী এটি করেছেন। যা হোক, এ সুযোগ বারবার দেয়ার জন্য ব্যবসায়ীরা দায়ী। গত বছর এ সুযোগ তারা নেয়নি কেন? একটি অংশ যে এ ধরনের সুযোগ চাচ্ছে তা অবৈধ। এটি কোনো বৈধ অর্থ নয়। গত বছর দেয়া সরকারের সুযোগ না নিয়ে অবৈধ অর্থের মালিকরা সরকারকে বিপদে ফেলেছে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : এ সুযোগ করে দেয়া কি দেশের অর্থনীতির জন্য লাভজনক বলে আপনি মনে করছেন?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ এবং না। এর কোনো সাদামাঠা উত্তর হয় না। কল্যাণকর এ অর্থে, এর মাধ্যমে ১০০ বা ২০০ কোটি টাকা দেশের মূল প্রবাহে ফিরে আসবে। ভালোই একদিকে, ১০০-২০০ কোটি টাকা সাদা টাকার অন্তর্ভুক্ত হবে। ক্ষতিকর এ অর্থে, লোকেরা এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আরো কালো টাকা আয়ের পথে যাবে। ভাববে আরো একবার এ সুযোগ পাব। সুতরাং এটি একটি জাজমেন্টের ব্যাপার।

প্রশ্ন : আপনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব পর্যন্ত পালনের অভিজ্ঞতা থেকে বিষয়টিকে কিভাবে বলবেন?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে বেশ মুশকিল। কারন, পুরো ব্যবস্থাটির তুলনামূলক বিচারের আলোকে বলতে পারলে বলা সহজ ছিল। তবে আমি এখন বলব, এ সুযোগ আর দেয়া উচিত নয়। এ কথা বলা দরকার, আর কত সুযোগ দেয়া হবে। এটি সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ আমরা দেব না। বর্তমান সরকারের এখন ঘোষণা দেয়া উচিত, আমরা ক্ষমতায় থাকলে এ সুযোগ আর দেব না। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ যদি কালো টাকা সাদা করার বিপক্ষে হয়, তবে তাদেরকে ঘোষণা দেয়া উচিত, তারা ক্ষমতায় গেলেও এ সুযোগ আর দেবে না। সব রাজনৈতিক দল-মত-গোষ্ঠীর যদি সত্যিই আন্তরিকতা থাকে তবে তা বলা উচিত। আর কালো টাকা সাদা করার সুযোগ কোনো অবস্থাতেই নয়। আমি আপনাদের সঙ্গে একমত, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ আর নয়।

প্রশ্ন : বলা হচ্ছে, ঘোষিত বাজেট উচ্চাভিলাষী, বাস্তবতার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ- আপনি কি মনে করেন?

উত্তর : অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করছি, এ ধরনের সমালোচনা রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে বেশি আসে। বাজেট ঘোষণা করলে এ ধরনের রাজনৈতিক শব্দগুলোর অনেক ব্যবহার শোনা যায়। বাজেটে কিছু দিককে ভালো বলতে হবে, কিছু দিককে খারাপ বলতে হবে। আমি বলব বেশিরভাগক্ষেত্রেই এসব কথা সমালোচনার জন্য বলা হয়। আর যারা নিরপেক্ষ ধরনের অর্থনীতিবিদ, আমাদের সামাজিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক কারণে আমরা একথা বলে থাকি। বাজেটকে উচ্চাভিলাষী বাজেট বলি, বাস্তবায়ন হবে না এমন কথা বলি, টার্গেট পূরণ হবে না বলে মন্তব্য করি। আমি মনে করি, প্রস্তাবিত বাজেট খুব একটি উচ্চাভিলাষী নয়। অবশ্যই উচ্চ টার্গেট আগের চেয়ে। যেমন বলা হয়েছে, রাজস্ব ১৬ শতাংশের বেশি বাড়বে। আমি এটি বেশি বলে মনে করি না। আমাদের অতীত ইতিহাস বলে, অনেক সময় আমরা রাজস্ব বাজেটের টার্গেট অতিক্রম করে এসেছি। কিছু উচ্চভিলাষ আছে, তবে অতটা নয়। যেমন- এডিপি'র যে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে, তা কিছু বেশি হলেও ঠিকই হতে পারে। সরকারের সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কো-অর্ডিনেশন যদি আরো ভালো হতো, তবে এ টার্গেট অতিক্রম করা দুরূহ বলে আমি মনে করি না। যদি এসবকে কেউ উচ্চাভিলাষী বলে তবে আমি বলব, এসব নিছক রাজনৈতিক বক্তব্য।

প্রশ্ন : অনেকে বলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড স্বচ্ছ হলে এবং আরো জোরদার হলে বাজেটের প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব - আপনি কি মনে করেন?

উত্তর : না, আমি তা বলব না। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অস্বচ্ছ বলা যাবে না। এ বোর্ড অস্বচ্ছ কিছু নয়। রাজস্ব বোর্ডের হিসাব-নিকেশ সবই স্বচ্ছ। যারা ধরে নেয়, দুর্নীতি কমানো গেলে

www.pathagar.com

লক্ষ্যমাত্রা এখনই অর্জন সম্ভব, তাদের মনে রাখা উচিত, এত স্বল্প মেয়াদে দুর্নীতি কমে না, দক্ষতা বেড়ে যায় না। এ কাজ করতে আমাদের একটি পর্যায় পর্যন্ত দুর্নীতি থাকবে ধরে নিয়েই কাজ শুরু করতে হবে। সুতরাং এটি ঠিক নয় - দুর্নীতি কমে যাবে আর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ফেলব। দুর্নীতি কমাতে হবে এমন কথা যারা বলছেন, তাদের অনেকে নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্ত বলে আমি জানি। বড় বড় কথা বলার চেয়ে বাস্তবতা বেশ কঠিন। আমাদের সমাজে নানা ধরনের দুর্নীতি বিরাজমান। উচ্চ পর্যায়ের এক ধরনের দুর্নীতি, বড় রাঘব বোয়লদের এক ধরনের দুর্নীতি, নিচু পর্যায়ে এক ধরনের দুর্নীতি চলছে। রাজনৈতিক দুর্নীতি তো আছেই। এ দুর্নীতি হঠাৎ করে বন্ধ হবে না। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়েছে, তারা যদি পারেন শুরুতে বড় বড় ৫০/১০০টি দুর্নীতির মামলা সমাধান করতে; তবে কিছু কাজের কাজ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এটি করতে পারলে জাতির চেহারা বদলে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই। দুর্নীতি দমন কমিশনকে এ কাজে হাত দিতেই হবে।

প্রশ্ন : দাবি ছিল, বাজেট নির্বাচনমুখী না হয়ে জনমুখী হোক - ঘোষিত বাজেটকে কোনটির বলে মনে করছেন?

উত্তর : এসব রাজনৈতিক পরিভাষা বলে আমি আবারো বলছি। এসব কথা বলার জন্যই বলা হয়, সমালোচনা করতে হবে - তাই বলে। আমি মনে করি, এসব হালকা কথাবার্তা বাজেটের মতো বিষয়ে অন্তত বলা উচিত নয়। ১৯৭২ সাল থেকে আমি বাজেট প্রস্তুত করার কাজে জড়িত ছিলাম। একজন জুনিয়র অফিসার হিসেবে দেশের প্রথম বাজেটে কাজ করেছি। আবার অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব হয়ে পুরো বাজেট প্রণয়নের কাজ করেছি। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলে, কোনো বাজেটই গণবিরোধী নয়। যখন যে সরকার ছিল, তারা সাধ্যমতো জনগণকে সামনে রেখে জনকল্যাণে বাজেট প্রনয়নের চেষ্টা করেছে। গণবিরোধী কোনো বাজেটই হয়নি এদেশে। শুধু সম্পদের সীমাবদ্ধতা ছিল। এজন্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক কিছুই সরকার করতে পারেনি। এখনো সরকার সবকিছু করতে পারছে না। এগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক পরিভাষা যেমন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা চাই। আম বলবো, ঘোষিত বাজেট সাধারণ বাজেট। যেহেতু নির্বাচনের আগে হয়েছে, তাই নির্বাচনকে সামনে রেখে করা হতে পারে। ব্রিটেনে নির্বাচনের আগে এ ধরনের বাজেট হয়। যে বাজেট কোনো সরকার তার মেয়াদের শেষ বছরে করে - সেখানে নির্বাচনকে মাথায় রাখে। নির্বাচনের কারণে কর না বাড়ানোর বিষয়টি খেয়াল রাখে - এটি স্বাভাবিক। তবে একটি ত্রুটি আছে, বিভিন্ন খাতে যে থোক বরাদ্দ আছে, এসব থোক বরাদ্দের অপব্যবহার হতে পারে। একথা দাতারা বলছে, অর্থনীতিবিদরা বলছেন, আমিও বলছি। এ থেকে বরাদ্দ নিয়ে সরকার অহেতুক বড় ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন। তাই আমি বলব, এ বরাদ্দকে আপনারা পরিকল্পনার আলোকে ভালো প্রকল্পের আওতায় ব্যবহার করুন, বাদ দিতে আমি বলব না। এভাবে কোনো টাকা যদি ব্যবহার নাও হয়, তবুও মানুষকে ভুল বোঝার সুযোগ না দেয়া ভালো।

প্রশ্ন : প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বিস্তৃত করার যে কথা বলা হয়েছে সেটিকে কিভাবে দেখছেন?

উত্তর : দারিদ্র্য নিরসনে প্রস্তাবিত বাজেটের বরাদ্দ বেশ পজিটিভ। দারিদ্র্য বাড়ানোর জন্য বাজেট নয়, দারিদ্র্য কমানোর জন্যই বাজেট। কর্মসংস্থান তৈরির জন্যই বাজেট। উন্নয়ন করার জন্যই বাজেট, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দারিদ্র্য নিরসনে থোক বরাদ্দের বিষয়টি আপত্তিকর। অপব্যবহার যেন না হয়, অপচয় না হয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যেন

www.pathagar.com

এসবের ব্যবহার না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। আমার মনে হয়, এসব থোক বরাদ্দ ব্যবহারে একটি ছোট্ট টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা দরকার। এতে সিনিয়র অর্থনীতিবিদদের রেখে কাজ করা যেতে পারে। টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞদের রাখা যেতে পারে। কিছু পরিকল্পনাবিদ থাকবেন। তারাই মনিটর করে কাজটি বাস্তবায়ন করতে পারলে সুফল পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন : অর্থমন্ত্রী বলেছেন, প্রাতিষ্ঠানিক বাধা বাজেট বাস্তবায়নে বড় বাধা - আপনি কি মনে করেন?

উত্তর : ঠিক, আমাদের কিছু দুর্বলতা আছে। আমাদের দু'দিক দিয়ে দুর্বলতা আছে। রাজস্ব আদায় যারা করেন - সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা তো আছেই। আর বাস্তবায়নেও দুর্নীতি একটি ফ্যাক্টর আমরা জানি। তারপরে, পরিকল্পনা প্রণয়নে দুর্বলতা আছে, টাকা ছাড় আস্তে আস্তে হয়। আবার, কোর্টে বাধা। মামলা পড়ে আছে বছরের পর বছর। রাজস্ব আদায়ের বিরুদ্ধে মামলা করে দিলে কয়েক বছরেও তার সমাধান হচ্ছে না। হাইকোর্টে হাজার হাজার মামলা পড়ে আছে। ৫ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আটকে আছে শুধু মামলার জন্য। এই যে ব্যবস্থা তা দেখতে হবে। তবে তাতে সময় লাগবে। বিদেশীরা পর্যন্ত বলছে, আমাদের জুড়িশিয়ারি ব্যবস্থায় কিছু একটি করতে হবে - যাতে রাজস্ব আদায়ের মামলা আটকে না থাকতে পারে। জাতীয়ভাবে এ বিষয়টি চিন্তা করা উচিত। জাতীয় স্বার্থেই বিষয়টির সমাধান প্রয়োজন। বিচার ব্যবস্থার যুগোপযোগী পরিবর্তনের মাধ্যমে এসবের সমাধান করতে হবে।

প্রশ্ন : প্রস্তাবিত বাজেটের মনিটরিং পলিসি বৈদেশিক মুদ্রা ও মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে কেমন প্রভাব ফেলবে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : প্রস্তাবিত বাজেটকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ বলে আমি মনে করছি না। মুদ্রাস্ফীতির কারণ ঘটে ট্যাক্স বেড়ে যাওয়ার কারণে। প্রস্তাবিত বাজেটে ট্যাক্সের পরিধি বাড়ানো হয়নি। অন্যান্য কারণে মুদ্রাস্ফীতির কারণ ঘটতে পারে। সেটি দেখার দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের। যেমন, মানি সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের। সেটি বাংলাদেশ ব্যাংক করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক যদি দেখে, মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে, তবে কঠোরভাবে মুদ্রা সাপ্লাই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ব্যবসায়ীরা সুদের হার বাড়ানো পছন্দ করবে না। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় কেনা ও বেচার মধ্যে যে মারজিন তাও বাড়ানো দরকার। দু'টা দু'ধরনের। একটি সুদের হার বাড়ানো, আর অন্যটি লাভের মারজিন বাড়ানো। আমি বলবো, সুদের হার বাড়ানো বা মারজিন বাড়ানো মুদ্রাস্ফীতির কারণে যদি করতে হয়, তবে করতেই হবে।

প্রশ্ন : বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতি চালু হয়েছে, সে আলোকে বাংলাদেশে বাজেট বরাদ্দ প্রশ্নে আপনার মত কি?

উত্তর : বলতে হবে, জাতি তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে - এতে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও একটি প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে কতটুকু এগিয়েছি? বিষয়টি জিডিপি'র আলোকে বিবেচনা করলে হবে না। প্রস্তাবিত বরাদ্দ বাড়ানো উচিত। যতটুকু সম্ভব প্রতিবছর বাড়ালে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব। এটি শিক্ষাক্ষেত্রের বরাদ্দের মতো নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ ৫ হাজার কোটি টাকা। ১০ শতাংশ বাড়ালে ৫০০ কোটি টাকা হয়। কিন্তু তথ্য-প্রযুক্তি খাতে ১০-২০ শতাংশ বাড়ালে মাত্র ১০-২০ কোটি টাকা হয়। তাই এক্ষেত্রে ৪০-৫০ শতাংশ, অন্তত সামর্থ্য অনুযায়ী বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলে পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে আমরা কিছুটা হলেও খাপ খাওয়াতে পারবো।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : প্রস্তাবিত বাজেটের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো সংক্ষেপে বলুন।

উত্তর : শুরুতেই বলেছি, প্রস্তাবিত বাজেট খুবই সাধারণ বাজেট। বাজেটের খাতওয়ারি বরাদ্দে আমি কোনো সমস্যা দেখছি না। তবে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে ১০ থেকে ২০ শতাংশ বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এ বাজেটে দেশের জন্য, জনগণের জন্য, অর্থনীতির জন্য কোনো ক্ষতিকর কিছু দেখছি না। তবে থোক বরাদ্দ নিয়ে সমস্যা আছে, তা আগেই বলেছি। এবারের বাজেটকে সার্বিকভাবে আমি একটি ভালো বাজেট মনে করি। আমাদের অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান সার্বিকভাবে দেশের জন্য শ্রেষ্ঠ অর্থমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। তা স্বীকার না করলে কৃপণতা হবে। তুলনামূলক বিচারে অর্থমন্ত্রী অনেক চাপ উপক্ষো করেছেন। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর অনেক চাপও অর্থমন্ত্রী উপেক্ষা করেছেন। তিনি অনেক কথা খোলামেলা বলেন, যা অন্যরা বলেন না। আমি মনে করি, প্রস্তাবিত বাজেটে শিল্পের দিকে নজর দেয়া হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জনাব মতিউর রহমান নিজামীও ভালোই করেছেন। এ মন্ত্রী কৃষি মন্ত্রণালয়েও ভালো করেছেন। এটি প্রমাণ করে, সৎ ব্যক্তিত্ব অনেক কিছু করতে পারে।

বাজেটে অন্যতম সহায়ক কৌশলে বলা হয়েছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। আমি বিনয়ের সাথে বলবো, আইনের শাসনের ক্ষেত্রে র‍্যাবের নামে যা হচ্ছে, তা সাধারণ জনগণের কাছে যাই হোক, তা কি আইনের শাসনের সাথে সংগতিপূর্ণ? বাইরের বিশ্বে আমি একজন লোকের কথাও জানি না, যিনি ক্রসফায়ারকে সমর্থন করছে। হাউজ অব লর্ডস-এ সমালোচনা হচ্ছে বাংলাদেশকে নিয়ে। এর মূল কারণ ক্রসফায়ার। বিদেশে বাংলাদেশের সম্মান শূন্য হয়ে যাবে, যদি এটি বন্ধ না করা যায়। এটি অত্যন্ত জরুরী। যে কোনো ধরনের বিচার বহির্ভূত হত্যা বন্ধ করতে হবে এবং এ পর্যন্ত ক্রসফায়ারে নিহতদের ব্যাপারে তদন্ত হওয়া দরকার। তদন্ত করে বিচার হওয়া দরকার। এভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি কোনো নিয়ম নয়। এভাবে পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্ভব নয় - এর প্রমাণ ২৪ জুন ২০০৫ দিন-দুপুরে সরকারি যুব সংগঠনের এক নেতাকে গুলি করে হত্যা করার ঘটনা। এটি কোন সিদ্ধ পদ্ধতির মধ্যে পড়ে না। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সরকারের কয়েকটি লক্ষ্যের মধ্যে অন্যতম বলে বাজেটের বক্তব্যে বলা হয়েয়েছ। সেজন্যে সরকারকে এ বিষয়ে নজর দিতে হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এসব টাকা যেনো বেশিরভাগই বেতন খাতে খরচ না হয়। শিক্ষার মান সম্পর্কে ভালোভাবে নজর দিতে হবে। স্বাস্থ্য নিয়ে একটি কথা বলতে চাই। ক্লিনিক করে দেশের স্বাস্থ্য সমস্যা দূর করা যাবে না। ক্লিনিক সুবিধা নিতে পারে দেশের ২-৩ শতাংশ লোক। সাধারণ মানুষ ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারবে না। তারা অত্যন্ত কষ্টে আছে। উপজেলা ও জেলা সদরের হাসপাতালগুলোর মান ও সেবা যদি না বাড়ে, ডাক্তারেরা যদি সেখানে কাজ না করেন, তবে সাধারণ মানুষ কোথায় স্বাস্থ্য সেবা পাবে? আমার জানা মতে, একটি পরিবার তার এক সদস্যের জন্য ক্লিনিকে ৫ লাখ টাকা খরচ করার পর সরকারি হাসপাতালে ফিরে গিয়েছে। বিষয়টি কতো মর্মান্তিক। ক্লিনিকে ডাক্তারেরা দিনে যতবার দেখবেন ততবার বিল। সিট ভাড়া তো আছেই। স্বাস্থ্যখাতে আমরা এতো টাকা খরচ করছি, কিন্তু দুঃখী লোকের কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না - তা খুব দুর্ভাগ্যজনক। এসব পরিবর্তন করার দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, বিএমএ-সহ ডাক্তারদের সংগঠনগুলোকে দায়িত্ব নিতে হবে। গরিবের প্রতি আমাদের যে দায়বদ্ধতা আছে, তা শিক্ষিত লোকদের ভাবতে হবে।

www.pathagar.com

প্রশ্ন : প্রতিরক্ষা খাতে বাজেটে অস্বচ্ছতার অভিযোগ উঠেছে, সেটিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দের সবকিছু প্রকাশ করা যায় না। যে কোনো রাষ্ট্র তার প্রতিরক্ষার সবকিছু খোলাসা করে না। এতে অস্বচ্ছতার কিছুই নেই। অনেক বরাদ্দ আছে, তা বলা যাবে না। আমি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলাম - যাতে একটি বরাদ্দ থাকে, তার কোনো অডিট হয় না। এনএসআই-এ এ ধরনের বরাদ্দ থাকবে যাতে কোনো অস্বচ্ছতার কথা বলা যাবে না। সবকিছু প্রকাশ করলে সরকারের নিরাপত্তা বলতে কোনো কিছু থাকবে না। কোনো দেশই বলে দেবে না, আমার দেশে এতো ট্যাঙ্ক আছে, এতো কামান আছে অথবা নেই। প্রতিরক্ষার খরচ সম্পর্কে বলবো, আমাদের অবশ্যই একটি ভালো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দরকার। এর কোনো বিকল্প নেই। একটি শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চাই আমি। এ নিয়ে জাতির মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আছে। কিন্তু আমি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে। শত্রুর সামনে আমাদের হাত তুলে দেয়ার মতো অবস্থান থাকা উচিত নয়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন
প্রকাশকাল : ২৮ জুন ২০০৫, দৈনিক নয়া দিগন্ত

www.pathagar.com

বোমাসন্ত্রাস বন্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

প্রশ্ন : সম্প্রতি দেশে বোমাসন্ত্রাসের কিছু ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। এর পেছনে কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আজকাল ইসলামের নামে যে সন্ত্রাস হচ্ছে আগে কখনো তা দেখা যায়নি। বাংলাদেশ হওয়ার সময় কিংবা তার আগে পরে নকশাল আন্দোলন ছিল, তারা মূলত মাওপন্থী ছিল, কঠোর সমাজতান্ত্রিক ছিলো। তারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, ধনীদের হত্যা করা বৈধ মনে করতো। তারা সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল বৈধ মনে করতো। এখনো নেপালে করার চেষ্টা করছে। শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের সময়ে সর্বহারা আন্দোলনটাও একটি বামপন্থী আন্দোলন ছিল। তারা কঠোর সমাজতন্ত্রী ছিল, মাওবাদী ছিল। তাদের নেতা পরবর্তীকালে ধরা পড়ে এবং মারা যান। এরপরে আমরা দেখেছি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে বামপন্থীদের গোপন আন্দোলন হয়েছে। নোয়াখালীতে তোহা, যশোরে আবদুল হক-এর নেতৃত্বে সর্বহারা আন্দোলন হয়েছে। আজকাল দেশের বিভিন্ন স্থানে সর্বহারা আন্দোলনের কথা শোনা যায়।

কিন্তু বিগত বছরগুলোতে আমরা এভাবে ইসলামের নামে কোন সন্ত্রাসের কথা শুনিনি। আমরা প্রথম শুনতে পেলাম বাংলাভাই-এর কথা। তারপর শায়খ আবদুর রহমানের কথা। তারপর শুনলাম জেএমবি'র কথা। এরপর বিভিন্ন স্থানে বোমাবাজি, লিফলেটে ইসলামের কথা। এটি খুবই রিসেন্ট ডেভেলপম্যান্ট যা আগে কখনোই ঘটেনি। এখন দেখা যাচ্ছে, একদল লোক খুব গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করে, মাদরাসাগুলোকে এজন্য দায়ী করার চেষ্টা করছেন। তাদের মতে, এসব ঘটনার পেছনে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক ও কারিকুলাম দায়ী। তাদের টার্গেট এগুলো বন্ধ করে দেয়া। এ ধরনের কথা একেবারেই অনৈতিহাসিক এবং অযৌক্তিক। আমরা যদি মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাস লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো, তৎকালীন বৃটিশ বাংলায় ১৭৮১ সালে লর্ড হ্যাস্টিংস-এর সময়ে আলিয়া ধরনের মাদরাসা শুরু হয়। কলকাতায় মুসলমানেরা তখন লর্ড হ্যাস্টিংসকে ইসলামী শিক্ষার জন্য কোর্স করতে বললে তিনি তৎকালীন বড় আলেম মাওলানা মজদুদীনকে দায়িত্ব দেন। অতীতের বাগদাদের নেজামিয়া ও মোঘল আমলের মাদরাসা শিক্ষার আলোকে মাওলানা মজদুদীন এ কারিকুলাম তৈরি করেন। এখনো ইসলামী শিক্ষার কোর্স বিশেষ করে কুরআন, হাদিস, ফিকাহ ইত্যাদি একই রয়ে গেছে। সম্প্রতি বাংলা, ইংরেজী, অংক, বিজ্ঞান কিংবা কম্পিউটার যোগ হয়েছে। অন্যদিকে কওমী মাদরাসার প্রেক্ষাপট হচ্ছে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের পর মুসলমানরা বিপদে পড়ে যায়। পরবর্তীকাল ১৮৬৫ সালে এ

www.pathagar.com

অবস্থা উত্তরণের জন্য দেওবন্দে কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তার আলোকে সারা ভারতে কওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদেরও মূল উৎস বাগদাদের নেজামিয়া মাদরাসা। ঐ কোর্সও একই রয়ে গেছে। তাহলে বুঝা গেলো আলিয়া ও কওমী মাদরাসার মূল উৎস একই। শুধু পদ্ধতিগত পার্থক্য।

দেড়শ কিংবা দু'শ বছরের মাদরাসা শিক্ষার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো তারা কখনই সন্ত্রাসী সৃষ্টি করেনি। অনেক ইংরেজ শাসক বা গভর্ণরদের গুলি করা হয়েছে, বা অস্ত্রাগার লুট করা হয়েছে। কোন মাদরাসায় শিক্ষিতরা তা করেনি। তাই বলা যায়, এ মাদরাসার কারিকুলাম থেকে কখনোই কোন সন্ত্রাসীর জন্ম হয়নি। অন্য কোন উৎস থেকে হয়তো এ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে। এজন্য তারা মাদরাসা শিক্ষিতদেরও ব্যবহার করতে পারতো কিংবা সাধারণ মানুষকেও ব্যবহার করতে পারে। তাই এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাদরাসা শিক্ষা সংকোচনের উদ্যোগ নেয়া হলে খুবই অন্যায়, অযৌক্তিক, অবিচারমূলক কাজ হবে। আমি বলবো, এসব ঘটনার উৎস খুঁজে বের করা দরকার। কোন আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারণে যদি প্রচার নাও করা যায় তবুও অন্তত সরকারকে জানতে হবে। প্রাইভেটলী জাতীয় নেতৃবৃন্দকেও অবহিত করা উচিত।

প্রশ্ন : সন্ত্রাসীরা বিচারকদের টার্গেট করেছে। বলছে, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য তারা আদালতে হামলা চালাচ্ছে। তাদের এ তৎপরতা কি ইসলাম সমর্থন করে?

উত্তর : তাদের এ তৎপরতা একেবারেই ইসলাম সম্মত নয়। প্রথম কথা হচ্ছে, প্রত্যেক মুসলিমেরই অবজেকটিভ হওয়া উচিত আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা, এটি ঠিক। এর আগে পরিষ্কার করা উচিত বাংলাদেশের আইন কি অনৈসলামিক? এটি বললে খুব বাড়াবাড়ি হবে। বাংলাদেশের অধিকাংশ আইন ইসলাম বিরোধী নয়। যেমন, ট্রাফিক আইন। এর মধ্যে ইসলামবিরোধী কিছুই নেই অথবা কাস্টমস আইন, প্রসিডিউর বলা আছে, এখানে ইসলাম বিরোধী কিছুই নেই। এ ধরনের শতাধিক আইন রয়েছে। শতকরা ৯০ ভাগ আইন হচ্ছে প্রসিডিউরাল। এতে ইসলাম বিরোধী কিছুই নেই।

আবার অনেক আইন আছে সরাসরি ইসলামী আইন। যেমন, মুসলিম পারিবারিক আইন। কিছু কিছু আইনের, কিছু ধারা হয়তো আছে যা ইসলামভিত্তিক নয়। সে সংস্কার একটি দূরবর্তী ব্যাপার। ইসলামী চিন্তাবিদরা বলেন ঐসব আইন তখনই করতে হবে যখন দেশে কোন দারিদ্র্যতা থাকবে না এবং এ ধরনের অনৈতিক পরিবেশ থাকবে না। বিশ্বের সকল ইসলামিক স্কলাররা মনে করেন, এসব আইন অনেক পরে। ইসলামাইজেশনের শেষ ধাপে তা করতে হবে।

অনেকে হয়তো মনে করেন, এরা আল্লাহর আইন পরিচালনা করছে না, তাই তাদেরকে ক্ষতি করা যায়। এক্ষেত্রে তারা কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করছে। সূরা মায়েদায় আছে যারা আল্লাহর আইন অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করবে না তারা কাফের .....। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা কাশগরী তার বইতে লিখেছেন, এখানে 'কাফের' শব্দের ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগের মত হচ্ছে কাফের মানে ইসলাম অস্বীকারকারী নয়। এর মানে হচ্ছে আল্লাহর না শুকরিয়া করা। 'কাফের' শব্দের দুটি অর্থ আছে। একটি হচ্ছে ইসলামের অস্বীকৃতি, আরেকটি অর্থ হচ্ছে না মানা। আইন আছে কিন্তু মানছি না। যেমন অনেকে নামায পড়ে না, তাই বলেতো সে কাফের হয়ে যাচ্ছে না। রাষ্ট্র কিছু আইন করছে না তাই বলে সে রাষ্ট্র কাফের রাষ্ট্র হয়ে যায় না। তাই কুরআনের এ আয়াতের উপর ভিত্তি করে যারা সন্ত্রাসবাদের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছে তারা সঠিক কাজ করছে না।

www.pathagar.com

যে কোন বুদ্ধিমান লোক বলবে তারা যে পদ্ধতিতে কাজ করছে তা কার্যকরী পদ্ধতি নয়। বোমা মেরে পালানো যায় না। তারা ধরা পড়ে যায় এবং ধরা পড়ে যাচ্ছেও। এভাবে কখনো ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ পদ্ধতির কোন কার্যকারিতাই নেই। দুনিয়ার কোন পাগলও বিশ্বাস করবে না এভাবে বোমা মেরে কোন ইসলামী রাষ্ট্র করা যাবে।

ইসলামী রাষ্ট্র করতে চাইলে, প্রথমে দল গঠন করতে হবে এরপর জনগণের সমর্থন নিতে হবে। জনগণ চাইলে সংসদে গিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে। সুতরাং তাদের এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রায় সকল আলেমই বলেছেন এবং নিন্দা জানিয়েছেন।

প্রশ্ন : আল্লাহর আইন তথা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কর্মপদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : এর উত্তর অনেকটাই চলে এসেছে। আধুনিক বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে সময়, স্থান পাত্রটা বুঝতে হবে। এটি গণতন্ত্রের যুগ। এক সময় রাজা-বাদশাহরা দেশের প্রধান ছিলেন। তখন তাদের বুঝাতে পারলেই হতো। কিন্তু এখন জনগণের যুগ। এটি স্বীকার করতেই হবে। এখন জনগণকেই বুঝাতে হবে, জনগণকেই কনভিন্স করতে হবে। তার পথ কী? তা হচ্ছে নির্বাচন বা সাংবিধানিক পদ্ধতি। এতে সময় লাগলে লাগবে। মূল কথা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে নীতি নৈতিকতার চর্চা কম। দায়িত্ববোধ কম, সর্বক্ষেত্রে তা মেনে চলা উচিত।

প্রশ্ন : বোমাসন্ত্রাস বন্ধে সরকার ও দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আমি মনে করি বাংলাদেশের সবচেয়ে অন্যতম বড় সমস্যা সন্ত্রাস। তবে মিডিয়ায় যেভাবে আসছে তাতে মনে হয় বাংলাদেশ বোমার কারখানাতে ভরা। এ ধরনের সেন্টিমেন্ট সৃষ্টি করাও ঠিক হবে না। এখন দেখা যায় প্রায়ই বিচারপতি, সরকারি কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন জন চিঠি পাচ্ছেন। আমার মনে হয় এর ৯০ ভাগই সঠিক নয়, ভয় দেখানোর জন্য করা হচ্ছে। আমার মনে হয় এরা 'পেপার টাইগার'। আসলে এরা শক্তিশালী কেউ নন। এদেরকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বড় করেও দেখার কিছু নেই। আমাদের উচিত সবসময় সতর্ক থাকা এবং আতংক সৃষ্টি না করা।

সন্ত্রাসের ব্যাপারে সরকারি দল ও বিরোধীদল সহ সবাইকে এক থাকতে হবে। ইসলামিক, ননইসলামিক, কমিউনিস্ট-ননকমিউনিস্ট, সেক্যুলারিস্ট-ননসেক্যুলারিস্ট এক থাকতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সামছুল আরেফীন
প্রকাশকাল : ২৬ নভেম্বর ২০০৫, দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মন্দ প্রভাবই বেশি তবে এজন্য টেলিভিশন নিজে দায়ী নয়

প্রশ্ন : স্যাটেলাইট টেলিভিশনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : এটি বিজ্ঞানের একটি অবদান। এর অনেক ক্ষমতা। এর মাধ্যমে দুনিয়াতে অনেক ভালো কাজ করা যায়। আবার অনেক মন্দ কাজও করা যায়। যন্ত্রের দোষ নেই। এর ভালো ব্যবহারও হতে পারে, মন্দ ব্যবহারও হতে পারে। স্যাটেলাইট টেলিভিশন একটি নিরপেক্ষ মাধ্যম। মাধ্যম হিসেবে একে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, এটিই এখন প্রশ্ন। আমি মনে করি স্যাটেলাইট টেলিভিশন নিয়ে কোন রকম অনীহা থাকা উচিত নয়। এটি মানবজাতির জন্য বড় অর্জন। বিজ্ঞানের বড় অবদান। এটি না থাকলে ভালো হয় বা বন্ধ করে দেয়া উচিত এ ধরনের দ্বিধা থাকা যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন : স্যাটেলাইট টেলিভিশন বর্তমান সময়ে আমাদের পরিবার ও সমাজে কী রকম প্রভাব ফেলছে?

উত্তর : এ ব্যাপারে নানারকম মতামত হতে পারে। তবে তা নির্ভর করছে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করা হচ্ছে। যে ব্যক্তির কাছে নৈতিকতার কোন দাম নেই, যে ব্যক্তি মদ পান করা না করাকে সমান মনে করে, তার জন্য টেলিভিশনে মদ পানের দৃশ্য দেখানো কোন খারাপ বিষয় নয়। যে জুয়াকে বৈধ মনে করে এবং এতে কোন ক্ষতি নেই মনে করে টেলিভিশনে জুয়ার পক্ষে বক্তব্য তার কাছে খারাপ মনে হবে না। তেমনিভাবে যাদের কাছে নৈতিক শৃঙ্খলা বা যৌন শৃঙ্খলা কোন বিষয় নয়, তাদের কাছে সবই বৈধ মনে হবে। সুতরাং টেলিভিশনে যা হচ্ছে তার প্রভাবকে বিবেচনা করতে হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। যদি আমরা নাস্তিকদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি, তাহলে কোন কিছু খারাপ হচ্ছে বলা যায় না। মূলত নাস্তিকদের তো কোন মূল্যবোধ নেই, থাকার কথাও নয়। যদি কোন নাস্তিকের মধ্যে মূল্যবোধ থেকে থাকে তাহলে তা হতে পারে পারিবারিক কারণে। আমরা যদি গোটা বিষয়টি ধর্মীয় কিংবা নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি বা ধর্মীয় মূল্যবোধের দৃষ্টিতে দেখি, সে অর্থে বর্তমানে টেলিভিশনের ভূমিকা শতকরা ৮০ ভাগ খারাপ। ক্ষেত্রভেদে কেউ কেউ এটিকে ৭০, ৭৫ কিংবা ৯০ ভাগ বলতে পারেন। তবে নিউজ, কার্টুন কিংবা ডিসকোভারীর মতো চ্যানেলগুলো ব্যতিক্রম। এসব চ্যানেলের অনেকগুলো হয়তো পুরোটাই ভালো।

সারাবিশ্বে যদি এক হাজার চ্যানেল থাকে তার মধ্যে নয়'শ চ্যানেলই হয়ে থাকবে বিনোদনমূলক। সেক্ষেত্রে বিনোদনের গোটা জিনিসটাতেই স্থূলতা, অজ্ঞতা, অসৌন্দর্যতা,

www.pathagar.com

নৈতিক বিকৃতি, যৌন উশৃঙ্খলতা চলে এসেছে। আচার-আচরণে অদ্ভুত কিংবা বিপরীত কিছু করতে হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সুতরাং দু'একটি চ্যানেল বাদ দিলে পুরো স্যাটেলাইট টেলিভিশনের প্রভাব দেশ, জাতি ও পরিবারের উপর মন্দ। ভালো বলার সুযোগ নেই। তবে এজন্য টেলিভিশন নিজে দায়ী নয়।

প্রশ্ন : কেউ কেউ স্যাটেলাইট টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন, এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানাবেন?

উত্তর : নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি একটি স্পর্শকাতর বিষয় এতে কোন সন্দেহ নেই। নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও মুস্কিল আবার বেশি নিয়ন্ত্রণ করাও সমস্যা। যেমন আমরা দেখছি লাসূল (সা)-এর কার্টুন ইস্যুটি। ইউরোপের একটি চিন্তাধারা ডেভেলপ করেছে যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এর ফলাফল যে কি ভয়াবহ হতে পারে তা কার্টুন নিয়ে সারাবিশ্বে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তা থেকেই বুঝা যায়। আমি মনে করি, মত প্রকাশের স্বাধীনতায় সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। কেননা বিশ্বকে তো আর জঙ্গল বানানো যায় না। বিশ্বকে নিয়ে প্রত্যেকে যার যার মতো করে খেলবে, কোন নীতিমালা থাকবে না, তা হতে পারে না। তেমনি লেখা হবে কিন্তু এক্ষেত্রে কোন আইন থাকবে না তা উচিত নয়। আজকে পাশ্চাত্য জগত বলছে, আমাদের গডকেও সমালোচনা করার অধিকার থাকতে হবে। তবেই বুঝা গেল আমরা 'ফ্রি'। আমার তো মনে হয় ওরা 'আনসিভিলাইজড' হয়ে যাচ্ছে। তারা যাই বলুক না কেন তারা মানসিকভাবে 'আনসিভিলাইজড' হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারা বুঝতে পারছে না।

মূলনীতি হিসেবে এটি নিতে হবে যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে তবে তা ন্যায়সঙ্গত পর্যায় পর্যন্ত। এক্ষেত্রে সংসদকে সহনীয় পর্যায় পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। কিছু বিধি-নিষেধ থাকতে হবে। তবে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ভালো নয়। অন্যায় নিয়ন্ত্রণ ভালো হবে না। যে স্বাধীনতা জাতি গ্রহণ করতে রাজি নয় তা রাখা ঠিক হবে না। কোন চ্যানেলে কী নাস্তিকতা প্রচার ঠিক হবে? এতে উত্তেজনা সৃষ্টি হবে। আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে, সকল স্বাধীনতাই আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। আমার দেশের সরকারের অধিকার আছে যে কোন স্বাধীনতাকে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার। এটি আমাদের করতে হবে। আর দেশের গণতান্ত্রিক ধারা যদি অব্যাহত থাকে তবে খুব বেশি নিয়ন্ত্রণের দরকার হবে না। সুতরাং আমাদের নীতিগতভাবে মানতে হবে, স্বাধীনতা দরকার, স্বাধীনতা থাকতে হবে কিন্তু এর অপব্যবহার ঠিক হবে না। যেমন আমাদের পরিবেশ বিপর্যয় বন্ধের কথা আসে। কিন্তু পরিবেশ বিপর্যয় থেকে নৈতিক বিপর্যয় কোন অংশে কম নয়। তাই আমি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণের পক্ষে। তবে এ নিয়ন্ত্রণ কি হবে তা ঠিক করবে সংসদ। এক্ষেত্রে প্রতিটি পেশার প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : স্যাটেলাইট টেলিভিশন কি আমাদের সাংস্কৃতিক বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে?

উত্তর : এর উত্তরটা অনেকটা হ্যাঁ অথবা না এর মতো হবে। এক্ষেত্রে আমাদের সংস্কৃতি কী এ প্রশ্নটিও এসে যায়। ধরে নিচ্ছি আমাদের সংস্কৃতিতে কিছু প্রাচীন উপাদান আছে। একে আমরা বাংলাদেশী কিংবা বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলবো। আবার আমাদের সংস্কৃতিতে মুসলিম জাতিসত্তা হিসেবে ইসলামী উপাদান আছে। এখন এ দুটি জিনিসের মধ্যে মিশ্রণ হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সবাই আশা করে এ সংমিশ্রণের মধ্যে দোষণীয় কিছু থাকা উচিত নয়। যেহেতু এদেশের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ তৌহিদবাদী, সেহেতু এদেশের সংস্কৃতিতে যেন কোন

www.pathagar.com

ধরনের অশ্লীলতা না ঢোকে, শিরক না ঢোকে। তবে অমুসলিমদের জন্যও তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে আলাদা একটি ধারা থাকবে এটি অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এ দেশের সংস্কৃতিতে মূলধারা আছে। পাশাপাশি এর মধ্যে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী লোকদের আলাদা স্রোতও আছে।

এ সংস্কৃতি বিকাশে টেলিভিশন কোনই ভূমিকা রাখছে না এটি বলা ঠিক হবে না। অনেক অনুষ্ঠানই প্রাচীন উপাদান বা ইসলামী উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করছে। এক্ষেত্রে ভাষারও বিকাশ হচ্ছে। নতুন আইডিয়া হয়তো ঢুকে পড়ছে। আবার আরেকটি দিক হচ্ছে সংস্কৃতিতে বৈদেশিক আগ্রাসন। আমাদের টেলিভিশনগুলোতেও কিছু বৈদেশিক উপাদান রয়েছে। এখানে একটি অংশ আছে যাতে বেঠিক কিছু নেই। বিদেশী সব উপাদানই আবার মন্দ নয়। বিশ্বব্যাপী নিড ফর এক্সচেঞ্জ, একে অপরকে জানার ব্যাপার আছে এটিতো অস্বীকার করতে পারি না। তবে আমাদের এটি মানতে হবে বিদেশের এমন কিছু নেয়া ঠিক হবে না যা আমাদের সংস্কৃতির বিপরীতে চলে যায়। আমাদের সংস্কৃতির ভালো দিকগুলো বাদ দিয়ে মন্দ জিনিসগুলো প্রচার করা ঠিক হবে না। গত ৮শ বছর বা ৯শ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখবো আমাদের দেশে ভ্যালেন্টাইনস ডে বা ভালোবাসা দিবস হিসেবে কোন দিবস ছিল না। যদিও ভালোবাসা দিবসের ইতিহাস বলা হয় ১ হাজার, দেড় হাজার কিংবা ২ হাজার বছরের। বখতিয়ার খিলজির পর যে ৮শ বছর বা আরো বেশি এ সময় তো এ দিবস ছিল না। হিন্দু পাল বা সেনদের সময়ও ছিল না। মোঘল, পাঠান, ইংরেজ কিংবা পাকিস্তানের সময় এমনকি বাংলাদেশেরও প্রথম ৩০ বছরে এ দিবস দেখা যায়নি। এখন নতুনভাবে এ দিবসকে পরিচিত করা হচ্ছে ব্যবসায়িক কারণে বা অন্য কোন কারণে। এটি আমাদের সংস্কৃতির সাথে মিল খাচ্ছে না। তেমনি 'থার্টি ফার্স্ট ডে'ও অতীতে ছিল না। এটি ২০/২৫ বছর আগে এসেছে। এগুলো আমাদের জন্য মোটেও প্রয়োজনীয় নয়। এগুলো আমাদের কোন কল্যাণও করছে না। ৩১ ডিসেম্বর কী হচ্ছে? কিছু তরুণ-তরুণী হোটেলে গিয়ে নাচানাচি করছে, এতে জাতির এমন কি কল্যাণ হয়ে যাচ্ছে। তারা হয়তো নানা রকম অনৈতিক কাছেও লিপ্ত হচ্ছে যা আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্যও নয়। রাস্তাঘাটে হয়তো হৈ-চৈ করছে, গাড়ী ভাঙ্গছে, এসব দিবসের অর্জনটা কি? এসব বিষয়গুলো সামনে রেখে আমাদেরকে বাইরের ভালো জিনিসও নিতে হবে, এটি অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বাইরের সংস্কৃতির মধ্যে যেটুকু মানানসই, সঠিক এবং আমাদের সংস্কৃতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে না, আমাদের পরিবার ও সমাজ জীবনকে নষ্ট করবে না, তা গ্রহণ করা যায়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সামছুল আরেফীন

প্রকাশকাল : ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৬, দৈনিক সংগ্রাম

www.pathagar.com

চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে তেলের দাম বাড়ানো ঠিক হবে না

প্রশ্ন : জ্বালানি তেলের দাম বিশ্ববাজারে বেড়ে চলেছে। এ পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণভাবে তেলের দাম না বাড়িয়ে সৃষ্ট চাপ কিভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : বিশ্ববাজারে যেভাবে তেলের দাম বেড়ে চলেছে, এ অবস্থায় বাংলাদেশ সরকার কী করতে পারে তাও একটি বড় প্রশ্ন। স্বাভাবিক সময় হলে আমি বলতাম, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো অথবা সমন্বয় করা হোক। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, সরকার বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে কম দামে অথবা ভর্তুকি দামে তেল বেচতে বাধ্য করে। আমি মনে করি, সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে আসা যাবে না। ভর্তুকি দামে আরো কিছুদিন তেল বিক্রি করতে হবে। বর্তমানে আমি কোনো অবস্থাতেই দাম বাড়ানোর পক্ষে মত দিতে পারছি না।

আমরা একটি মূল্যস্ফীতি বা ইনফ্ল্যাশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। যদি এমন অবস্থা হতো - আমাদের দেশে ইনফ্ল্যাশন নেই, নতুন করে পণ্যের দাম বাড়ছে না, দাম স্থিতিশীল আছে, তাহলে আমি তেলের দাম বাড়ানোর পক্ষে বলতে পারতাম। কিন্তু আমরা একটি রানিং ইনফ্ল্যাশনের মধ্যে আছি। এক বছর ধরে শুধু খাদ্যের দাম, তেলের দাম, চিনির দাম বেড়েছে, এমন নয়, কয়েক মাস আগে কেরোসিনের দাম বেড়েছে। পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেলের দামও বেড়েছে। ফলে অন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামও বাড়ছে। বাড়ছে সার্বিক জীবনযাত্রার ব্যয়। এ অবস্থায় যদি আরেকবার তেলের দাম বাড়ানো হয়, তাহলে এ ইনফ্ল্যাশনকে আরো দ্রুততর করা হবে। এর বোঝা মানুষ বহন করতে পারবে না এবং এটি গণঅসন্তোষও সৃষ্টি করতে পারে। আর গণঅসন্তোষ সৃষ্টি হলে তাতে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে বর্তমান জোট সরকার পরাস্ত হবে - সেটিই একমাত্র প্রশ্ন নয়। বড় কথা হলো, গণঅসন্তোষ কোনো দেশের জন্যই ভালো নয়। এটি কারো কাম্য হতে পারে না। এজন্য আমি মনে করি এখন কোনো অবস্থাতেই তেলের দাম, তেলের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের দাম বাড়ানো ঠিক হবে না। মোটামুটিভাবে আমরা একটি স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছার পর তেলের দাম বাড়ানো যেতে পারে। অস্থির পরিস্থিতির পরিবর্তে একই ইনফ্ল্যাশনে থাকা অবস্থায় তেলের দাম বাড়াতে হবে। বিগত বছরগুলোতে ২, ৩ বা ৪ শতাংশ হারে ইনফ্ল্যাশন হয়েছে। এখন তা ৮ শতাংশের কোটায় পৌঁচেছে। যদি আমরা দেখি ৮ শতাংশ হারেই প্রতি বছর ইনফ্ল্যাশন হচ্ছে, তাহলে এটিকেই স্থিতিশীল ইনফ্ল্যাশন মনে করা যাবে। তবে যদি দেখি এক বছর ৪

www.pathagar.com

শতাংশ এবং পরের বছর ৮ শতাংশ ইনফ্ল্যাশন হয়, তাহলে দাম বাড়ানো ঠিক হবে না। বরং সরকারের উচিত হবে বিদ্যমান দামেই তেল বিক্রি অব্যাহত রাখা। এতে ট্যাক্স ছাড়া প্রতি বছরের ৭০০ কোটি টাকা লোকসানের স্থলে এ বছর না হয় ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকায়ই উন্নীত হবে। আর ট্যাক্স বহাল রাখলে ক্ষতি বাড়বে। যা হোক, চলতি অর্থবছরের আগামী তিন মাসে দাম না বাড়ালে অতিরিক্ত লোকসান হবে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছর প্রথম কোয়ার্টারে লোকসান হবে আরো ৭০০ কোটি টাকা।

এখন প্রশ্ন হলো, এ খরচ কোথা থেকে আসবে। কিভাবে সরকার বাড়তি চাপ বহন করবে? এ পরিস্থিতিই বা হলো কেন? আমার জানা মতে, সরকার ১৫-২০ বছর ধরে একটি ভুল কাজ করছে। সরকার পেট্রোলিয়াম করপোরেশনকে বাধ্য করছে কম দামে বা একটি নির্দিষ্ট দামে তেল বেচতে। কিন্তু এর ফলে যে লোকসান হচ্ছে, সে লোকসান বাজেট থেকে পূরণ করছে না। বাজেটের মধ্যে দেখানো হচ্ছে না যে পেট্রোলিয়ামে ভর্তুকি বাবদ এত কোটি টাকা রাখা হয়েছে। তা না করে এটিকে লোকসান আকারে বিপিসির ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। বিপিসিকে সত্যিকার দামে তেল বেচতে দেয়া হচ্ছে না। এতে বিপিসির লোকসান হয়েছে। সেই লোকসান আবার গিয়ে পড়েছে ব্যাংকগুলোর ওপর। সরকারই ব্যাংকগুলোকে বলছে, বিপিসির এলসির জন্য ঋণ দিতে। ফলে বিপিসি এবং এলসি স্থাপনকারী ব্যাংক উভয় প্রতিষ্ঠান আর্থিক সংকটে পড়ছে। আমার জানা মতে, বিপিসির বর্তমান ঋণের পরিমাণ ৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকার মতো।

প্রশ্ন : বিপিসির লোকসান এখন সবচেয়ে বড় ইস্যু। এ লোকসান মোকাবেলার জন্য শুল্ক মওকুফ ও নগদ ভর্তুকি দান - এ দুটি উপায়ের কথা বলা হচ্ছে। এর মধ্যে কোনটি এ মুহূর্তে অধিক কার্যকর হবে বলে মনে করেন?

উত্তর : ভর্তুকির বিষয়টিকে বলা যায় - এটি বন্ডের মাধ্যমে একবারে বা দুইবারে দিয়ে দেয়া যেতে পারে। তাতে সুদের হার বাড়বে। যেমন ৮ হাজার কোটি টাকার জন্য প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা সুদ আসবে। তাতে এ খাতে বাড়তি ১ হাজার কোটি টাকা দিয়ে দিতে হবে। এটি গেল একটি দিক। এখনো ৮ হাজার কোটি টাকার ইন্টারেস্ট জমা হচ্ছে। যদি একবারে দিয়ে দেয়া হয় তাহলে ইন্টারেস্টের ওপর ইন্টারেস্ট হবে না। আর যে ৮ বা সাড়ে ৮ হাজার কোটি টাকার কথা বলছি, তাতে মূল ঋণের পরিমাণ মাত্র ২ বা ৩ হাজার কোটি টাকা। এ অবস্থায় আমি একবারে দিয়ে ফেলার পক্ষেই বলব। মাঝারি মেয়াদে এটি ভালো বলে আমি মনে করি। তাতে ব্যাংকব্যবস্থাও কিছুটা উন্নত হবে। পেট্রোলিয়াম করপোরেশনেরও সমস্যা চলে যাবে।

আমি তেলের দাম বাড়ার পক্ষে, এখন নয় - এটি রানিং ইনফ্ল্যাশনের সময়ে নয়। যখন মোটামুটি স্থিতিশীল হয়ে আসবে, তখন আমি দাম বাড়াতে বলব। কিন্তু এখন একটি রাইজিং ইনফ্ল্যাশন রেট যাচ্ছে - ছিল ৪ শতাংশ, হয়ে গেছে ৮ বা ৯ শতাংশ। এ অবস্থায় তেলের দাম না বাড়ানোর একটি রাজনৈতিক কারণ আছে। সরকারের শেষ সময়ে জনগণ অপছন্দ করবে এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া কোনো সরকারের উচিত নয়। সরকার যদি নিজেকে অজনপ্রিয় করে তুলতে চায়, তাহলে এটি করতে পারে। কোনো সরকার কি তার শেষ বছরে এসে এ ধরনের কাজ করে? বুশ, ব্লেয়ার সরকার বা ভারতের সরকার কি এ ধরনের কাজ করত? তাহলে বাংলাদেশের সরকার কি অন্যায় করবে, যদি তারা শেষ বছরে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর মতো সিদ্ধান্ত না নেয়? নতুন সরকারের জন্য তারা বিষয়টি

www.pathagar.com

ছেড়ে দিক। যে আসুক পরে সে সরকারই এ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ সময় এটি করা রাজনৈতিকভাবে বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না।

প্রশ্ন : বিপিসির ওপর আর্থিক চাপ কমানোর ব্যাপারে তেলের ওপর বিদ্যমান শুল্ক কর প্রত্যাহার না ভর্তুকি দেয়া - কোনটাকে এ সময়ের জন্য বেশি অনুকূল মনে করেন?

উত্তর : ভর্তুকি ও শুল্ক কমানো প্রভাবের দিক থেকে বিষয়টি আসলে একই। কর ছাড়া ভর্তুকি যদি বছরে ১ হাজার কোটি টাকা দিতে হয়, ট্যাক্স ধরলে সেখানে রাজস্ব দিতে হবে ১ হাজার কোটি টাকা। তাহলে লোকসান বেশি হবে। আবার যদি কর মাফ করে দেয়া হয়, তাহলে লোকসান হবে ১ হাজার কোটি টাকা। আসলে পরিস্থিতি একই দাঁড়াচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে কর রাখার পক্ষে। যদি ভর্তুকি দিতেই হয়, তাহলে জনগণকে জানাতে হবে যে একটি কর আছে। নাহলে হঠাৎ করে বেশি বাড়াতে হবে। আমার মনে হয় কর রেখে ভর্তুকি দেয়াই ভালো। এরপর আন্তর্জাতিক দাম বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি দুই তিন কিস্তিতে কাভার করা যেতে পারে। ইনফ্ল্যাশন যদি মারাত্মক আকারে না থাকে তাহলে তা দুই কিস্তিতে করা যেতে পারে। আগামী বছর মার্চ ও সেপ্টেম্বরে এটি কাভার করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : স্বল্প, মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদে জ্বালানি তেলের সংকট মোকাবেলার ব্যাপারে সরকারের করণীয় আর কিছু আছে বলে কি আপনি মনে করেন?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে আমি দুইভাবে সমাধানের কথা বলব। একটি হচ্ছে আগের লোকসান, যা ব্যাংকগুলোর কাছে পুঞ্জীভূত ঋণ হিসেবে জমে আছে, তা ৫ বা ১০ বছরে লিকুইডেট করা। সরকারকে সেটি বাজেটে দেখিয়ে করতে হবে অথবা বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে করতে হবে। প্রথমে আমি ব্যাখ্যা করে বলেছি, তেলের দাম এখন আর বাড়ানো উচিত নয়। ফলে এখন এ বাড়তি লোকসানটা সরকারকে ভর্তুকি হিসেবে নিতে হবে - এ লোকসান আগামী তিন বা ছয় মাসের মধ্যে ৭০০ বা ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা যা-ই হোক না কেন, তা বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে সরকারের চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত অতিরিক্ত ঋণ ছিল ১ হাজার কোটি টাকার মতো। আগের ২০-৩০ বছরের বকেয়া বাদ দিয়ে এটি। এ ঋণের বিপরীতে সরকার সুদ দিচ্ছে। সেটি বাংলাদেশ বাংকে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আবার বিভিন্নভাবে সরকারকে ফেরত দিচ্ছে। সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য হচ্ছে জিডিপির ৪ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত ড্রইং (ঋণ) করা যায়। সেক্ষেত্রে হয়েছে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। এটি কোটার তুলনায় খুবই কম। অতিরিক্ত আরো ২-৩ হাজার কোটি টাকা ড্রইং হওয়ার কোনোই অসুবিধা নেই। পেট্রোলিয়ামের জন্যও এত ড্র করার প্রয়োজন নেই। কারণ সেখানে নিট লোকসান মাত্র ৭০০-৮০০ কোটি টাকা। সেটিও মাসে মাসে কিস্তির মতো করে নিতে হবে। সার্বিক বিবেচনায় আমি মনে করি, এটুকু লোকসান বহন করতে হবে। তবে আমি অবশ্যই বলব পরবর্তী বাজেটে সেটি দেখাতে হবে। যদি দেখা যায় আগামী জানুয়ারির দিকে তেলের দাম বাড়ানো সম্ভব হবে, তাহলে ততটুকু লোকসানই বাজেট থেকে প্রভাইড করা উচিত। এর জন্য সরকারকে যদি অতিরিক্ত ট্যাক্সেশন করতে হয় সেটি করা উচিত। ট্যাক্সেশন মানে হচ্ছে এর এফেক্টটা গোটা জাতির উপর পড়বে। কিন্তু ইনফ্ল্যাশনের মাধ্যমে জাতির ক্ষতি হবে - যার চাপ পড়বে তাৎক্ষণিকভাবে। আর যেটি আগেই বলেছি, অতীতের লোকসানগুলোকে ৫, ১০ বা ১৫ বছরের মধ্যে লিকুইডেট করতে হবে। এভাবে লোকসানগুলোকে শেষ করতে হবে।

আরেকটি কথা আমি এ প্রসঙ্গে বলতে চাই। কিছু কম দামে পেট্রোলিয়াম কেনার ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করতে হবে। আমার জানা মতে, মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের সুহৃদের অভাব হবে না। সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, আরব আমিরাত বা ইরান সরকারের সঙ্গে আমরা যদি সরাসরি কথা বলতে পারি, বোঝাতে পারি তাহলে তাদের কাছ থেকে ১৫, ২০ বা ২৫ শতাংশ কনসেশন রেটে তেল পাওয়া তেমন কিছু নয়। কারণ তারা জানে, এ দাম বাড়ানো একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে হয়েছে। তারা বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে এ ধরনের আধা উন্নত মুসলিম দেশে ভর্তুকি দামে তেল দিতে রাজি হবে বলে আমি মনে করি। ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংককেও (আইডিবি) অ্যাপ্রোচ করা উচিত। তারাও আগামী এক বছরের জন্য মুরাবাহা বা বাইমুয়াজ্জাল ভিত্তিতে তেল কেনার অর্থায়ন করতে পারে। সেটি অবশ্য কনসেশন রেটে হবে না। অন্তত ডেফারড পেমেন্টে তারা রাজি হবে বলে আমি মনে করি। এ ব্যাপারে সরকারকে বেশি উদ্যোগ নিতে হবে। আমার জানা মতে ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি এমন কোনো উদ্যোগ নেয়নি। জ্বালানি মন্ত্রণালয় কোনো বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বলে আমার জানা নেই। এত বড় বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ না নেয়ার বিষয়ে আমি কোনো যুক্তি দেখতে পাই না।

প্রশ্ন : সরকার জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ ও এডিবির চাপে আছে। এ চাপের বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

উত্তর : আমি যতটুকু জানি, সরকার আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কথা সবসময় মানে এমন নয়। সরকার অনেক কিছু মানে না। এখন সরকারের অনেক কিছু মানা উচিত হবে না। তাদেরকে বোঝাতে হবে - এটি একটি পলিটিক্যাল ইস্যুও। আমার মনে হয় - পলিটিক্যাল ইস্যু তাদেরকে বোঝানো যাবে। আর যদি না বোঝে তাহলে আমরা কী করতে পারি? তারা বুঝল না। আমি আবার বলতে চাই, আমাদের সম্পর্ক মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে বাড়াতে হবে। শুধু কাতার, কুয়েত, সৌদি আরব, আরব আমিরাত - এদের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রয়োজন হবে না। তাহলে আমাদের কারো কাছে নত হয়ে হাত পাততে হবে না। কিন্তু কেন জানি আমরা এ পলিসি নিচ্ছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কার্যকর উদ্যোগ নিলে আমাদের যা লাগবে তার চেয়েও বেশি অর্থের যোগান আমরা পেয়ে যাব। আমরা শর্ত ছাড়াই তা পেয়ে যাব।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মাসুমুর রহমান খলিলী
প্রকাশকাল : ১২ মে ২০০৬, দৈনিক নয়া দিগন্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com